দেওয়ানজীর ফাঁসি।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বি, এল,

প্রণীত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

ইহলোকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব ও পরমারাধ্যা জননী দেবীর পবিত্র শ্রীচরণ কমলে এই সামান্য গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

স্নেহের—মহেন্দ্র।

দেওয়ানজীর ফাঁসী।

চিত্রগ্রামে সর্ব্বেশ্বর বসু নামে একজন জমীদার ছিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না, বাড়ীতে প্রতিদিন হরিনাম হইত, সর্ব্বেশ্বরবাবু গ্রামে স্কুল, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বিস্তর সুযশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বদান্যতায় গ্রামে কাহারও দুঃখ ছিল না। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কাতর থাকিত। পরদুঃখ দূর করিতে তিনি সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। তাঁহার অতিথিশালায় অতিথি ধরিত না। কত যে সাধু, সন্ন্যাসী, দরিদ্র, পথিক, তাঁহার অতিথিশালায় আতিথেয়তা লাভ করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার বহুদূরব্যাপী জমীদারী হইতে একদিকে যেমন বিপুল আয় হইত, অন্যদিকে সেই ধন সর্ব্বেশ্বরবাবু অকাতরে দান করিয়া ব্যবহার করিতেন। শত শত অন্ধ, খঞ্জ, দীন-দরিদ্র, কন্যাদায়-উত্তমর্ণ-হস্তে উৎপীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বরবাবুর দ্বারদেশে ভিক্ষার্থে থাকিত। সর্ব্বেশ্বরবাবু অকাতরে ধনদানে সকলকেই সুখী করিতেন। তাঁহার মুখ হইতে কখন রূঢ়বাক্য বাহির হইতে দেখা যাইত না। তিনি মিষ্টালাপে সকলকেই তৃপ্ত করিতেন। সর্ব্বেশ্বরবাবু এতদূর হইয়াও অহঙ্কার কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার সৌজন্যে, সদাশয়তায় সকলেই মুগ্ধ হইত। বিপন্নের বিপদ-নিবারণ সর্ব্বেশ্বরের নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়া মধ্যে গণ্য ছিল। "যাহা মনুষ্যের অবশ্য-

কর্ত্তব্য আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহাতে আবার গৌরব কি", সর্ব্বেশ্বরবাবু সর্ব্বদা এই কথা ভাবিতেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল ও তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর অনুরূপ গুণে গুণবতী থাকায়, সর্ব্বেশ্বরবাবুর সর্ব্ববিষয়ে সুখের অবধি ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা প্রতিভা যেমন রূপবতী ছিল, সেইরূপ পিতামাতার শিক্ষাকৌশলে সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, প্রতিভা সেই সময়ে বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল, বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহ দিলেই চলে, পিতামাতা প্রতিভাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মনোমত পাত্র জুটিতেছিল না। বিশেষতঃ পাত্রটী সুন্দর হয় অথচ ঘরজামাতা হইয়া ঘরে থাকে, ইহাই সর্ব্বেশ্বরের মনের কথা ছিল এই বিষয় ভিন্ন, সর্ব্বেশ্বরের ও সর্ব্বমঙ্গলার মন শারদজ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ন্যায় সর্ব্বদা প্রফুল্লিত থাকিতে দেখা যাইত। অনেক অধিক বয়সে সর্ব্বেশ্বরবাবুর কন্যা প্রতিভার জন্ম হয়। সেইজন্য প্রতিভা পিতামাতার বড় আদরের হইয়াছিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু নিজেই জমীদারীর সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন, লোকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। গোবর্দ্ধন নামে তাঁহার এক জন একচক্ষু কর্ম্মচারী ছিল। গোবর্দ্ধন বিষয়-কর্ম্ম বেশ বুঝিত, সেইজন্য সর্ব্বেশ্বরবাবু গোবর্দ্ধনের উপর জমীদারীর অনেক ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের দোষ অনেক ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। গোবর্দ্ধনের ন্যায় চতুর ব্যক্তি তৎকালে বড় কম ছিল, সে সর্ব্বেশ্বরের মনস্তুষ্টি বিষয়ে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ব্যস্ত থাকিত। এদিকে তাহার ন্যায় স্বার্থপর, অর্থলোভী, হৃদয়হীন ব্যক্তি জগতে বড়ই বিরল ছিল। সে একটী চক্ষু বাল্যকালেই হারাইয়াছিল। সেইজন্য লোকে তাহাকে কাণা

গোবর্দ্ধন বলিয়া ডাকিত। তাহাতে গোবর্দ্ধনের রাগের সীমা ছিল না; সমগ্র জগৎকে সে বিষদৃষ্টিতে দেখিত, সকলেই তাহাকে এক চক্ষু বলিয়া উপহাস করিতেছে, ইহাই তাহার মনের ধারণা ছিল। কাজেই সে কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিত না; সকলকেই ঘোর শত্রুবোধে দারুণ ঘৃণা করিত। গোবর্দ্ধনকেও সেইজন্য কেহ দেখিতে পারিত না, বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধ ভিন্ন কেহ তাহার সঙ্গে কোন বিষয়েই মিশিত না; এককথায় দুনিয়ায় গোবর্দ্ধনের কেহ বন্ধু ছিল না। সে যতদূর পারিত একাকী থাকিত ও একাকী থাকিতে ভালবাসিত। ঔদারহৃদয়, উচ্চপ্রাণ সর্ব্বেশ্বরবাবু গোবর্দ্ধনের সকল দোষই ক্ষমা করিতেন। গোবর্দ্ধনের মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, লোকজনের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিত না বা কহিতে ভালবাসিত না। এককথায় নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, কাহারও সহিত সে কথা কহিত না। সর্ব্বেশ্বরবাবু অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, গোবর্দ্ধনের স্বভাব-প্রকৃতি বেশ বুঝিতেন, বুঝিয়াও ভদ্রতাপ্রযুক্ত কোন কথা কহিতেন না। গোবর্দ্ধন মনে করিত সর্ব্বেশ্বরবাবুকে বেশ সে ঠকাইতেছে, আর তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বরবাবুর চাকরী করিয়া দশটাকা বেশ রোজগার করিতেছিল, সর্ব্বেশ্বরবাবু তাহা জানিতেন কিন্তু গোবর্দ্ধনকে তিনি তাহা লইয়া অপ্রস্তুত করিতে চাহিতেন না। গোবর্দ্ধনও সুযোগমত মনিবকে ঠকাইয়া বেশ দশটাকার মুখ দেখিতেছিল। সর্ব্বেশ্বরবাবুর নিকট ভিন্ন গোবর্দ্ধনের অন্য কোন স্থানে অন্ন হইত কি না সন্দেহ। গোবর্দ্ধন বিষয়কর্ম্মে দক্ষ থাকায়, সর্ব্বেশ্বরবাবু তাহার খাপছাড়া ব্যবহার উপেক্ষা করিতেন।

চিত্রগ্রামে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাটীর অনতিদূরে কুমুদনাথ মিত্র নামে একজন ভদ্রলোকের বাস ছিল। ইনি সর্ব্বেশ্বরবাবুর বড়ই বন্ধু ছিলেন। কুমুদনাথ অতিশয় পরোপকারী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু পরোপকার-মহাব্রতে সেই সমস্ত উপার্জ্জিত ধন অর্পণ করায় নিজে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। কুমুদনাথ প্রতিবেশীর দুঃখে সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। যেখানে অর্থানুকূল্য অসম্ভব হইয়া উঠিত, নিজের শারীরিক পরিশ্রম দানে কুমুদনাথ কখনই পশ্চাদ্‌পদ থাকিতেন না। কাহাকে রোগগ্রস্ত দেখিলে, তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাহাতে তাঁহার উচ্চ-নীচ জাতিবিচার ছিল না। পথ্যের অনাটন হইলে নিজে পথ্য পর্য্যন্ত দিয়া আনুকূল্য করিতেন। এক দিন কুমুদনাথ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাত্রি অন্ধকার, প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল, তৎসঙ্গে মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথঘাট জলে পরিপূর্ণ—বজ্রনিনাদে কর্ণকুহর ব্যথিত হইতেছিল—ঘরের বাহির হওয়া দুষ্কর, এমন সময়ে সহসা তাঁহার দ্বারদেশে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। সেই আর্ত্তনাদে কুমুদনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন দ্বারদেশে একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া কুমুদনাথের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে সে স্ত্রীলোক বিশেষ বিপদাপন্না—বহুদূর হইতে কুমুদনাথের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় আগমন করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী বিধবা, যৌবন-সীমা অল্পদিন অতিক্রম করিয়াছে। ছিন্ন-বাস পরিহিতা—মুখে কাতরতা বিশেষ পরিলক্ষিত। কুমুদনাথ বিপন্নের বিপদের বিষয় জানিয়া, কখন চক্ষু বুঁজিয়া থাকিতে পারিতেন না, একণেও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রমণী বলিল,—"মহাশয়,আমি অতি

দুর্ভাগিনী, আমার বাটী ঐ গ্রামের এক প্রান্তে, আমি বিশেষ বিপদে পড়িয়াই এখানে আসিয়াছি—আমার একমাত্র পুত্র সন্তান—বিধবার একমাত্র সম্বল—বসন্তরোগে আক্রান্ত—আজ পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে, প্রতিবেশীমধ্যে কেহই কদর্য্য রোগ বলিয়া আমার বাড়ীতে আসিতেছে না—এদিকে আমি একাকী, বসন্তরোগগ্রস্ত, ঘোরবিকারে চৈতন্য-শূন্য পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য এক জন স্ত্রীলোকের নিকট রাখিয়া মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থনায় আসিয়াছি, আপনি আমার এই বিপদে একমাত্র ভরসা। যে স্ত্রীলোকটীকে বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছি, সে ঘরে প্রবেশ করে নাই, বিলম্ব হইলে সেই বিকারগ্রস্ত পুত্রকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।”

কুমুদনাথ আর কি থাকিতে পারেন? প্রিয়তমা ধর্ম্মে একমাত্র সহায়িনী পত্নী ত্রিপুরাকে সকল কথা বলিলেন। বিশুদ্ধস্বভাবা পতিব্রতা পুণ্যবতী ত্রিপুরা, স্বামীকে তখনই বিধবার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং নিজের সংগৃহীত মুদ্রা হইতে কতকগুলি মুদ্রা কুমুদনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন—“আর বিলম্ব করিও না, বালক ঔষধ ও পথ্যাভাবে মারা পড়িতে পারে, তুমি যাও, ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত কর। বসন্তরোগ—বড়ই সংক্রামক কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।” বিধবা বলিল, “মহাশয় বিলম্ব হইলে সেই স্ত্রীলোকটী চলিয়া যাইবে”—কুমুদনাথ পতি-পরায়ণা ত্রিপুরাসুন্দরীর আগ্রহব্যঞ্জক মুখখানির প্রতি চাহিলেন। সেই মুখে কত ভক্তি, কত প্রীতি, কত মাধুরী প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া কুমুদনাথের মনে কতই আনন্দের সঞ্চার হইল। কুমুদনাথ আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিলেন, স্ত্রীলোকের বুকে কত সাহসের সঞ্চার হইল। সে বলিল “মহাশয়, পথ্যাভাবে, বিনা ঔষধে বালকটীর প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা।

আমি একাকী দিনরাত বালকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছি, এমন কেহ নাই যে সাহায্য করে।" মাতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পুত্রের সেবায় নিযুক্তা, সেইরাত্রে বালকের পীড়া বিশেষ বাড়িয়াছে, বালক ভুল বকিতেছে, বিকারগ্রস্ত রোগীর সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়াছে, এমন কেহ নাই যে,পরামর্শ পর্য্যন্ত দেয় ; বিধবা অনন্যগতি হইয়া সেই গভীর রজনীতে—সেই দুর্য্যোগের মধ্যে, দুঃখীর একমাত্র সহায় কুমুদনাথ বাবুর সাহায্যপ্রার্থনায় বাহির হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠিয়াছে, সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, মাতা, পুত্রের কথা কুমুদনাথকে বলিতে আসিয়াছে, জানে কুমুদনাথের কোমলহৃদয় তাহার বিপদে কখনই স্থির থাকিবে না ; কুমুদনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া একটী ছাতি লইয়া, স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গ্রাম্য রাস্তা বৃষ্টিপতনে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বৃষ্টি তর তর পড়িতেছে, ঝড়ে বৃক্ষগণ দুলিতেছে, বিদ্যুৎমালা থাকিয়া থাকিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রধ্বনিতে কর্ণকুহর ভেদ হইতেছে ; সমস্ত মাথার উপর করিয়া, কুমুদনাথ বিপন্নের বিপদ নিবারণ করিতে চলিতে লাগিলেন। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, এক দিকে মাতার প্রাণ নিজ পুত্রের বিপদে অবসন্না—অন্যদিকে দুঃখীর দুঃখে সমবেদনাশীল কুমুদনাথের হৃদয় বিধবার কাতরোক্তি শ্রবণে বিগলিত। উভয়ে ত্বরিতগতিতে সেই কর্দ্দমসঙ্কুল গ্রাম্যপথ বিদলিত করিয়া চলিতেছেন, কতক্ষণ পরে দুইজনে বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুমুদনাথ যাহা দেখিলেন,তাহাতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল,নয়নে জলধারা দেখা দিল ' দয়া ! তুমি যাঁহার সৃজিত না জানি তিনি কত দয়াবান্ ! তাঁহাকে আমাদের নমস্কার, তুমি না থাকিলে আজ এই ভগবানের খেলার গৃহ এই পৃথিবী আজ এই বৃক্ষলতাসমন্বিত পৃথিবী—ঘোর মরু অপেক্ষা

ভয়ঙ্কর স্থান হইয়া দাঁড়াইত। কুমুদনাথের ন্যায় হৃদয়বান্ লোক না থাকিলে, দয়াময়ের শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্যনামে কলঙ্ক পড়িত। কুমুদনাথ সমস্ত রাত্রি বালকের শুশ্রূষা করিলেন, অসঙ্কুচিত-চিত্তে বালকের শয্যা-পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। বিধবাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজেই মাতার ন্যায় বালকটীর যন্ত্রণার উপশমে সচেষ্ট রহিলেন প্রভাত হইল, চিকিৎসক আনাইয়া ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, রোগীর রোগের সমস্ত ব্যয় স্কন্ধে লইয়া কুমুদনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দিন দিন বালকের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন দিন কুমুদনাথের রোগ নিবারণের যত্নও সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। তিনি একে একে সকল প্রতিবেশীকে রোগীর শুশ্রূষার জন্য অনুরোধ করিলেন, কত লোককে অর্থদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বসন্তরোগীর সেবায় কেহ সম্মত হইল না। বালকের মাতাও তিনচারি দিন মধ্যেই বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল। তখন কুমুদনাথ ত্রিপুরাকে সমস্ত জানাইয়া বলিলেন, "এখন কি করা যায়? বালকের মাতাপর্য্যন্ত বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল। বালক ও বালকের মাতা উভয়েরই সেবার আবশ্যক। কিন্তু এক জন লোকও ত অগ্রসর হইতে চায় না। টাকা কড়ি দিতে চাহিলে উপহাস করে, বলে প্রাণ গেলে টাকা লইয়া কি হইবে"। ত্রিপুরা দেবী স্বামীর মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, "চল, আমি যাইব, যত দিন না পথ্য পায় আমি নিজে তাহাদের সেবা করিব। মাঝে মাঝে আসিয়া ছেলে মেয়েদের দেখিয়া যাইব। তুমি আমার যাতায়াতের একখানি পাল্কীর বন্দোবস্ত কর। দাসী চাকরেরা যেন ছেলে মেয়েদের ভাল করিয়া দেখে শুনে।"

কুমুদনাথের আর আহ্লাদ ধরে না, পত্নী মনের মত হইলে পতির সুখের সীমা থাকে না। কুমুদনাথ ত্রিপুরাসুন্দরীকে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী সকল গুণেই গুণশালিনী ছিলেন। এক্ষণে গুণের পরিচয়ের প্রকৃত সময় উপস্থিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ত্রিপুরাসুন্দরী অগ্রসর হইয়াছেন। বালক ও বালকের মাতা বসন্তরোগে আক্রান্ত। প্রতিবেশীমণ্ডলী কেহই সে স্থানে যাইতে চাহে না, বালকটীর সহিত কুমুদনাথের কোনরূপ সম্বন্ধই নাই, তাহাতে তাহাদের বাসস্থান কুমুদনাথের বাটী হইতে বহুদূরে—গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত, বাটীর নিকটে হইলেও কেহই তথায় যাইতে চায় না, এরূপ অবস্থায় কুমুদনাথ ও ত্রিপুরাসুন্দরী যেরূপে বালকের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা জগতে বড়ই বিরল-দৃশ্য! সে যাহা হউক, কুমুদনাথ পত্নীর আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে বড়ই প্রীত হইলেন। স্ত্রীকে পরোপকারের কারণ জীবনকে তুচ্ছবোধ করিতে দেখিয়া, কুমুদনাথের হৃদয়ে কি যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল, তাহা কুমুদনাথ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না। তখন কুমুদনাথ আপনাকে বালকের ও আপন স্ত্রীকে বালকের মাতার সেবায় নিযুক্ত করিলেন। বালকের মাতা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিল। কুমুদনাথ তাঁহার সৎকারাদির সমস্ত ব্যয় নিজ হইতে বহন করিলেন, বালক মাতার মৃত্যু জানিতে পারিল না। তখন তাহার পীড়া অতিশয় উৎকট হইয়াছিল, সে প্রায়ই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত। কুমুদনাথের যত্নে বালকটী পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। বালক রোগমুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার একটী চক্ষু অন্ধ হইল। বালকের নাম গোবর্দ্ধন। জাতিতে কায়স্থ, উপাধি ঘোষ।

গোবর্দ্ধন আপনার মাতার মৃত্যুসংবাদে যত না ব্যথিত হইল, নিজের চক্ষু নষ্ট হওয়াতে সে তদপেক্ষা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, গোব-

র্দ্ধনের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর। সে রোগমুক্ত হইয়া কিছুকাল কুমুদনাথের আশ্রয়ে বাস করিল। কুমুদনাথ নিঃসহায় বালকটিকে আপন বাড়ীতে আনিয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পরে কুমুদনাথ সর্ব্বেশ্বরবাবুকে তাঁহার জমীদারীর কার্য্যে গোবর্দ্ধনকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কুমুদ-নাথের অনুরোধে সর্ব্বেশ্বরবাবু গোবর্দ্ধনকে জমীদারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। গোবর্দ্ধন আপন বুদ্ধিবলে শীঘ্রই জমীদারী-কার্য্যে দিন দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, কুমুদনাথের আনন্দের সীমা ছিল না। মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া, গোবর্দ্ধন যে আপন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কখন কষ্ট পাইবে না, ইহাতে কুমুদনাথ বড় আনন্দলাভ করি-লেন। ইহার পর কুমুদনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বরের জমীদারীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ দেওয়ানের কার্য্যে উন্নীত হইয়াছিল। মৃত্যুর সময় কুমুদনাথ তাঁহার পরিবারের তত্ত্বাবধারণের ভার গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া দিয়া যাইতে চাহেন। কুমুদনাথ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, গোবর্দ্ধন তাহা জানিত; বরং অপরিমিত দানের কারণ কুমুদনাথকে ঋণগ্রস্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়া-ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,গোবর্দ্ধনের উন্নতি দর্শনে কুমুদনাথের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবিদ্য-মানে গোবর্দ্ধন তাঁহার পরিবারবর্গের কষ্ট কখনই দেখিতে পারিবে না। গোবর্দ্ধনের তখন বেশ ভাল সময়। দেওয়ানী কার্য্য হইতে গোবর্দ্ধনের বেশ আয় হইতেছে, গোবর্দ্ধন এরূপ অবস্থায় কখনই কুমুদ-নাথের পরিবারের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবে না, এই বিশ্বাসে কুমুদনাথ মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীকে গোবর্দ্ধনের সাহায্য-গ্রহণ করিতে বলিয়া যান। তিনি বলেন, "আমি তোমাদের জন্য

কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারিলাম না, অধিকন্তু তোমাদের ঋণগ্রস্ত করিয়া চলিলাম। কিন্তু গোবর্দ্ধন রহিল, তাহাকে জ্যেষ্ঠপুত্র-জ্ঞানে লালন-পালন করিয়াছ, সেই তোমাদের সকল ভার লইবে।” এই কথা বলিয়া কুমুদনাথ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মৃত্যুকালে সর্ব্বেশ্বরবাবু প্রভৃতি গ্রামের সমস্ত লোকই কুমুদ-নাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদনাথের মৃত্যুতে সকলেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রামের দেব-মন্দির হইতে যবন কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তি অপসারিত হইলে, গ্রামবাসিগণ যত না ব্যথিত হইত, কুমুদনাথের পরলোকগমনে সকলে তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না, গোবর্দ্ধন কুমুদনাথের মৃত্যুকালে আসিতে পারে নাই। গোবর্দ্ধনের ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া-ছিল সে তখন স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেছিল। জীবনদাতা কুমুদনাথের মৃত্যুকালে সে যে কি জন্য আসিতে পারে নাই তাহার কারণ অনেকে অনেকরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু গোবর্দ্ধন রহিল, গোবর্দ্ধন আমার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এই ধারণায় মৃত্যুকালে কুমুদনাথের হৃদয়ে অনেক পরিমাণে উদ্বেগের শান্তি হইয়াছিল। কুমুদবাবু এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান পুত্রেরনাম রাজীব, কন্যার নাম চারুবালা।

কয়দিন গোবর্দ্ধনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর নাম কৌশল্যা, কৌশল্যা আর গোবর্দ্ধন ভগবানের অপূর্ব্বসৃষ্টি—উভয়ে উভয়ের তুলনা। গোবর্দ্ধন যেমন স্বার্থপর, অর্থলোভী, হৃদয়হীন, সেই সঙ্গে সঙ্গে চতুরচূড়ামণি ছিল, কৌশল্যাও ঠিক সেইরূপ আত্মম্ভরী ছিল ও

টাকাকড়ি ভালবাসিত। তাহার হৃদয় যেরূপ দয়ামায়াবর্জ্জিত শুষ্ক মরুভূমি সমান, আবার সে সেইরূপ প্রবল মুখরা, গর্ব্বিতা, কলহ-প্রিয়া। অতি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, সহসা টাকাকড়ির মুখ দেখিতে পাইলে, লোকে প্রায়ই যেরূপ গর্ব্বিত হয়, কৌশল্যার পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু অর্থে বিশেষ লোভ থাকায়, কৌশল্যা আপনার সতীত্বরত্নের বিনিময়ে নিজ সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রায় পূর্ণ করিতে কখনই আলস্য করিত না। কৌশল্যা সুন্দরীর অগ্রগণ্যা ও নানারূপ হাবভাবে বিশেষ নিপুণা থাকায়, পুরুষ মজাইতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ধনলুণ্ঠন কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত থাকিবার কারণ গোবর্দ্ধনের ধনাগার শীঘ্রই ধনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

গোবর্দ্ধন ও কৌশল্যা একদিন নিজকক্ষে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিল। কেহ কখন তাহাদিগকে প্রণয়ালাপ করিতে শুনে নাই। যখনই স্ত্রী-পুরুষে কথাবার্ত্তা হইত টাকাকড়ির প্রাচুর্য্য-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গ তাহাদিগের মধ্যে চলিতে দেখা যাইত না। এদিনও সেই সব লইয়া কথা চলিতেছিল। এদিকে গোবর্দ্ধন বসন্তরোগে এক চক্ষু হীন হইবার জন্য ও বসন্তের দাগ তাহার মুখমণ্ডলে দীপ্তিমান থাকায়, গোবর্দ্ধনের মুখ অতিশয় কদাকার দেখাইত। কৌশল্যা নিজে পরমাসুন্দরী, রূপের গৌরবে সে মাটিতে পা ফেলিয়া হাঁটিত না ; অত-এব কুৎসিত-কদাকার-পতি মহাশয়কে সে মনে মনে অতিশয় ঘৃণা করিত। সে যখন দর্পণে আপন রূপরাশি নিরীক্ষণ করিত, যখন সেই ঢলঢল হরিণ-নয়নে আপন বদনের সৌন্দর্য্য দর্শনে আপনি গলিয়া পড়িত, সেই সুঠাম সুগোল বাহুদ্বারা সুকুঞ্চিত কেশরাশি বিন্যাস করিতে করিতে যখন আপনার রূপে আপনি বিভোর হইত, যখন তাম্বূলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর

ঈষৎ প্রভিন্ন করিয়া মুক্তাগঞ্জিত শুভ্র দশনপংক্তি বিকসিত করিত, আর মৃদু-মধুর হাস্যের ছটায় আপনি দিশাহারা হইত, তখন সে কখন কখন বিধাতার কাছে নিজপতির কুরূপ লইয়া অভিযোগ অনুযোগ করিত বটে কিন্তু স্বামীমহাশয়ের সর্ব্বেশ্বরের ধনাপহরণ সম্বন্ধে অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া সে অভিযোগ অনুযোগ তখনি ভুলিয়া যাইত। সে দরিদ্রের কন্যা টাকাকড়ির মুখ কখনই পূর্ব্বে দেখে নাই। একসঙ্গে দশ-টাকা কখন দেখিয়াছিল কিনা তাহা তাহার মনে পড়িত না। এক্ষণে স্বামীর অনুগ্রহে রাশি রাশি অর্থের অধিকারিণী হওয়ায় স্বামীকে বাহ্যিক কিছু কিছু যত্ন করিত। এদিন সর্ব্বেশ্বরের একখানি জমী-দারীর বেনামিতে পত্তনি লইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু তেমন বিশ্বাসীলোক দৃষ্টিগোচরে না থাকায় দুইজনকে বড়ই ম্রিয়মান হইতে দেখা যাইতেছিল।

গোবর্দ্ধন গ্রামের একপ্রান্তে আপন ধনে এক সুদৃশ্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিল। লোকে কখন বা গোব-র্দ্ধনকে কাণা গোবর্দ্ধন, কখন বা দেওয়ানজী বলিত। কাণা গোবর্দ্ধন কথাটী গোবর্দ্ধনের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিত এবং কুমুদনাথ যত্ন করিলে হয়ত তাহাকে চক্ষুটী হারাইতে হইত না—তাহাকে কেহ কাণা বলিতে পারিত না, অতএব তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ কুমুদনাথ ও কুমুদনাথের পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী, তাহার মনে মনে এই ধারণা বাল্যকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং সে ধারণা বয়োবৃদ্ধির সহিত গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। সে সর্ব্বদাই ভাবিত যে কুমুদনাথের অযত্নেই তাহার চক্ষুটী নষ্ট হইয়াছে। যত্নের সহিত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলে তাহার চক্ষুটী নষ্ট হইত না। ইহাতে

সে কুমুদনাথের উপর বাল্যকাল হইতেই বড়ই চটিয়াছিল। যতদিন যতদিন সে নিঃসহায় ছিল—কুমুদনাথের আশ্রয় ত্যাগ করিলে তাহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে, যতদিন তাহার এ সংস্কার ছিল, ততদিন সে মনের রাগ মনেই পুষিয়া আসিতেছিল. স্বাধীন হইয়া কুমুদনাথের উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু নানাকারণে সে প্রতিশোধ লইবার সুবিধা পায় নাই এবং কুমুদনাথের মৃত্যুকালে কুমুদনাথের সহিত সেইজন্য সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই। সেই রাগ এক্ষণে কুমুদনাথের পরিবারবর্গের উপর জাতক্রোধে দাঁড়াইয়াছিল। কি প্রকারে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া কুমুদনাথের অপরাধের প্রতিশোধ লইবে. তাহাই দিবারাত্র তাহার জপমালা হইয়া উঠিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের আক্রোশ দিন দিন ত্রিপুরাসুন্দরীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। ত্রিপুরাসুন্দরী প্রাণপণে তাহার মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন—সে তাহা জানিত, কিন্তু মাতার সেবায় সময় নষ্ট না করিয়া, যদি যত্নের সহিত ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার সেবায় নিযুক্তা থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাকে চক্ষুরত্ন হারাইতে হইত না—লোকে তাহাকে কাণা বলিয়া ডাকিতে পারিত না—অতএব ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার নিকট শত অপরাধে অপরাধিনী। ইহার প্রতিফল দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক, এইরূপ জল্পনায় গোবর্দ্ধন সততই ব্যস্ত থাকিত। কুমুদনাথ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে তিনি নিজেই গোবর্দ্ধনের কৃতজ্ঞতার মধুর-আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তিনি গোবর্দ্ধনের হাত এড়াইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, ইহাতেও গোবর্দ্ধনের সময়ে সময়ে বড়ই ক্লেশের সঞ্চার হইত। "কুমুদনাথকে নাকের জলে, চোকের জলে করিতে পারিলাম না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় ?"—এইরূপ চিন্তা কতদিন গোবর্দ্ধনের মনে উদিত হইয়াছিল।

এক্ষণে তাঁহার নিরীহ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর প্রতিশোধরূপ কশাঘাত
করিতে গোবর্দ্ধন বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কুমুদনাথ গোবর্দ্ধনের জীবন-
দাতা—আশ্রয়দাতা—পরশেষে তাঁহারই অনুরোধে সর্ব্বেশ্বরের সংসারে
চাকরী প্রাপ্ত হইয়া গোবর্দ্ধন আজ সকল সুখের অধিকারী; কিন্তু
কুমুদনাথের পরোপকার-ব্রত আজ তাঁহার পরিবারবর্গের যন্ত্রণার কারণ
হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গোবর্দ্ধনের জীবনদান দিয়া কি সর্ব্বনাশের
বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে বুঝিতে পারেন নাই.
কৃতঘ্ন গোবর্দ্ধনের হস্তে তাহার পরিবারবর্গকে কিরূপে সেই বৃক্ষের ফল
ভোগ করিতে হইবে, তাহা আমরা পরে বিবৃত করিব। কুমুদনাথ
গোবর্দ্ধনের জীবন দান দিয়া, পরে তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া যে
বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল তাঁহার পরিবারবর্গ যদি
না ভোগ করে, তবে আর আমরা এ সংসারকে পুণ্যের সংসার কিরূপে
বলিব? কুমুদনাথের মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই কুমুদনাথের
পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। কুমুদনাথ একে
পরিবারবর্গের কোন সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার
উপর তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল। মহাজনেরা একে একে
টাকার তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল, এ স্বার্থপর-জগতে কেহ
গুণের পক্ষপাতী নহে, সকলেই স্বার্থের দাস—সকলেই স্বার্থের ক্রোড়ে
চিরবিক্রীত। কুমুদনাথ যে সমস্ত দেব-দুর্লভ গুণের পরিচয় দিয়া-
ছিলেন, তাহা তাঁহার সঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বাচিয়া
থাকিলেও তাঁহার অনন্যসাধারণ-দাতৃত্ব, পরোপকার ব্রতে সর্ব্বস্ব
উৎসর্গ,- তাঁহার কায়মনোবাক্যে পরহিত চিন্তা এ সমস্ত গুণ তাঁহাকে
মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তুমি
একজন ভাল লোক, বেশ ভালই—আমি তোমাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ

যদি দিই যথেষ্ট—তা বলিয়া তুমি মহাজনের টাকা পরিশোধ না করিবে কেন? এইরূপ ধারণা অনেকের। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মহাজনের কঠোর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া, তোমাকে যদি ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়া থাকে, পথ্যাভাবে রোগ-মুক্ত দরিদ্রের যদি জীবন যাইবার আশঙ্কায় তোমার হৃদয় কাঁদিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য যদি তুমি ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া থাক, তাহা সংসারে কাহারই ভাবিবার বিষয় নহে। তুমি ঋণ করিয়াছ পরিশোধ করিবে, বোকার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাক, তুমি ভুগিবে—তোমার পরিবারবর্গে সহ্য করিবে! তাহাতে এ সংসারের আর কাহারই ক্ষণমাত্র উদ্বিগ্ন হইবার কথা নহে। তাই বলিতেছিলাম, মহাজনেরা কুমুদনাথের ঋণের কারণ বিলক্ষণ অবগত ছিল—যে টাকা ঋণ ছিল তাহা তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারিত কিন্তু আমরা বলিয়াছি এ সংসারে কেহ পরের গুণের পক্ষপাতী নহে, সকলেই স্বার্থের দাস; মহাজনেরা তাই পুরুষপরম্পরাগত নিয়মের বাধ্য হইয়া কুমুদনাথের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া টাকা আদায়ের পন্থায় রহিয়াছিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বাটীর তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া যত পারিলেন ঋণ শোধ করিলেন, পরে বাকী ঋণের জন্য বাটী বাধা পড়িল। অন্নাভাবে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, যাঁহার বাটী হইতে কখন অতিথি ফেরে নাই, যেখানে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করিয়া অতিথিগণ সঙ্গে সঙ্গে পরম পরিতোষের সহিত দুই হাত তুলিয়া কুমুদনাথকে আশীর্ব্বাদ করিত, অতিথি-কোলাহলে যে কুমুদ-নাথের বাটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সামান্য দিন কুমুদনাথের মৃত্যু হইয়াছে, সেই বাটী ঋণদায়ে বাধা পড়িল, সেই বাটীর পরিবার-বর্গকে অন্নাভাবে উদ্বিগ্ন হইতে হইল, ভগবানের রাজ্যে সকলই

সম্ভবে। সে যাহা হউক, কুমুদনাথের পরিবারবর্গ আজ অন্নাভাবে বড়ই ব্যতিব্যস্ত। ক্রমে ক্রমে জমী ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় হইতে বসিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে অনেক আনুকূল্য হইত। এইরূপে কতকদিন চলিল, পরে আর দিন চলে না এমন হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে জমী প্রভৃতি যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া কিছুদিন অন্নের সংস্থান হইল; পরে আর চলে না, এক একদিন উপবাসে কাটিতে লাগিল। কুমুদনাথ হইতে যাহাদের অনেকপ্রকার উপকার হইয়াছিল, তাহারা একে একে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যাহারা দিবারাত্র বাড়ী ছাড়িত না, তাহারা বাড়ীতে একবারও পদার্পণ করিতে চাহিল না; ডাকিয়া পাঠাইলে কত ওজর-আপত্য আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ত্রিপুরা-সুন্দরী দুঃখে অভিমানে কাহার নিকট যাইতেন না। একদিন যাঁহার হস্ত হইতে কত কত লোকের আহারের সুব্যবস্থা হইয়াছে, আজ সেই ত্রিপুরাসুন্দরী পরের নিকট নিজের বা নিজের বালক-বালিকা-দিগের আহারের ব্যবস্থার জন্য যাইতে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। কুমুদনাথ সেদিন কত লোককে অন্নদানে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, কত লোককে মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করিয়াছেন, আজ সেই কুমুদনাথের ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা অন্নাভাবে লালায়িত। যাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে দশবার না আসিলে দিনটা বৃথা জ্ঞান করিত, এক্ষণে তাহাদের ডাকিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা বাটীর অন্নদাস ছিল, তাহারা কুমুদনাথের পুত্র-কন্যাকে এক্ষণে দুঃখী বলিয়া উপহাস করে—ঘৃণা করে। কুমুদনাথ যেখানে চাকরী করিতেন, সেখানে দরখাস্ত পাঠান হইল, পত্রের উত্তরে আফিস উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। ত্রিপুরা রাজীবকে স্কুল হইতে

ছাড়াইয়া লইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট জমীদারীর কার্য্য শিখাইবার জন্য পাঠাইবেন মনে মনে স্থির করিলেন। তাঁহার মনে এখনও আশা ছিল যে, গোবর্দ্ধন রাজীবের একটা না একটা উপায় করিবে। কিন্তু এতটা কষ্টে দিন যাইতেছে, গোবর্দ্ধন নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিয়াছে, তথাপিও সে, সে কষ্ট দূর করিবার কোন উপায় করিতেছে না, ত্রিপুরাসুন্দরী এক একবার এইরূপ ভাবিতেন ও গোবর্দ্ধনের নিকট সাহায্যের আশা-ভরসা তাঁহার মনেই বিলীন হইয়া যাইত। তিনি তখনও জানেন নাই যে, তাঁহার স্বামী গোবর্দ্ধনের নিকট কি ঘোর অপরাধে অপরাধী। কুমুদনাথের পরিবারবর্গের সর্ব্বনাশের জন্য যে গোবর্দ্ধন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা ত্রিপুরাসুন্দরী স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা পূর্ব্বে গোবর্দ্ধনের যে সমস্ত উপকার করিয়াছেন, গোবর্দ্ধন কি সমস্তই ভুলিয়াছে? ভগবানের শ্রেষ্ঠজীব মানুষ কি এতই কঠিন হৃদয় হইতে পারে? সরলহৃদয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে একদিন গোবর্দ্ধনের বাটীতে গমন করিলেন।

গোবর্দ্ধন ও কৌশল্যার মধ্যে নীরবে প্রেমালাপ চলিতেছে, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ত্রিপুরাসুন্দরী আসিয়াছে। গোবর্দ্ধন পূর্ব্ব হইতেই কুমুদনাথের পরিবারবর্গের দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে কোনরূপ দুঃখিত হওয়া বা দুঃখমোচনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক্, কুমুদনাথের পরিবারবর্গ যাহাতে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, সেই বিষয়ে সে বিধিমত চেষ্টা করিতেছিল। এক্ষণে ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা শুনিয়া গোবর্দ্ধনের হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। কুমুদনাথ যে

তাহার কোনদিন কোনরূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনোমধ্যে একবারও উদিত হইল না, ঘোর কৃতঘ্ন, নরপিশাচের মনে ত্রিপুরাসুন্দরী যে তাহার প্রতি সন্তানোচিত ব্যবহারে তাহাকে বহু-দিন ধরিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন, মাতৃহীন বলিয়া রাজীবের অপেক্ষা অধিকতর যত্নে ত্রিপুরাসুন্দরী গোবর্দ্ধনকে যে আপন বাটীতে স্থানপ্রদান করিয়াছিলেন—শুধু স্থানপ্রদান নহে, যাহাতে গোবর্দ্ধন মাতার মৃত্যুজনিত অভাব জানিতে না পারে, সেইজন্য দিবারাত্র অতি সন্তর্পণে, অতি আদরের সহিত গোবর্দ্ধনকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের সে সব কথা একবারও মনোমধ্যে উদিত হইল না। রাজীবের সহিত একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একরূপ বস্ত্র পরিধান, একরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে যে কুমুদনাথের বাটীতে মাস, বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল, সে কথা কৃতঘ্নের মনোমধ্যে একবারও উদিত হইল না। কুমুদনাথ ত্রিপুরাসুন্দরীর আশ্রয় না পাইলে তাহাকে যে এতদিন শৃগাল-কুকুরের অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত, তাহা সে একবারও বিবেচনা না করিয়া, ত্রিপুরাসুন্দরী যে তাহার দ্বারদেশে কাঙ্গালিনীবেশে দণ্ডায়মানা, তাহাতেই তাহার আনন্দের সীমা রহিল না, সে ত্রিপুরাসুন্দরীর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই দুর্দশা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিবে, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? কৌশল্যা উঠিয়া গেল। দাসী ত্রিপুরাসুন্দরীকে গোবর্দ্ধনের ঘর দেখাইয়া দিল। ত্রিপুরাসুন্দরী গোবর্দ্ধনের গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিলেন;—ভাবিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন তাঁহাকে সেই বিধবার বেশে দেখিয়া নিজেও কাঁদিবে; কিন্তু তাঁহার সে বিশ্বাস শীঘ্রই দূরীভূত হইল। গোবর্দ্ধন পরুষস্বরে বলিল, "এখন কাঁদিলে কি হইবে? লোকের উপর অত্যাচার করিলে এইরূপই ভুগিতে হয়।"

ত্রিপুরা গোবর্দ্ধনের কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "বাবা গোবর্দ্ধন, স্বপ্নেও ত আমি কাহার উপর অত্যাচার করি নাই।"

গোবর্দ্ধন।—করেন নাই! তা সত্য, তবে গোবর্দ্ধনের একটী চক্ষু গেল কেন? যদি দুঃখ ভাবিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, একটু ভাল করিয়া একটু সতর্কে সেবাটা করিলে আজ লোকে আমাকে কাণা গোবর্দ্ধন বলিয়া ডাকিত না। জান না কি, তোমার ও তোমার স্বামীর তাচ্ছল্যে আমার পীড়ার বেগ অধিক বাড়িয়াছিল, তাহাতেই আমাকে একটী চক্ষু হারাইয়া এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে; আমি লোকের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়াছি। তোমাদের জন্যই ত আমার এই দুঃখ, এই দুর্দ্দশা।"

ত্রিপুরাসুন্দরী এতক্ষণে সকলই বুঝিলেন তাঁহার ক্লেশে যে গোবর্দ্ধন সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই, তাঁহার বাটীতে আসিলে গোবর্দ্ধন যে যথাযোগ্য সম্মাননা প্রদর্শন করে নাই, অধিকন্তু নিতান্ত পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিল তাহার কারণ ত্রিপুরাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন তাঁহাদের এতটা যত্ন এতটা ক্লেশস্বীকার সমস্তই গোবর্দ্ধনের নিকট বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরার চক্ষু হইতে দর দর জলধারা পতিত হইল। তিনি বলিলেন, "ভগবান্ জানেন, আমরা তোমার উপর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি। রোগে তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, আমাদের সেবার ত্রুটিতে হয় নাই। সে যাহা হউক, আমি চলিলাম, আমি অনেক আশা করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, তা তোমার নিকট আমরা যে এত অপরাধী, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমরা স্বপ্নেও তোমার কোন অনিষ্টের চিন্তা করি নাই। তথাপি তুমি যদি আমাদের দোষে

তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া মনে কর, তবে তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ?”

এমন সময়ে কৌশল্যা সেই ঘরে আসিল এবং বার'বার ত্রিপুরাকে ভগবানের নাম লইতে দেখিয়া রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া গেল। সে বলিল, “চোকখাগি মাগি, ভিটায় দাঁড়াইয়া ভগবান্ দেখা-ইতেছিস্—ভিক্ষে করতে এসেছিস্, ভিক্ষে দেই আঁচলে, ক'রে লইবি, না হয় আস্তে আস্তে চ'লে যাবি—হতভাগা শতেকখোয়ারী মাগি—ভগবান্কে ডেকে এত শাপ দেওয়া কেন বল্ত ? সমানে এখনি ভিটে ছাড় ? না হইলে—”

ত্রিপুরাসুন্দরী কৌশল্যার আকার-প্রকার দেখিয়াই ভীতা হইয়া-ছিলেন, তাহাতে সে তাঁহাকে কতকগুলা অযথা গালি দিতেছে শুনিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। কৌশল্যার সকল কথা তাঁহার কাণে গেল না। “ভগবানের নিকট কত অপরাধ করিয়াছি, নতুবা এত যন্ত্রণা কেন ভোগ করিতে হইবে”, এইরূপ ভাবিয়া তিনি ত্বরিতগতিতে গোবর্দ্ধনের বাটী ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত দুঃখিত মনে আপন বাটীতে আগমন করিলেন। কৌশল্যার আর আহ্লাদ ধরে না। সে ত্রিপুরার সাতপুরুষ ধরিয়া তখনও গালি দিতেছিল। গোবর্দ্ধন তাহাকে গালি দিতে মানা করিয়া বলিল, “মিছা কতকগুলা বকিয়া ফল কি ? আমি কুমুদনাথের বংশাবলীকে গাছতলায় দাড় করাইব। তাহার ভদ্রাসনবাটী যা যেখানে আছে, তাহা নীলামে উঠাইব, ত্রিপুরাসুন্দরীকে পথে পথে ভিক্ষা করাইব, তবে এই আমার চক্ষু-নষ্ট করিবার প্রতিশোধ হইবে।”

কৌ।—রাজীবকে কোন রকমে জেলে পাঠাও, তবে মাগী জব্দ হবে।

গো।—বেশ মতলব দিয়েছ,কালই রাজীবকে আমার অধীনে একটা কাজ দিব, ওদের এখন যেরূপ কষ্ট, রাজীবের কাজের কথা ব'লে পাঠাইলে নিশ্চয়ই কাজ করিতে আসিবে। পরে একটা মিথ্যা চুরীর দাবী দিয়া পুলিশে ধরাইয়া দিব। ত্রিপুরা আজ রাগ করিয়া গেল বটে, ছেলের কাজের কথা শুনিলে এ রাগ আর থাকিবে না।

স্ত্রীপুরুষে এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া দুইজনে মনে মনে বড়ই খুসী হইল। সেদিন তাহাদের বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। হায়! মনুষ্যহৃদয় কি এতই শুষ্ক যে, তাহাতে কৃতজ্ঞতারূপ ব্রততীও অঙ্কুরিত হইতে পারে না? আমরা বলি যদি সকল মনুষ্যই গোবর্দ্ধনের মত হইত, তাহা হইলে এ সংসারের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্করই হইত! এ সংসার তাহা হইলে শ্মশান অপেক্ষাও ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইত।

গোবর্দ্ধন তার পরদিন রাজীবকে ডাকাইয়া চাকরী দিল। হিসাব-নিকাশের সেরেস্তায় রাজীবকে কর্ম্ম শিখিতে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; মাসিক কিছু কিছু বেতনেরও স্থির হইল। ত্রিপুরা যতটা রাগ করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন রাজীবকে চাকরী দেওয়ায় মনে মনে ততটা আপ্যায়িত হইলেন। রাজীব কর্ম্ম শিখিবে, টাকা আনিবে, দুঃখ ঘুচিবে, মাতার বড়ই সুখের বিষয়। বড় কষ্টেই দিন যাইতেছিল, এইবার বুঝি বিধাতা মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। এই আশ্বাসে ত্রিপুরা-সুন্দরী পূর্ব্বকষ্ট ভুলিবেন মনে করিলেন। কুমুদনাথের ঐশ্বর্য্য, কুমুদনাথের দান—কুমুদনাথের পরোপকারিতা—গৃহ ধনজনে পরিপূর্ণ, আহা কি মধুর দৃশ্য! দ্বারে যাচকের কলরব, সে সব কথা এক্ষণে ত্রিপুরাসুন্দরীর স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছিল। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সব ছিল, এক্ষণে সব নীরব। উৎসবের রাত্রি প্রভাত হইলে গৃহস্থের বাটী যেরূপ নীরব নিস্তব্ধতার ভাব ধারণ করে, কুমুদনাথের বাটীর অবস্থা

এক্ষণে সেইরূপ। পাড়ার যাহারা পূর্ব্বে বাটী ছাড়িতে চাহিত না,তাহারা এখন একবারও বাড়ী মাড়ায় না ; যাহারা ত্রিপুরাসুন্দরীর কৃপাকণা পাইবার জন্য কাঙ্গালিনী ছিল, তাহারা এক্ষণে ত্রিপুরার সহিত বাক্যালাপ করে না ; সকলই এক্ষণে স্বপ্নবৎ ; একজনের অভাবে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ত্রিপুরা এ সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছেন। বড় কষ্টে দিন চলিতেছে, রাজীব দশ টাকা আনিবে কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে, ত্রিপুরার তাহাতেই আনন্দ। কোন উচ্চাভিলাষ আর হৃদয়ে নাই ; সুখের দিনেও কোন উচ্চ অভিলাষ ছিলনা তাই রাজীবের সামান্য কর্ম্মেও ত্রিপুরাসুন্দরী সুখবোধ করিলেন। আমাদের উচ্চ অভিলাষই আমাদের সুখের পথের কণ্টক। বাসনা ত্যাগ কর কোন ক্লেশই সংসারে থাকিবে না। দুঃখের সংসারে সুখ আসিবে, অন্ধকার স্থান মহান্ প্রদীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। দুঃখের অবসানে ও সুখের আবির্ভাবে মন শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে। বাসনা নাশমাত্রেই শান্তির স্রোত ধীরে ধীরে হৃদয়ে বহিবে। রাজীবের কর্ম্মের সংবাদে ত্রিপুরার দুঃখক্লিষ্ট মন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

দুই চার মাস এইরূপে কাটিল। হঠাৎ একদিন গোবর্দ্ধনের নিকট সংবাদ আসিল, রাজীব তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়াছে—এ সকলই গোবর্দ্ধনের চক্রান্ত। ইহার পর যাহা করিতে হইবে, গোবর্দ্ধন তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল ; সে রাজীবকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

গো। রাজীব, এ কি কথা ! তুমি না কি তহবিল ভাঙ্গিয়াছ ?

রাজীব নির্দ্দোষী, সে অবাক্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ কথার উত্তর দিতে পারিল না, তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। পরে বলিল, "না।"

গো। ভাঁড়াইলে চলিবে না। তোমায় এখনি পুলিশে দেওয়া হইবে।

রাজীব কাঁদিয়া ফেলিল, সে অনেক শপথ করিল; গোবর্দ্ধন অবিশ্বাসের ভাণ করিয়া বলিল, "ভাঁড়াইলে চলিবে না—সত্য বল, টাকা কি করিলে—কোথায় রাখিয়াছ?" গোবর্দ্ধন গম্ভীরভাবে আরো বলিল, "এ টাকার জন্য তোমায় ত জেলে যাইতেই হইবে, তদ্ভিন্ন তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা হইবে।"

রাজীব। আমি কিছুই জানি না, আমি টাকা ছুঁই নাই, আমি দেবতার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি এর কিছুই জানি না।

গো। কাগজে কলমে দোষ সাব্যস্থ হইয়াছে। তুমি প্রজাদিগের নিকট যে ১৭ই তারিখে ২৮৲ টাকা আদায় করিয়াছিলে, তাহা খাতায় জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছ।

রাজীব। আমি কোন টাকাই প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করি নাই, যে বলিয়াছে, সে সমস্তই মিথ্যাকথা বলিয়াছে, আমি কোন টাকা আজ পর্য্যন্ত ছুঁই নাই। আমি ত কেবল খসড়া খাতা হইতে পাকা খাতায় নকল করি।

গো। তোমার কথা কে শুনিবে, এখনও দোষ স্বীকার কর, মাপ করা যাইবে।

রাজীব চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কতক্ষণ পরে সে গোবর্দ্ধনের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি টাকা লইয়া কি করি-লাম? আমার মাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি আমার নিকট কোন টাকা পাইয়াছেন?

গো। বেশ সাক্ষী—সে ত চোরের মা—

গোবর্দ্ধন এই সুযোগে কুমুদনাথ ও ত্রিপুরাসুন্দরীকে কত গালি দিল—বলিল, "দেখ রাজীব, তোমাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হবে,

তোমার মা বাঁধা পড়িলেও পড়িতে পারে; তোমার বাপ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে শুদ্ধ বাঁধা পড়িতে হইত।" কাল গোবর্দ্ধন যাঁহার বাটীতে অন্ন ধ্বংস করিয়াছে, আজ তাঁহার প্রতি কেমন ব্যবহার! গোবর্দ্ধনের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা নাই বলিলেই হয়। এইরূপ "moral courage" ত চাই!

ইতিমধ্যে পুলিশ ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল। সময়ে পুলিশ আসিল, দারোগাবাবুর সঙ্গে একপাল চৌকীদার আসিল, মাথায় পাগ্‌ড়ী, হাতে লম্বা লম্বা লাঠি, দুই চারজন দফাদারও সেই সঙ্গে আসিল। যেন কত বড় ডাকাতী সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে হইয়া গিয়াছে! দিস্তা দিস্তা কাগজে সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি লেখা-পড়া চলিতে লাগিল। চোর ধরিয়া হাতে দেওয়া হইয়াছে, তথাপি দারোগাবাবুর কপাল হইতে দর দর ঘাম পায়ে পড়িতে লাগিল, যেন কি ভয়ঙ্কর পরিশ্রম দারোগাবাবুকে করিতে হইতেছে। চৌকীদারগণ রাজীবকে চারিদিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পাঠক রঘু ডাকাতের কথা শুনিয়াছেন, সে ধরা পড়িলেও এত বাঁধাবাঁধি হইত কি না সন্দেহ। পাছে রাজীব পলাইয়া যায়, সেই জন্য হাতকড়ি আনয়ন করা হইয়াছে—হাতে দিতে বলিলেই দেওয়া হইবে। দারোগাবাবু রাজীবকে দোষ কবুল করিতে বলিলেন।

রাজীব। মহাশয়! আমি নিরপরাধী—আমাকে যাইতে দিন, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নাই—মাও উপবাসী আছেন—তিনি আমার যাইবার বিলম্বে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন।

দারোগাবাবু রাজীবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া চৌকীদার-দিগকে রাজীবকে 'পাট' করিতে বলিলেন, 'পাট' না করিলে দোষ কবুল করিবে না। পুলিশের ভাষায় প্রহারকে 'পাট' বলে। একজন

চৌকীদার রাজীবের কাণে পাক দিতে লাগিল, রাজীব যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; দারোগা ধমকাইয়া রাজীবকে চুপ করিতে বলিলেন, রাজীব ভয়ে চুপ করিয়া নীরবে কতক্ষণ প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করিল; পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একবার দারোগার ও আর একবার গোবর্দ্ধনের নিকট কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। কাহারও মনে দয়ার উদ্রেক হইল না— দুইজনেই রাজীবকে নিরপরাধী বলিয়া জানে, কিন্তু স্বার্থ এতদুর ভয়ঙ্কর বস্তু যে, তাহার সাধন-সংকল্পে দুই জনেরই হৃদয় তখন বজ্র অপেক্ষা কঠিন ভাব ধারণ করিয়াছিল। দুইজনের তখন এক মন, এক প্রাণ, নিজ নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্— কেহই রাজীবের কথা শুনিল না, রাজীব যতই দোষ কবুল করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, ততই প্রহারের ওজন বাড়িতে লাগিল।

রাজীব। দেওয়ানজী,—আমাকে রক্ষা করুন—আমাকে রক্ষা করুন—বাবা আপনাকে কত ভালবাসিতেন, বাবার কথা স্মরণ করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিন, আমি কোন দোষে দোষী নহি।

গো। এখন পুলিশ না ছাড়িলে আমি কিরূপে ছাড়িব, আমার ছাড়িবার ক্ষমতা নাই।

রাজীব। "দারোগা মহাশয়, আপনি ত বাবার নিকট কতদিন কত টাকা আনিয়াছেন—বাবা আপনাকে কত আদর-যত্ন করিতেন, আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন, প্রায়ই আমাদের বাটীতে থাকিতেন, আমাদের আপনি ভালই জানেন—আমি চোর নহি, আমাকে ছাড়িয়া দিন।" রাজীবের কথাটী সত্য। এই দারোগাবাবু কুমুদনাথের নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত। এমন দিন ছিল না যে, কুমুদনাথের সহিত ভোজন না করিয়াছেন। নানারূপ অছিলায় কত দিন কত টাকা

কুমুদনাথের নিকট হইতে আনিয়াছেন, কখন উপুঁড়-হস্ত করেন নাই অর্থাৎ টাকাগুলি ফেরত দেন নাই। আজ সে কুমুদনাথ নাই, কুমুদনাথের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই, গোবর্দ্ধন অনেক টাকার মালিক হইয়াছে, গোবর্দ্ধন হইতে কতরূপ উপকারের প্রত্যাশা আছে। এই সব ভাবিয়া দারোগাবাবু গোবর্দ্ধনের বড়ই অনুগত। তাহাতে গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে সম্প্রতি বেশ দশ টাকা পুরস্কার মিলিবে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়ায় দারোগা রাজীবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। প্রহারের তাড়নায় রাজীবের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল, তাহার যন্ত্রণায়, তাহার চীৎকারে পাষাণমূর্ত্তির চক্ষু হইতেও অশ্রুকণা বাহির হইত, কিন্তু এ সব বিষয়ে চিরাভ্যস্ত দারোগার হৃদয় অণুমাত্র বিচলিত হইল না। কঠিন-হৃদয়—নর-পিশাচ গোবর্দ্ধনের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাহার পরম শত্রু কুমুদ-নাথের পুত্রের সাজা হইতেছে,তাহাতে গোবর্দ্ধনের হৃদয়ের উপর হইতে যেন কি একটা গুরুভার দূর হইতেছিল। রাজীব যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, প্রহারে দেহ হইতে রুধিরধারা ছুটিতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। রাজীব জল চাহিল, কেহই জল দিল না। রাজীব বলিল, "তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া গেল, একটু জল দেও।" কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিল না। দারোগাবাবু তাহার হস্তে হাতকড়ি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোবর্দ্ধন দারোগার বুদ্ধিমত্তায়, কার্য্য-কুশলতায় বড়ই প্রশংসা করিলেন, দারোগাও দেওয়ানজীর প্রভু-ভক্তি ও প্রভুর টাকাকড়ির উপর দেওানজীর এত দূর সতর্কভাব, এই লইয়া কতই প্রশংসা করিলেন। দুই জন দুই জনের প্রশংসায় কতকটা সময় কাটাইবার পর দেওয়ানজী বাবু গোপনে দারোগা বাবুর সহিত কতক্ষণ কথা কহিলেন ও দারোগার হস্তাভ্যন্তরে শুভ্র-

রজতমুদ্রার ন্যায় যেন কি কতকগুলা স্থাপন করিবার পর দারোগা বাবু রাজীবকে থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং থানায় যে রাজীবকে নিশ্চয়ই দোষ কবুল করিতে হইবে তাহাও দেওয়ানজীকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। রাজীবের তখন চলিবার শক্তি নাই, তাহাকে কোনরূপে টানিয়া টানিয়া থানার দিকে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। পুলিসগারদে রাজীবকে সে রাত্রে থাকিতে হইল। সমস্ত দিবস অনাহার, উপবাস, তাহাতে প্রহারের ভীষণ যাতনায় কোমল-দেহ রাজীব ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল। কুমুদনাথের পরোপকারব্রতের উদ্‌যাপন বিধিমতে আরম্ভ হইল।

সময়ে রাজীবের টাকা তছরুপাতের কথা গ্রামে প্রচার হইল। পুলিসে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, সকলে তাহা জানিতে পারিল, স্থানে স্থানে ঐ কথা লইয়া জটলা হইতে লাগিল। কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা বিশ্বাস করিতে পারিল না, বেহ বা দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ বা বেশ হইয়াছে বলিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিল। কুমুদনাথের পুত্র চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়াছে. সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইল। কিন্তু কাহারও তজ্জন্য দৈনন্দিন কার্য্যের কোন ব্যাঘাত জন্মিল না; রাজীবের সাহায্য জন্য কেহ অগ্রসর হইল না। যাহারা কুমুদনাথের নিকট সহস্র বিষয়ে ঋণী, তাহাদের মধ্যে একজনও রাজীবের বিপদে, রাজীবের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। গ্রামের স্কুলের একজন পণ্ডিত কুমুদনাথের টাকা ধারিতেন, সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয় ঋণ-শোধে সম্পূর্ণ অক্ষম—তাঁহার বাসস্থান পর্য্যন্ত কুমুদনাথের করতলগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় একদিন কুমুদনাথ পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইলেন,

তাঁহাকে ঋণ শোধ করিতে বলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন;—বলিলেন "আমি ঋণশোধে সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন—আপনি আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমার বাসস্থান বিক্রয় করিয়া আপনার ঋণশোধ করিতে হইবে।" এই কথায় কুমুদনাথের প্রাণে বড়ই ক্লেশ বোধ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কুমুদনাথকে শত আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। দারোগা মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত মহাশয় হয় ত রাজীবের কিছু উপকার করিতে পারিতেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় যখন শুনিলেন যে, রাজীব চুরীতে ধরা পড়িয়াছে, তখন অম্লানবদনে বলিলেন, "কাচের খনিতে পদ্মরাগের জন্ম হয় না, যেমন পিতা, তাহার সেইরূপ পুত্রেরই সম্ভাবনা। কুমুদনাথ যেমন পাষণ্ড ছিল,তাহার পুত্র সেইরূপ—মহাপাতকী হইয়াছে।"অম্লানবদনে সর্ব্বজন সমক্ষে পণ্ডিত মহাশয় কুমুদনাথের শত শত নিন্দাবাদ করিলেন; ক্রোধে তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় রাজীবের চির-কারাবাস প্রার্থনা করিলেন। এক জন পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! কুমুদনাথের দোষটা কি? তিনি ইচ্ছা করিলে আপনার ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারিতেন; তাহা না করিয়া আপনাকে সমস্ত টাকা রেহাই দিয়াছেন, কুমুদনাথের নিন্দা করা আপনার সাজে না। তিনি একজন যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন।"

পণ্ডিত। "রেখে দাও,রেখে দাও, সে বেটা আমাকে কত হাঁটাইয়া তবে রেহাই দিয়াছে। আমরা হ'লে লোককে অত কষ্ট কখন দিতাম না। সে বেটা আবার ভদ্রলোক ছিল! ভদ্রলোক হইলে তাহার ছেলে কখন চোর হইত না।" এইরূপ আস্ফালন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় রাজী-

বের যাহাতে অব্যাহতি না হয়, সেই কথা বলিবার জন্য দারোগা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

এইরূপ অনেকেই কুমুদনাথের পুত্রের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিল; কিন্তু কুমুদনাথ প্রতিবেশীমধ্যে কাহাকেও যদি এরূপ বিপদে পড়িতে শুনিতেন, সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তাহার উদ্ধার চেষ্টা করিতেন। একজন গ্রামের দরিদ্রা বৃদ্ধারমণী কুমুদনাথের নিকট কিছু কিছু মাসহরা পাইত। কুমুদনাথের মৃত্যুর পর অগত্যা সে মাসহরা বন্ধ হইল। বৃদ্ধা একদিন ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট গিয়া আপন মাসহরা চাহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া মাসহরাদানে নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা ত্রিপুরার বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া এবং ত্রিপুরা কৌশলে তাহার মাসহরা বন্ধ করিল ভাবিয়া কত অভিসম্পাত করিতে করিতে ত্রিপুরার বাটী হইতে চলিয়া আসিল। আজ রাজীবের কথা তার কর্ণগোচর হওয়ায় সেই বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না—সে "ভগবান্ এখনও সুবিচার করিতেছেন"—"এখনও দিন রাত হইতেছে," "মাগীর আরো কত শাস্তি আছে।" এই সব কথা বলিয়া নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাজীব এ দিকে পুলিস-গারদে কখন পিতাকে কখন মাতাকে উদ্দেশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য দারোগাকে শত শত অনুরোধ করিল। দারোগা মহাশয় সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না।

যথাসময়ে ত্রিপুরাসুন্দরী পুত্রের বিপদের কথা শুনিলেন; ক্রমে ক্রমে পুত্রের উপর যে সমস্ত পীড়ন, অত্যাচার, প্রহার হইয়াছে, তাহাও শুনিতে পাইলেন; রাজীব পুলিসের হস্তে পুলিসের গারদে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিলেন। গোবর্দ্ধন যে চক্রান্তের

মূলীভূত, তাহা ত্রিপুরা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না—মানুষ যে এতদূর পাষণ্ড হইতে পারে, সরলস্বভাবা ত্রিপুরাসুন্দরীর তাহা বোধগম্য হয় নাই। রাজীব তহবিল ভাঙ্গিয়াছে, এ কথা তিনি একেবারেই অবিশ্বাস করিলেন। "দুধের বালক টাকা ভাঙ্গিয়া কি করিবে? সে টাকা চুরী করিলে ত আমাকেই আনিয়া দিবে" এইরূপ ত্রিপুরাসুন্দরী যতই ভাবিলেন, ততই রাজীব যে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, এই বিষয় তিনি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন এবং তিনি রাজীবকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। ইহার মধ্যে তবে ব্যাপারটা কি, তাহা তিনি ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিলেন না। যদিও তিনি এই সমস্ত মিথ্যা ঘটনা কাহার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কে এই ষড়যন্ত্রের মূল, তাহা বুঝিতে পরিলেন না বটে, তথাপি রাজীব যে একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কারণ কি?—কেন এরূপ ষড়যন্ত্র রাজীবের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কি করিলে রাজীবের উদ্ধার হইবে,এই ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কেহই ত বন্ধু নাই। দরিদ্রের বন্ধু কেহই থাকিতে পারে না। তবে কোথায় যাইবেন?—কে তাঁহাকে এই বিপদে সৎপরামর্শ দিবে—কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম স্তরে স্তরে ভেদ হইতে লাগিল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কি কেহই নাই, যিনি ত্রিপুরার এই অবস্থায় তাঁহার মনোবেদনা উপশমবিষয়ে যত্নবান্ হয়েন? কই, ত্রিপুরাসুন্দরী এরূপ লোক মনোমধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। সর্ব্বেশ্বর বাবুর টাকার লোকসান হইয়াছে—সর্ব্বেশ্বর বাবু কি এরূপ অবস্থায় রাজীবের অনুকূলে কোন কথা কহিবেন?—তাঁহাকে না

বলিয়াই কি রাজীবকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে ? এই সব ভাবিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট যাইতে সাহস করিলেন না! হতাশ হৃদয়ে কুমুদনাথের মনোরমা পত্নী আজ দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী বাটীতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতীত, বর্ত্তমান,ভবিষ্যৎ একে একে ত্রিপুরার মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে বড়ই যাতনা দিতে লাগিল। যাতনায় বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। একে নিরাশ্রয়া, সম্পত্তিহীনা—বন্ধুবান্ধববিরহিতা, তাহাতে স্ত্রীলোক, ত্রিপুরা দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পুত্র নিরপরাধী, রাজীব কখনই টাকা লয় নাই, এই ধারণা যতই দৃঢ়ভাবে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, ততই ত্রিপুরাসুন্দরীর যাতনা দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজীব চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলে হয় ত ত্রিপুরাসুন্দরী পুত্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। এক্ষণে রাজীবকে নির্দ্দোষ বোধে তাহার উদ্ধারচিন্তা ত্রিপুরাসুন্দরীকে বড়ই অভিভূত করিল। কিন্তু তাহাকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন, ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যেখানে যাইবেন, সকলে তাঁহাকে চোরের মাতা বলিয়া ঘৃণা করিবে, যাঁহাকে দশ দিন পূর্ব্বে আপামর সকলে দেবীজ্ঞানে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত, যাঁহার গুণগাথা দিবারাত্র প্রতি গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইত, আজ কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই ত্রিপুরাসুন্দরীর নাম লোকসমাজে ঘৃণা ও উপহাসের সামগ্রী হইয়া পড়িতে বসিল। আজ কুমুদনাথ জীবিত থাকিলে তাঁহার পুত্র যদি যথার্থই চুরী করিত, তথাপি হয় ত তাঁহার পুত্রকে দারোগা মহাশয় নিজে স্কন্ধে করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিয়া যাইতেন।

ত্রিপুরাসুন্দরীর টাকা কড়ি থাকিলে দারোগা মহাশয় হয়ত রাজীবকে ধরিয়া লইয়া যাইতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী আজ পথের ভিখারিণী, দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পীড়নে নিষ্পীড়িতা, তাঁহার পুত্রের জন্য কে আর উদ্বিগ্ন হইবে? তাহাকে আর কে যত্ন করিবে?— ত্রিপুরা কতই কাঁদিলেন, বুক জলে ভাসিয়া গেল। কন্যা চারুবালা মাতার ক্রন্দনে কত কাঁদিল ত্রিপুরার দুঃখে আর কাহাকেও দুঃখিত হইতে দেখা গেল না, তাঁহার বাড়ীতে কেহই আসিল না। সান্ত্বনা করিতে প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইল না। কেবল দুই জনে—মাতা ও কন্যা দুই জনে কাঁদিলেন। কত যে কাঁদিলেন, কতক্ষণ যে কাঁদিলেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? চারুবালা বালিকা কখন কখন মাতাকে সান্ত্বনার কথা কহিল, আবার মাতার ক্রন্দনে নিজে কাঁদিল—দাদা বাড়ী আসিল না, দাদার অদর্শনে বালিকার বড়ই ক্লেশ হইতেছিল। রাজীবের দশা কি হইবে ত্রিপুরাসুন্দরীর জানিতে ইচ্ছা হইলেও তিনি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? জিজ্ঞাসা করেন এমন লোকও দেখিতে পাইলেন না। রাজীবের যন্ত্রণা যতই কল্পনাচক্ষে ত্রিপুরাসুন্দরী দেখিতে লাগিলেন ততই জননী-হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বালক না জানি কতই কাঁদিতেছে, কতই লাঞ্ছিত, কতই প্রপীড়িত হইতেছে, একাকী, নিঃসহায়, বন্ধুহীন পুলিসকবলগ্রস্ত রাজীব না জানি কতই দুঃখ ভোগ করিতেছে এই ভাবিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সংসার শূন্যময়,বিপদের সীমা নাই ত্রিপুরাসুন্দরী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটী হইতে একজন দাসী আসিল। রাজীব সর্ব্বেশ্বর বাবুর টাকা চুরি করিয়াছে,সেই বাটী হইতেই দাসী আসিয়াছে না জানি কি সংবাদ আনিয়াছে, না জানি কতই দুর্ব্বাক্য শুনাইতে আসিয়াছে, না জানি সে

কতই অপমান করিবে, এই ভাবিয়া দাসীর আগমনে ত্রিপুরার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে শুষ্কহৃদয় আরো শুকাইল। দাসী ত্রিপুরাকে বলিল সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাকে এখনি যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, বাহিরে পাল্কী আসিয়াছে, ত্রিপুরা প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিলেন, পরে চারুবালাকে সঙ্গে লইয়া পাল্‌কীতে উঠিলেন এবং যথাসময়ে সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপুরা যখন চারুবালাকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন তখন সর্ব্বমঙ্গলা আহারে বসিয়াছিলেন কাজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে কিছু বিলম্ব হইল ত্রিপুরার সেই সময় মন বড়ই যাতনায় কাটিতেছিল। মনের মধ্যে নানারূপ ভয়, নানারূপ আশঙ্কা নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাকে ডাকাইয়া দেখা করিতে কেন এত বিলম্ব করিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না, বাটী ফিরিয়া যাইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন এমন সময় সর্ব্বমঙ্গলা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিপুরার মুখ শুষ্ক, নয়ন ক্রন্দনে স্ফীত, অনাহারে শরীর শীর্ণ দেখিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন. ভাবিলেন মানুষের কখন কি দশা হয় কে বলিতে পারে? প্রাতঃস্মরণীয় কুমুদনাথের পুণ্যশীলা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী—যাহার দর্শন পাইলে লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিত—সেই ত্রিপুরাসুন্দরীর এই অল্পদিনের মধ্যে এই দশা হইয়াছে ভাবিয়া কোমলপ্রাণা সর্ব্বমঙ্গলার হৃদয়ে দুঃখ আর ধরিল না, অতি কষ্টে চক্ষের জল সংবরণ করিয়া ত্রিপুরাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। ত্রিপুরা বহুদিন এরূপ মিষ্ট কথা শুনেন নাই। সর্ব্বমঙ্গলার মিষ্ট কথায় ত্রিপুরার শোকের বেগ আরো অধিক হইয়া উঠিল—ত্রিপুরা অনেক কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা কি বলেন তাহা শুনিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা বলিতে লাগিলেন—

"কর্ত্তা রাজীবের চুরীর কথা শুনিয়াছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন নাই যে রাজীব চুরী করিয়াছে। তিনি বলিলেন যে, অন্য কেহ চুরি করিয়া থাকিবে, এক্ষণে সকলে বালকের ঘাড়ে নিজের দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমিও মনে করিতেছি যে, কর্ত্তার কথাই ঠিক, আমরা উভয়েই রাজীবকে নিরপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছি। তুমি স্থির হও। যত শীঘ্র পারি, রাজীবকে আনাইয়া দিতেছি।" ত্রিপুরাসুন্দরীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল, সর্ব্বমঙ্গলার আশ্বাস-বাক্যে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সর্ব্বমঙ্গলা ত্রিপুরা-সুন্দরীকে স্নানাহার করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজীব পুলিসের হস্তে কত যন্ত্রণাই পাইতেছে—জননীর প্রাণে সেই অবস্থায় স্নান-আহারে কখনই ইচ্ছা জন্মিতে পারে না।

ত্রি।—"রাজীব না আসিলে আমি অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিব। আপনারা আমার রাজীবকে আনাইয়া দিন,—তাহা হইলে আমার সকলের অপেক্ষা প্রাণের তৃপ্তি হইবে।" সর্ব্বমঙ্গলা কর্ত্তাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন;—বলিলেন, "রাজীবকে এখনই আনাইয়া দাও, না হ'লে তার মা ত মরে।" সর্ব্বেশ্বর বাবু কুমুদনাথের স্ত্রীর অবস্থা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর জল পড়িল, কুমুদনাথের সকল কথা মনে পড়িল, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আমি যত শীঘ্র পারি, তাহাকে খোলসা করিয়া আনিতেছি; আমাকে না বলিয়াই দেওয়ানজী তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।" পরে ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা রাজীবকে দোষী বলিয়া একবারও বিশ্বাস করি নাই; ইহার ভিতর কোন একটী গূঢ় রহস্য আছে, সময়ে তাহা প্রকাশ পাইবে। আপনি

স্থির হউন ; আপনার পুত্র শীঘ্রই আপনার নিকট আসিবে।” এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু চলিয়া গেলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী ভগবানের নিকট সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে কতই মঙ্গল কামনা করিতে লাগি-লেন। ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বেশ্বরের বাটীতে আসিয়া যেন কোন এক নূতন ধর্ম্মময় রাজ্যে আসিয়াছেন মনে করিলেন এবং তাঁহার প্রাণে অভূতপূর্ব্ব শান্তি এই যাতনার মধ্যেও আসিয়া দেখা দিল ?”

সর্ব্বেশ্বর বাবু কাছারিবাটীতে গিয়া গোবর্দ্ধনকে ডাকাইলেন এবং তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, গোবর্দ্ধন আসিলে সর্ব্বেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “দেওয়ানজী, এ কি শুনিতেছি ?—কুমুদনাথের ছেলে কত টাকা চুরি করিয়াছে ?”

গো।—অনেক টাকা।

সর্ব্বে।—তুমি কি ইহা বিশ্বাস করিয়াছ ?

গো।—আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, পরে যখন ভালরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল, তখন কাজেই বিশ্বাস করিতে হইল।

সর্ব্বে।—কুমুদনাথের ছেলে টাকা চুরি করিবে, ইহা ত আমার বিশ্বাস হয় না—টাকা লইয়া সে কি করিল ?—টাকা লইলে তাহার মাতাকে লইয়া দিবে—কিন্তু তাহার মাতাকে আমরা সকলে বিশেষ জানি, তিনি কখনও সে টাকা ছুঁইবেন না। অন্য কেহ টাকা চুরী করিয়াছে তাহার সন্ধান করা আবশ্যক ; এক্ষণে রাজীব কোথায় ?

গো।—পুলিসের হাতে।

সর্ব্বে।—“তাহাকে শীঘ্র খোলসা করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত কর। রাজীব চোর নহে।” গোবর্দ্ধন বিষম বিপদেই পড়িল। সে একবারও ভাবে নাই যে, সর্ব্বেশ্বর বাবু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। গোবর্দ্ধন

নানা প্রকারে রাজীবের দোষ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের নিকট কোন যুক্তিই টেঁকিল না। তিনি বলিলেন—"রাজীব কখনই চুরী করে নাই, রাজীবকে শীঘ্র আনাও।" অগত্যা দারোগা বাবুকে ডাকাইতে হইল।—দারোগা মহাশয় রাজীবকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে আসিলেন। তিনি মনে মনে করিয়া আসিতেছিলেন যে, চোর ধরা পড়িয়াছে, সর্ব্বেশ্বর বাবু কতই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কত টাকা পুরস্কার দিবেন; এক্ষণে কত টাকা পুরস্কারের দাবি করিবেন তাহাই স্থির করা বাকি ছিল। পুরস্কার দিবার জন্যই যে সর্ব্বেশ্বর বাবু তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন, দারোগা বাবুর মনে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এই সব ভাবিয়া দারোগা বাবু সর্ব্বেশ্বর বাবুর সম্মুখে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইলেন। আর একজন চোর ধরিয়া তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়াছে—মাল এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, তথাপি দারোগা বাবুর মনে নিজের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা ধরিতেছিল না। রাজীবের হাতে হাতকড়ি দিয়া আনিয়াছিলেন, কেননা সর্ব্বেশ্বর বাবু বুঝিবেন যে, পুলিস তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণ দিয়া করিতেছে। রাজীবের হাতে হাতকড়ি, মুখ অপমানে, অনাহারে, প্রহারের যাতনায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে সর্ব্বেশ্বরকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। দারোগা বাবু রাজীবকে ধমক দিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "চুরি করিবার সময় মনে ছিল না, এখন কাঁদিলে কি হইবে?—বেশী কান্না কাটা কর আবার প্রহার চলিবে।" এই বলিয়া দারোগা মহাশয় সর্ব্বেশ্বর বাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন;—ভাবিলেন, সর্ব্বেশ্বর বাবু দারোগা মহাশয়ের কথায় বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর বাবুর মুখের ভাবভঙ্গীতে দারোগা মহাশয়ের মন বড়ই ছোট হইয়া গেল; সর্ব্বেশ্বর বাবুর মুখে দারোগা মহাশয়ের উপর বিরক্তিভাব পরিলক্ষিত হইল;

রাজীবের ক্লেশে সর্ব্বেশ্বর বাবুর হৃদয় কাঁদিতেছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজীবের হাত হইতে হাতকড়ী খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন— গোবর্দ্ধনের ইচ্ছা নহে যে, রাজীবের হাত হইতে হাতকড়ী খুলিয়া দেওয়া হয়, দারোগা গোবর্দ্ধনের মুখ দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে :পারিশ্রমিকস্বরূপ বেশ দশ টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় গোবর্দ্ধনেরই অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে চাহিতেছিলেন ; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী না হইয়া গোবর্দ্ধন দারোগা মহাশয়কে বলিলেন, "দারোগা মহাশয়, বাবুর ইচ্ছা যে, রাজীবকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।" দারোগা মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—ইচ্ছা যে, কোনরূপে রাজীবকে মুক্তি দেওয়া না হয়। বলিলেন, "তাই ত, এখন আমি ছাড়ি কিরূপে ?—ডাইরি করা হইয়াছে, সব কাগজে কলমে লেখা-পড়া করা গিয়াছে, প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চোরকে ছাড়ি কিরূপে ?" দারোগা পুরস্কারের আশা আর নাই দেখিয়া মনে মনে চটিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন।

সর্ব্বে।—"এ ত বড়ই অদ্ভুত। আমার টাকা ; আমাকে না বলিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া এতদূর অগ্রসর হওয়া হইল কেন ?"

দারোগা।—মহাশয়ের টাকা চুরী হইয়াছে, মহাশয়ের কাজে আমরা আলস্য করি কিরূপে ? আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় চোর ধরিয়াছি, এক্ষণে আপনি যে এরূপ ভাবে কথা কহিবেন, তাহা আমাদের বুদ্ধিতেই আসে নাই।

সর্ব্বে।—দেওয়ানজী, যত টাকা খরচ হয় হউক, রাজীবকে খোলসা করিতে হইবে। দারোগা মহাশয়, আমার টাকা, আমি রাজীবের উপর দাবিদার হইব না। উহাকে ছাড়িয়া দিন।

দারোগা।—মহাশয়, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ভিন্ন উহাকে ছাড়িতে পারিব না।

সর্ব্বে।—তবে আপনি আমাদের কষ্ট দিবেন ও খরচান্ত করাইবেন। দেওয়ানজী, উকীল-মোক্তারের খরচ যাহা হয়, আমার তহবিল হইতে করিবে, যত টাকা লাগে খরচ করিতে হইবে, তা বলিয়া নির্দ্দোষীর দণ্ড আমা হইতে হইবে না।

দারোগা মহাশয় উকীল-মোক্তারকে টাকা-কড়ি না দিয়া সেই টাকা আমাকে দিন আমি রাজীবকে খোলসা করিয়া দিতেছি, এই কথা বলিবেন, মনে করিতেছিলেন, আর সর্ব্বেশ্বর বাবু কি নির্ব্বোধ, শিরো-বেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করিবেন তথাপি সোজা পথে যাইবেন না, কিছু টাকা তাঁহাকে দিলেই কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, সর্ব্বেশ্বর বাবুর মাথায় সে কথাটা একবারও উদিত হইতেছে না, এই সব ভাবিয়া মনে মনে দারোগা মহাশয় বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু নির্ব্বোধ সর্ব্বেশ্বরের পবিত্র হৃদয়ে পুলিসকে উৎকোচ প্রদান মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান ছিল, সেই জন্য সর্ব্বেশ্বর বাবু দারোগা মহাশয়কে আপ্যায়িত করিতে পারিলেন না।

দারোগা মহাশয় পুনশ্চ কতকটা নিজের মনের কথার আভাস দিবার জন্য বলিলেন, "আদালত হইতে রাজীবের খোলসা অসম্ভব। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অকাট্য।"

দারোগার জিদ দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বড়ই বিস্মিত হইলেন, তিনি বলিলেন, "টাকা আমার,আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিব যে, আমি ঐ টাকা রাজীবকে লইতে বলিয়াছিলাম। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহার ভিতর কি একটা গূঢ় রহস্য রহিয়াছে নিরপরাধী দণ্ড পাইবে, তাহা আমি কখনই দেখিতে

পারিব না। ইহাতে আমাকে মিথ্যা কহিতে হয়, তাহাই স্বীকার।”

সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীবকে সে স্থান হইতে লইয়া যাইতে বলিলেন,—তখন দারোগা মহাশয় অগত্যা রাজীবকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীবকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট আসিলেন এবং রাজীবকে ত্রিপুরাসুন্দরীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এ দিকে দারোগা মহাশয় ও দেওয়ানজীর রোষের পরিসীমা রহিল না। দেওয়ানজী রাজীবকে দণ্ডপ্রদানে বিফলমনোরথ হওয়ায় রাজীবের উপর তাঁহার আরো অধিক রাগ বাড়িয়া উঠিল। দারোগা মহাশয় সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে না পারিয়া,সর্ব্বেশ্বর বাবুকে উদ্দেশে অনেক প্রকারে শাসাইলেন এবং অপ্রসন্নমুখে দেওয়ানজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম গোপেশ্বর। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর, তাঁহার স্বভাবও সেইরূপ মধুর। সর্ব্বেশ্বর বসু ও গোপেশ্বরের পিতা রাজেশ্বর বসু দুই ভ্রাতা। দুই ভ্রাতার প্রত্যেকে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিকারী হন। সর্ব্বেশ্বর বাবু পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ অংশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং কিছু দিনের মধ্যে একজন অতিশয় সমৃদ্ধিশালী জমীদার হইয়া উঠেন। রাজেশ্বর বসু নিজের সম্পত্তির ততদূর উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। তথাপি মৃত্যুকালে নিজের একমাত্র পুত্র গোপেশ্বরের হস্তে প্রভূত ধনসম্পত্তি রাখিয়া যান। গোপেশ্বর উক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সকল প্রকারে ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া

আসিতেছিলেন। গোপেশ্বরের শিষ্টাচারে, বিনীত ব্যবহারে, মিষ্টালাপে সকলেই বশীভূত হইয়াছিল। কিন্তু গোপেশ্বরের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ ছিল না। সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীর অনতিদূরে গোপেশ্বরের পিতা রাজেশ্বর নিজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু পৈতৃক বাটীর সংস্কার সাধন করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন। সর্ব্বেশ্বর গোপেশ্বরকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির অল্পতা দর্শনে সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, পাছে গোপেশ্বর কখন্ কোন্ বিপদে পতিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তখন গোপেশ্বরের বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবর্দ্ধনের পত্নী কৌশল্যার বয়স এক্ষণে ২১।২২ বৎসর। কৌশল্যার রূপ ও গুণের কথা সকল পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ধূর্ত্তা কৌশল্যা গোপেশ্বরের সকল বিষয় জানিত, গোপেশ্বরের বুদ্ধি তত প্রখর নয়, তাহাও জানিত। জানিয়া গোপেশ্বরের উপর আপন রূপের আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। কৌশল্যা পূর্ব্ব হইতেই গোবর্দ্ধনের চক্ষে ধূলা দিয়া বাহিরে বাহিরে প্রেম বিলাইয়া আসিতেছিল। গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বর বাবুর জমীদারীর কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। অবসর অতি অল্পই ছিল। সে প্রত্যূষে উঠিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিত। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া বাটীতে আসিত; স্নানাহার-বিশ্রামে ২।১ ঘণ্টা কাটাইয়া বেলা ২টা ২॥টার সময় পুনর্ব্বার সর্ব্বেশ্বরের বাটীতে যাইত। তখন সর্ব্বেশ্বর বাবু দেওয়ানজীকে লইয়া রাত্রি ৮।৯টা পর্য্যন্ত সমস্ত জমীদারীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু প্রত্যহ নিজে ৫।৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। কাজেই দেওয়ানজীকে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত থাকিতে হইত। ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শুনিতে হইত। সন্ধ্যার পর

আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিতেন, কাজেই দেওয়ানজী রাত্রি ১০টা ১১টার পূর্ব্বে কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। দেওয়ানজী খরচের ভয়ে বাটীতে চাকর-দাসী অধিক রাখেন নাই; একজন দাসী মাত্র সংসারের সকল কাজ করিত। দাসীর নাম রেবতী। আবশ্যক হইলে দেওয়ানজী সর্ব্বেশ্বর বাবুর চাকর দাসীর দ্বারা নিজের কাজ করাইয়া লইত। কিন্তু এরূপ আবশ্যক খুব কমই হইত। দেওয়ানজীর অবসরের অল্পতানিবন্ধন কৌশল্যা প্রচুর অবসর পাইত। সে সমস্ত দিনই একাকিনী থাকিত। দাসীকে হস্তগত করিয়া কৌশল্যা নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণে কেবল ব্যাপৃতা থাকিত। গোবর্দ্ধন ও কৌশল্যার মধ্যে বড় একটা ভালবাসা জন্মায় নাই। টাকা কড়ির উপর অপরিমিত লোভ থাকায় কি প্রকারে ধনাগম হইবে, তাহাই লইয়া গোবর্দ্ধন দিনরাত্রি ব্যস্ত থাকিত। কৌশল্যার কদাকার স্বামীর প্রতি অনুরাগ না থাকায় উভয়ে কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু উভয়েরই মনে ধনলালসার স্রোত প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকায় উভয়ের মধ্যে টাকা-কড়ির সম্বন্ধেই অধিক কথাবার্ত্তা হইত। কৌশল্যা স্বামীকে কৌশলে ভুলাইয়া নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে উপপতির অর্থাপহরণ দ্বারাই নিজের মনের সাধ মিটাইতেছিল। দরিদ্রের কন্যার হৃদয়ে অর্থের লালসা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" দিন দিন বাড়িতেছিল। তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তির স্থান লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

দুর্ব্বলহৃদয় পুরুষগণ কৌশল্যার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া একেবারে প্রজ্বলিত বহ্নিতে রূপমুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন দিত। কৌশল্যা তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কোনরূপে তাহাদের সহিত একটা বিবাদের সুযোগ অন্বেষণ করিত। পরে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত

করিয়া নূতন শিকার ধরিবার সুযোগ দেখিত। যে একবার কৌশল্যার চাতুরীজালে জড়ীভূত হইত, তাহার উদ্ধারের আর পথ থাকিত না। কৌশল্যার সেই মনোমুগ্ধকর আকর্ণপ্রসারিত নয়নদ্বয় পুরুষের হৃদয়ভেদী কালকূটপূর্ণ অমোঘ শরপুঞ্জের সাধের আবাসভূমি ছিল। সেই নয়নবিচ্যুত শরাঘাতে হৃদয় আহত হইলে জল-ভ্রমে মরিচীকানুসারী কুরঙ্গের ন্যায় পুরুষগণ কৌশল্যার প্রেমানলে ঝাঁপ দিত। গোবর্দ্ধন নিজার্জ্জিত ধনরাশি কৌশল্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; নিজে আর কোন তাহার হিসাব লইত না। কৌশল্যা কৃপণের অগ্রগণ্যা ছিল। তাহার হস্তে টাকা-কড়ির অপব্যয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। গোবর্দ্ধন তাহা বিলক্ষণ জানিত, কাজেই হিসাব লইবার কোন আবশ্যক হইত না। কৌশল্যা আপনার সতীত্বের বিনিময়ে যে সমস্ত টাকা-কড়ি উপার্জ্জন করিত, তাহা গোবর্দ্ধনের জানিবার কোন উপায় ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গুণে গৃহে বেশ দশ টাকা আসিতেছিল।

একদিন কৌশল্যা দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার বেশবিন্যাসে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুকুঞ্চিত কেশরাশি নিতম্বদেশ অধিকার করিয়া পড়িয়া আছে। নিতম্ব স্পর্শ-জনিত সুখে যেন অবশ হইয়া রহিয়াছে। কেশ-বিন্যাসকালে কেশদাম নিতম্বালিঙ্গন সুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে বঞ্চিত হইতেছিল। যেন কেশরাশি নিতম্ব ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিতেছিল না। কৌশল্যা কেশবন্ধনে ব্যাপৃতা আছে, এমন সময়ে দাসী রেবতী আসিল। কৌশল্যা একমনে কেশ বিন্যাস করিতে করিতে আপনার মনমজান রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতেছিল ও টিপি টিপি হাসিতেছিল। ভাবিতেছিল, কে এমন অরসিক আছে যে, তাহার সেই অলোকসামান্য

সৌন্দর্য্য দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ফণীর ন্যায় তাহার পদতলে নতশির হইয়া না পড়িয়া থাকে ? রেবতী প্রত্যহই কৌশল্যার সেই রূপ সন্দর্শন করে, প্রত্যহই সেই অপ্সরাগঞ্জিত রূপের মনে মনে প্রশংসা করে। কিন্তু আজ কৌশল্যার দর্পণে প্রতিফলিত সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়া রেবতী মোহিত হইয়া গেল। সেই সুগঠনে সুগঠিত কমনীয় দেহ-যষ্টি সুবর্ণালঙ্কারভারে ঈষৎ অবনত হইয়া পড়ায় রেবতীর চক্ষে বড়ই মধুর দেখাইতেছিল। তাহাতে কণ্ঠাবলম্বিত রত্ন-খচিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত কণ্ঠহার কৌশল্যার গলদেশে দোদুল্যমান—কি মনোহর দৃশ্য ! রেবতী গৃহের একপার্শ্বে বিমুগ্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ;—ভাবিল পুরুষজাতি এরূপ দেখিলে কেন না কৌশল্যার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিবে ?—কেননা পতঙ্গের ন্যায় এ রূপানলে ঝাঁপ দিবে ? কেন না পরিশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়িবে, কৌশল্যার কর্ণে হীরক-খচিত কর্ণাভরণ, পরিধানে মহামূল্য কৌষেয় বসন, নিতম্বপ্রদেশে কাঞ্চন-কাঞ্চী বাহুদেশে বলয় প্রভৃতি নানা জাতীয় অলঙ্কার, সকলের একত্র সমাবেশে কৌশল্যার রূপের ছটা শতগুণে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কৌশল্যা রেবতীকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং বলিল, "রেবতী, আজ আমাকে কেমন দেখিতেছিস্ ?" রেবতী হাসিয়া বলিল, "আজ না জানি কার সর্ব্বনাশের পালা এসেছে ! এমন রূপ ত কোন দিন দেখিনি। কার সর্ব্বনাশের জন্য এত পরিশ্রম ? এত সাজসজ্জা কেন ? আজকার মতলবটা কি ? কার মন ভুলাতে হবে ?"

কৌশল্যা। বল দেখি কার ?

রেবতী। সেটা বলা আমার অসাধ্য। তোমার বুদ্ধির ভিতরে আমি কবে প্রবেশ করিতে পেরেছি :—আর কেউ না পেরেছে ?

কৌ। রেবতি, তুই বড় খোসামুদী, আমাকে সব রকমে বাড়াইতে চাইতেছিস ?

রে। বড়কেই বাড়ায়, তুমি কিসে না বড় ?—দেওয়ানজীর মাথার মণি, রূপের সাগর, বুদ্ধির পাহাড়।

কৌ। "বড় বাড়ালি" কৌশল্যা রেবতীর কথায় মনে মনে বড় খুসী হইতেছিল, বাহ্যিক রাগ করিয়া বলিল, "বড় বাড়ালি।"

রে। বাড়ালেই বাড়ে, রেবতীকে বাড়্‌তে দিয়াছ তাই সে বেড়েছে। এখন ব্যাপারটা কি ?

কৌ —গোপেশ্বর বাবুকে চিনিস্‌ ?

রে।—কায়স্থের ঘরের বোকা মাণিক।

কৌ।—তাই ত আমি চাই, আজ তাকে ধর্‌তে হবে।

রেবতী। তাই এত বেশভূষা এখন বুঝলেম।

কৌ। গোপেশ্বরের চেহারাটা কেমন বল দেখি ?

রে।—কেন, তাকে কি তুমি দেখনি ?

কৌ।—আমি দেখেছি—তোকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, গোপ-শ্বরকে তুই কেমন দেখিস্‌ ?

রে।—সুপুরুষ।

কৌ। তাহাকে এদিক দিয়া যাইতে দেখিছি, কোন রকমে ফিরবার সময় বাড়ীতে আন্‌তে হবে। সুপুরুষ বটে টাকা কড়িও ঢের।

রে।—দেখা যাক্‌, তবে পূর্ণ বাবুর আজ আস্‌বার কথা ছিল না ?

কৌ।—ছিল বটে,—এলে বলিস্ দেখা হবে না, আমার অসুখ করেছে।

রে।—মনে মনে বলিল, "তার টাকা-কড়ি সব ত তোমার পায়ে উচ্ছুগ্গু হয়ে গেছে,এখন সে আর জায়গা পাবে কেন?"তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কৌশল্যা বলিল, "কি ভাবছিস্?"

রে।—একটু যেন থতমত খাইল, পরে বলিল, "রজনী বাবু কদিন ধরে আর আসে নাই কেন?"

কৌ।—তাকে আমি আসিতে দেব না। তার আর কিছু আপনার বলতে নেই, সে দিন তার ভিটাটা নীলাম হয়ে গেছে।

রে।—এর মধ্যে? সে কত টাকাই বা তোমায় দিল যে, তার ভদ্রাসন বিকিয়ে গেল?

কৌ।—আমি শুনেছিলাম, তার অনেক টাকা ছিল, তাই জায়গা দিয়াছিলাম, আমার শুনাটা ভুল হয়েছিল, এখন সে পথের ভিখারী।

রে।—এই বছরের মধ্যে ক জনকে পথে দাঁড় করান হল?

কৌ। বলিল, "হিসাব কর্‌তো।"

রে।—বামুনদের মতিলাল, হীরালাল, কায়স্থদের পূর্ণবাবু, রজনী বাবু, সোণার বেনেদের পরেশবাবু, হরিহরবাবু, আর কে? মনে পড়ছে না। সব জাতেরই জোড়া জোড়া ভেড়ার বলিদান হয়েছে।

কৌ।—"আজ একটা বড় মোষ বলির যোগাড় হতেছে" কৌশল্যা এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রেবতী দেখাদেখি হাসিল,কিন্তু মনে মনে "গোল্লায় যাও" বলে অভিসম্পাত করিল,ভাবিল বাজারের বেশ্যারও একটু মায়াদয়া, লজ্জাসরম আছে, ভদ্রলোকদের ঘরে এমন ত দেখি নি।

কৌশল্যা বলিল, "দেখিস্ যেন গোপেশ্বর বাবু না চলিয়া যায়। এখান দিয়ে যাবার সময় কোন সূত্রে ডাকিস্।"

রে।—কি বলে ডাকি বল দেখি?

কৌ।—মিছামিছি করে বলিস্, দেওয়ানজী ডাকৃছে।

রে।—তার পর?

কৌ।—তার পর আমার ভুবনমোহিনী রূপের ছটা—পারবে না ভেড়া বানাতে?

রে।—দেখ যেন তুমি নিজে মোজো না, চেহারাটা বেশ—বেশ সুশ্রী—বেশ সুন্দর!

কৌ।—নির্ব্বোধ,—সুন্দর সুশ্রী, তাতে আমার গেল এল কি? কৌশল্যা পুরুষের ভতরূপের ধার ধারে না গোপেশ্বরের কত টাকা আছে জানিস্? দেওয়ানজীর মুখে শুনেছি, লাক দুলাক টাকা—বিস্তর টাকা।

রেবতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কতদিনে আন্দাজ সব টাকা তোমার ঘরে আসিবে?"

কৌ।—তুই কদ্দিনে মনে করিস্?

রে।—সেটা তোমার দয়া—বছর ফিরবে না, গোপেশ্বর দেউলে হবেই হবে। এখন শুনেছ, হরিহর বাবু বিষ খেয়ে মরেছে।

কৌ।—সে কি? হরিহর আমাকে এই হীরার কানফুল দিয়েছিল, বিষ খেয়ে মলো?

রে।—শুন্‌লেম, সে আফিসের টাকা ভেঙ্গেছিল, ধরা পড়াতে বিষ খেয়েছে।

কৌ।—আফিসের টাকা ভেঙ্গে আমায় দিত তা আমি জেনে-ছিলেম, তা বেশ হয়েছে। লোকটা ইদানীং বড়ই পায়ে-পড়া হয়েছিল, টাকা আন্‌তে পারবে না আর এখানে জ্বালাতন করবে,ভাল লাগেনা।

রে।—তা ত ঠিক।

কৌ।—তুই যা, সদরে থাক্ গে যা।

গোপেশ্বর প্রতিদিন বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন কোন কোন দিন সঙ্গে বন্ধুবান্ধব থাকিত, আজ একাকীই বাহির হইয়াছিলেন বাটী ফিরিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইত, আজ আরো দেরি হইয়াছিল। এদিকে আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার ছিল, সঙ্গে আলো ছিল না। গোপেশ্বর যখন দেওয়ানজীর বাটীর নিকটে আসিয়াছেন, দৈবক্রমে বৃষ্টি আসিল। তিনি দেওয়ানজীর বাটীর সদরে গিয়া দাঁড়াইলেন, রেবতী সেখানে ছিল। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া আলো আনিতে গেল। সেই সঙ্গে কৌশল্যাকে খবর দিল গোপেশ্বর বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। রেবতী আলো আনিল এবং গোপেশ্বরকে তামাক দিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

গোপেশ্বর "ক্ষতি নাই" বলিলে রেবতী তামাক সাজিতে বাটীর ভিতরে গেল। গোপেশ্বর একখানি চেয়ারে বসিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তাই দেখিতে লাগিলেন। কিছু পরে রেবতী হুঁকা আনিয়া গোপেশ্বরের হাতে দিল। গোপেশ্বর ধূমপান করিতে করিতে বৃষ্টি কতক্ষণে থামিবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গোপেশ্বর নিজেই বাটীতে আসিয়াছে শুনিয়া ভাগ্যবতী কৌশল্যার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কৌশল্যা রেবতীর দ্বারা পান পাঠাইয়া দিল এবং "দেওয়ানজীর অসুখ হইয়াছে, একবার বাটীর ভিতর আসুন" কৌশল্যার উপদেশমত রেবতী গোপেশ্বরকে এইরূপ মিছামিছি প্রবঞ্চনার কথা বলিল। সরলস্বভাব গোপেশ্বর দাসীর কথায় বিশ্বাস করিয়া বাটীর ভিতরে আসিলেন এবং রেবতীর কথামত অন্দরবাটীর দ্বিতলের

একটী ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন, পথভ্রষ্ট বরাহ যেমন বিনষ্ট হইবার জন্য বা ঘনীর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, গোপেশ্বর আজি সেইরূপ কৌশল্যার অমোঘ কৌশলজালে জড়িত হইয়া তাহার শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, দেওয়ানজী এখনি ডাকিয়া পাঠাইবেন, এইরূপ গোপেশ্বর ভাবিতেছেন, এমন সময় সুচিক্কণ-বস্ত্রপরিধানা হীরক-রত্নখচিত অলঙ্কারসমন্বিতা কৌশল্যা সেই গৃহে কোন কার্য্যব্যপদেশে প্রবেশ করিল এবং গোপেশ্বরকে দেখা দিয়া, যেন সেই গৃহে ভুলক্রমে আসিয়াছিল, এইরূপ ভাণ করিয়া ত্বরিত-গতিতে গোপেশ্বরের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। গোপেশ্বর সম্মুখে এক অপূর্ব্বসুন্দরীকে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন ভুবনমোহন রূপ গোপেশ্বর ত কখন দেখে নাই—আকাশপ্রান্তে সৌদামিনী ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া লুক্কায়িত হইলে বালকগণ যেমন সৌদামিনীর পুন-দর্শনের প্রত্যাশায় আকাশপানে চকিতনেত্রে চাহিয়া থাকে, কৌশল্যা চলিয়া গেলে গোপেশ্বর সেইরূপ সুন্দরীর পুনর্দর্শনপ্রাপ্তির আশায় গৃহ-দ্বারপানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। ধ্যাননিমীলিত-নেত্র যোগী চক্ষুরুন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট দেবতার অন্তর্ধানে যেরূপ ব্যথিত-হৃদয় হন, গোপেশ্বরও সুন্দরীর অন্তর্ধানে সেইরূপ ব্যাকুলহৃদয় হইলেন।

সুন্দরীকে সম্যক্‌রূপে দেখিতে না পাইলেও গোপেশ্বর যতটুকু সুন্দরীকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন, এরূপ রূপ জগতে অতি বিরল। সেই অল্পক্ষণের মধ্যে গোপেশ্বর সুন্দরীর ঈষদুন্মুক্ত পয়োধরযুগলের পীনোন্নত ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন, সুন্দরীর খঞ্জন-গঞ্জন সুচারুনয়নের বাঁকা চাহনিতে অস্থিরহৃদয় হইলেন, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া গেল; তিনি সুন্দরীর পুনর্দর্শন-

প্রত্যাশায় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। রেবতী পুনর্ব্বার তামাক দিয়া গেল। দেওয়ানজীর অসুখের কথা গোপেশ্বর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা, দাসীকে সুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসা করেন; অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গোপেশ্বর ধূমপান করিতে লাগিলেন। নয়নদ্বয় দ্বারদেশপানে পাতিত করিয়া গোপেশ্বর কোনরূপে ধূমপানে প্রবৃত্ত রহিলেন, সুন্দরী কিন্তু আর ত আসিল না। বৃষ্টি ধরে নাই। রাত্রি যখন প্রহরাতীত, তখন দাসী গোপেশ্বরকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিল। গোপেশ্বর ফাঁদে পড়িয়াছেন, আর পলায়নের শক্তি নাই, কৌশল্যা ইহা বেশ বুঝিয়াছিল এবং স্বয়ং গোপেশ্বরের জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, গোপেশ্বরেরও চলিয়া যাইতে ততটা মন নাই, তথাপি গোপেশ্বর দাসীকে একটা ছাতি আনিতে বলিলেন। দাসী বলিল, এখনও বৃষ্টি পড়িতেছে আর একটু বিশ্রাম করুন বৃষ্টি ধরিলেই যাইবেন। দাসীর কথায় গোপেশ্বর সম্মত হইলেন, এবং দেওয়ালের ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কৌশল্যা অন্তরাল হইতে গোপেশ্বরকে শুনাইয়া মৃদুস্বরে রেবতীকে বলিল, "রেবতী বল্ জলখাবার প্রস্তুত হইয়াছে, পাশের ঘরে আসিতে বল্"।

গোপেশ্বর কৌশল্যার কথা শুনিতে পাইলেন, আর ছবি দেখা হইল না, যেদিক হইতে কথা আসিতেছিল সেইদিকে গোপেশ্বর ফিরিয়া দেখিলেন সেই মুখখানি আবার চক্ষের উপর পড়িল; সেই মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, দেখা দিয়া মুখখানি সরিয়া গেল। গোপেশ্বর আবার বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোপেশ্বরের বুদ্ধিটা তত

প্রখর ছিল না, সাদাসিদে গোছের লোক, গোপেশ্বর কৌশল্যার ছলনা-জালে শীঘ্রই পড়িয়া গেলেন, কলের পুতলির ন্যায় দাসীর সঙ্গে অন্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন। আহার দ্রব্য সজ্জিত ছিল। আসনের পার্শ্বে কৌশল্যা মুখখানি অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত করিয়া ব্যজন-হস্তে দাঁড়াইয়াছিল. গোপেশ্বর বসিলে সে বাতাস করিতে লাগিল। কৌশল্যা কখনই বড় লজ্জাসরমের ধার ধারিত না, আজও কৌশল্যার কোনরূপ লজ্জা হইল না. সে স্বচ্ছন্দে গোপেশ্বরকে বাতাস করিতে লাগিল। প্রথম গোপেশ্বর মনে করিলেন দাসীতে ব্যজন করিতেছে, পরে যখন দেখিলেন যে সেই সুন্দরী নিজের মৃণালকোমল বাহু দুলাইয়া ব্যজন করিতেছে, তৎসঙ্গে রত্নখচিত অলঙ্কারগুলি দীপালোকে ঝলমল করিতেছে. তখন গোপেশ্বর বলিলেন, আপনি কেন কষ্ট পাইতেছেন, বাতাস করিবার প্রয়োজন নাই। সে কথা কে শুনে? বাতাস চলিতে লাগিল গোপেশ্বর একবার মুখ তুলিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর নয়নে আপন নয়ন সংলগ্ন হইল। গোপেশ্বরের আর খাওয়া হইল না, বলিলেন "আপনি কেন কষ্ট পাইতেছেন, দাসী না হয় বাতাস করুক"।

কৌশল্যা এইবার কথা কহিল, বলিল, "আপনারা আমাদের অন্নদাতা আপনাদের সেবায় দোষ কি? কষ্টই বা কি?" সেই সঙ্গে সঙ্গে কৌশল্যার নয়ন হইতে শরপুঞ্জ বহির্গত হইয়া গোপেশ্বরের হৃদয়ে গিয়া বিঁধিল, অমনি গোপেশ্বরের হস্ত হইতে সন্দেশ পড়িয়া গেল, গোপেশ্বর সুন্দরীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন, সুন্দরীর হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরে না, সে গোপেশ্বরকে জলখাবার খাইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, গোপেশ্বর থতমত খাইয়া বলিলেন "আর আমি খাইব না"।

কৌশল্যা বলিল, "সন্দেশ হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, ওটা তুলিয়

খান” গোপেশ্বর অপ্রস্তত হইয়া সন্দেশটী লইয়া খাইলেন. আহার চলিতে লাগিল বটে কিন্তু চক্ষু সুন্দরীর মুখের দিক হইতে অন্যদিকে যাইতে চাহিল না।

কৌশল্যা সুযোগ পাইয়া বলিল, “ছিঃ পুরুষ মানুষ বড়ই বেহায়া, আমি পরের স্ত্রী, আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা কি আপনার উচিত” ?

গোপেশ্বর কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় রেবতী দাসী আসিয়া জুটিল ও বলিল, “তোমার ও মুখ যে বাপু যাদু জানে, একবার যে দেখে সেই ভেড়া বনে যায়।” গোপেশ্বর একটু হাসিলেন, কৌশল্যার মনের ভাব জানিবার জন্য বলিলেন, বৃষ্টি কি ধরিয়াছে ? রাত্রি ঢের হইল, দেওয়ানজীর অসুখ হইয়াছে। তিনি কোথায় ?

রে। “দেওয়ানজীর অসুখ হয় নাই। তিনি ভাল আছেন।”

কৌ। “তিনি কাজে গিয়াছেন। তাঁর অসুখ হয়েছে রেবতী বুঝি বলেছিলি ? তুই বড় মিছে কথা কস্।”

রে। “আমি কি মশাই দেওয়ানজীর অসুখের কথা বলিয়াছিলাম ?”

গো। “হাঁ তাই বলিয়া ত তুমি আমাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিলে ?”

রেবতী “তবে সেটা আমার মিছে কথা” এই বলিয়া কৌশল্যার দিকে তাকাইয়া হাসিল।

গোপেশ্বর রেবতীকে বলিলেন, “দেখ দেখি বৃষ্টি ধরিয়াছে কি না ?”

রে। “না, আপনি অত ব্যস্ত হতেছেন কেন ?”

কৌ। “বৃষ্টি ধরিলেই যাবেন এখন”—গোপেশ্বরও তাই চায়! কিন্তু দেওয়ানজীর বাড়ী আসিবার সময় হইয়াছিল। কৌশল্যা

একটু উদ্বিগ্ন হইতেছিল। কিন্তু বৃষ্টি বাদলা হইলে গোবর্দ্ধন কখন কখন বাটী আসিত না, কখন কখন কার্য্যের খাতিরেও সর্ব্বেশ্বরের বাড়ীতে থাকিত। দেওয়ানজী এ দিন বাড়ী আসিবে কি না তাহার স্থিরতা ছিল না; সেইজন্ত কৌশল্যা সেই দিন গোপেশ্বরকে বিদায় দিল এবং তার পরদিন আসিতে বলিল।

পরদিন গোপেশ্বর সন্ধ্যার সময় আসিলেন। রেবতী বাড়ীর ভিতর গোপেশ্বরকে লইয়া গেল, তখন কৌশল্যা অতি সযত্নে গোপেশ্বরকে পালঙ্কে বসাইল। গোপেশ্বর মন্ত্রমুগ্ধের ন্তায় কৌশল্যার কথায় পালঙ্কে বসিলেন। দেওয়ানজী সেদিন আসিবে না বলিয়া গিয়াছিল, দেওয়ানজী আসিলে যে কি ঘটিবে এ কথা গোপেশ্বরের মাথা হইতে একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল—একবারেই তিনি বর্ত্তমানের সুখ লইয়াই ব্যস্ত—ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার সময় কোথায়? পালঙ্কে বসিয়া গোপেশ্বর কৌশল্যাকে পালঙ্কে বসিতে অনুরোধ করিলেন। কৌশল্যা প্রথমটা একটু ইতস্ততের ভাণ করিল পরে গোপেশ্বরের ক্রমশঃ সাহস বাড়িতেছিল, তিনি কৌশল্যাকে নিকটে আসিয়া বসিতে বলিলেন।

কৌ। "কাছে বসিয়া লাভ?—তুমি ত আর একজনের—তোমার কি? তুমি ত কালই আমাকে ভুলিয়া যাইবে, আমাকে কেবল দিন-রাত যাতনায় জলিয়া মরিতে হইবে।"

গো। "তোমায় ভুলিবার আমার আর সাধ্য নাই, কল্য হইতে যে কষ্টে সময় কাটাইতেছি তা তুমি কি জানিবে?"

কৌ। পুরুষ মানুষ প্রথমে ঐ কথাই বলে।

গো। "তোমার মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতেছি যে, যতদিন বাচিব, আমি তোমায় ছাড়িব না—ছাড়িতে পারিব না।"

কোশল্যা হাসিয়া বলিল, "আমার মাথায় হাত দিয়া দিব্যির জোরটা বড়।"

গো। "যা বলিবে তাই বলিয়া দিব্য করিতেছি।"

কৌশল্যা তখন গোপেশ্বরের নিকট বসিল। বলিল "তোমায় দিব্য করিতে হইবে না, আমাকে যদি ছাড়, শুনিবে আমি মরিয়াছি।"

যখন দেওয়ানজীর সহধর্ম্মিণী পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল, বিবাহের পবিত্র বন্ধনের প্রতি সম্মাননার একশেষ দেখাইতেছিল, তখন বাহিরে প্রকৃতিদেবীর মূর্ত্তি বড়ই বিভীষিকাময়ী হইয়া দাড়াইতেছিল, বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, সৌদামিনী ক্ষণে ক্ষণে আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত দিগ্দাহের ন্যায় আকাশকে জুড়িয়া ফেলিতেছিল, ঘন ঘন ঘোর বজ্রনিনাদে গোপেশ্বর কৌশল্যার প্রাণ চমকাইয়া দিতেছিল, তথাপি পাপিদ্বয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছিল না. দুইজনে যে মহাপাপে লিপ্ত হইতেছিল, তাহা তাহারা একবারও ভাবিতেছিল না। তখন কৌশল্যা গোপেশ্বরকে, গোপেশ্বর কৌশল্যাকে উভয়ে উভয়কে মধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিতে বড়ই ব্যস্ত ছিল। গোপেশ্বর জানিলেন না যে, মণিরত্নসমন্বিত কালভুজঙ্গিণীকে তিনি রত্নহার-ভ্রমে বক্ষে স্থান দিতেছেন, জানিলেন না যে সৌদামিনী দর্শনে বড়ই নেত্রমুগ্ধকরী কিন্তু স্পর্শনে প্রাণহন্ত্রী। গোপেশ্বর নির্ব্বোধ, গোপেশ্বর সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া প্রাণমন তাহার চরণে সমর্পণ করিতেছিলেন। কুটিলা কৌশল্যা গোপেশ্বরের সর্ব্বনাশের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। এইরূপে সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল, বিদায়ের সময় আসিল।

প্রভাত হইয়াছে প্রাতঃসমীরণ জাতি যূথি, মল্লিকা, সেফালিকা, প্রভৃতি পুষ্প সকলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পুষ্পের পরিমল ধুইয়া গিয়াছে, সেখানে নিরাশ হইয়া পরিমল না পাইয়া বড় আশায় স্থল-কমলভ্রমে কৌশল্যার বদনমণ্ডল হইতে মধু আহরণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কৌশল্যার রাত্রি জাগরণে বদন শুষ্ক ও কালিমা-জড়িত কাজেই প্রাতঃসমীরণ এখান হইতেও মহাদুঃখে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গোপেশ্বর কৌশল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কৌশল্যা তাহার চাতুরী-পাশে গোপেশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জড়িত দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইতেছিল। এক্ষণে গোপেশ্বরকে বিদায় দিবার সময় যেন তার প্রাণ গোপেশ্বরকে ছাড়িতে চায় না, সে গোপেশ্বরকে ছাড়িয়া একদণ্ডও বাঁচিতে পারিবে না. কৌশল্যা এইরূপ নানা ছেঁদো কথার অবতারণা করিল, একপালা কাঁদিয়াও লইল। নির্ব্বোধ গোপেশ্বর কৌশল্যার মায়া-কান্নায় হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "আমি তবে যাইব না। আমি তোমার চক্ষে জল দেখিয়া কেমন করিয়া যাইব?"

কৌ। "আমিও তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড বাঁচিব না, তুমি চলিয়া গেলে কি দাসীকে একবার মনে করিবে?

গো। "তোমাকে কেমন করিয়া ভুলিব? আমি সব ভুলিতে পারি কিন্তু তোমার মধুর কথা আমি ভুলিতে পারিব না।"

কৌ। তুমি আবার কবে দেখা দিবে?"

গো। "আমি তোমাকে কতক্ষণ ছাড়িয়া থাকিব? বলিলেই সন্ধ্যার পরই আসিব।"

কৌ। "আমি সমস্ত দিন তোমায় না দেখে কেমন করে বাঁচিব। চক্ষে জল দেখা দিল।"

গো। "তবে আমি যাবনা, আমায় লুকাইয়া রাখ, দেওয়ানজী এখনি আসিবে।"

কৌশল্যা তাহা চায় না এখন থাকিলে কি ফল? সন্ধ্যার সময় কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে করিয়া আসিলেই কৌশল্যার মনোমতটী হয়, এইজন্য গোপেশ্বরকে কৌশলে বিদায় দিবার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল।

কৌ। "সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু সন্ধ্যার পর না আসিলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তোমার কোন জিনিষ আমায় দিয়ে যাও, আমি সেইটী সমস্ত দিন দেখিব আর তোমাকে স্মরণ করিব।"

গোপেশ্বরের অঙ্গুলীতে বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক ছিল, কৌশল্যা কৌশলে সেইটা বাহির করিতেছিল। গোপেশ্বরের স্ত্রী-চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলে কৌশল্যার মুখে হাসির চিহ্ন দেখিতে পাইতেন কিন্তু তিনি কৌশল্যার চক্ষু হইতে অনর্গল জলধারা নির্গত হইতেই দেখিলেন। মুখে হাসি, চক্ষে জল, কৌশল্যা তোমার শিক্ষা ধন্য কিন্তু এ শিক্ষায় গুরু উপদেশের আবশ্যক হয় না, এইটীই বড় অদ্ভুত।

গোপেশ্বর কৌশল্যার চক্ষের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিলেন এবং আপন অঙ্গুলী হইতে সহস্রাধিক মুদ্রার মূল্যের হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া কৌশল্যার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন।

কৌশল্যা অধিকতর কাতরস্বরে গোপেশ্বরের দর্শন ভিক্ষা করিতে লাগিল। গোপেশ্বর অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন "সন্ধ্যাকালে আমি নিশ্চয়ই আসিব. আমি তোমার প্রাণে কি ক্লেশ দিতে পারি ?"

কৌ। "দেখ আসিবার সময় একটা যদি জিনিস আন, তা'হলে আমি যে কত খুসী হইব।"

গো। "কি বল, সাধ্যমত তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিব না।"

কৌ। "আমি কখন ১০০৲ টাকার নোট দেখিনি, যদি একখানি তোমার বাটী হইতে আন, আমি দেখে আবার ফিরাইয়া দিব"

গো। "একখানা কি বলিতেছ, আমি পাঁচখানা হাজার টাকার নোট আনিব, তুমি বল ফেরৎ দেবে না তবে আমি আনিব।"

কৌশল্যা তাহাই চায়, বলিল "আমি তোমার নোট নিলে তুমি কি মনে করিবে ?"

গো। "আমি মনে করিব যে তুমি আমায় প্রাণের অধিক ভালবাস" গোপেশ্বর কৌশল্যার বদন চুম্বন করিয়া নোট লওয়াইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

কৌশল্যা অনিচ্ছার ভাণ করিয়া বলিল "তবে যদি নিতে হয় দশখানা আনিও পাঁচখানা নোট লইয়া আর হাতে গন্ধ করিব কেন ?"

গোপেশ্বর তখন উন্মত্ত সে তাহাতেই সম্মত হইল। গোপেশ্বর অনেক কষ্টে গোবর্দ্ধনের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। যাইবার সময় রেবতীকে সন্ধ্যার সময় আসিয়া পুরস্কার দিবে বলিয়া গেলেন।

গোবর্দ্ধন রাত্রে বাড়ী আসিতে পারে নাই। প্রাতঃকালে সর্ব্বেশ্বর বাবু কাছারী বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রজাগণ কাতারে কাতারে আসিয়া কাছারী বাড়ীর প্রাঙ্গণ-ভূমি অধিকার করিতেছিল। সকলেই

সর্ব্বেশ্বরের সদয় ব্যবহারে শিষ্টবচনে সন্তুষ্ট, দেওয়ানজীকে তাহারা দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না। দেওয়ানজী প্রজার রক্তশোষণ কার্য্যে বিশেষ নিপুণ থাকায় প্রজাগণ দেওয়ানজীর উপর বড়ই অসন্তুষ্ট তাহারা ভয়ে সর্ব্বেশ্বর বাবুকে কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের আর সহ্যও হয় না। প্রত্যহে দলে দলে প্রজাগণের আগমনের কারণ না বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বিস্মিত হইলেন। দেওয়ানজী কতক ভীত হইল। সর্ব্বেশ্বর বাবু নিজে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজারা একবাক্যে সর্ব্বেশ্বর বাবুর গুণের প্রশংসা করিয়া তাহারা তাঁহার জমিদারী ছাড়িয়া যাইবে সেইজন্য বিদায় লইতে আসিয়াছে, সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল।

সর্ব্বেশ্বর বাবু সে কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "কারণ ? আমি কি তোমাদের উপর কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তাই তোমরা আমার জমিদারী ছাড়িয়া যাইতেছ ?"

সদয় মণ্ডল প্রজাদিগের মুখপাত্র রূপে বলিল—

"এ কথা আমরা যদি বলি, তবে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে আমাদের নরকেও স্থান হইবে না। আপনি আমাদের পিতার স্বরূপ। আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আমরা আপনাকে দেবতা অপেক্ষা শ্রদ্ধা ভক্তি করি, আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদের প্রাণ কাঁদিতেছে, অথচ না যাইলেও আমাদের উপায় নাই।" এই বলিয়া তারা মৌন হইয়া রহিল।

সর্ব্বে। আমি তোমাদের উঠিয়া যাইবার কারণ না জানিতে পারিলে, তাহার প্রতিকার করিতে পারি না।"

সদয়। মহাশয়! আপনার জমীদারীতে যে সমস্ত পুষ্করিণী আছে সে গুলির সংস্কারসাধন না করায় আমাদের জলকষ্টের একশেষ

হইয়াছে। আপনি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের জন্য গত বৎসর হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিছুই এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না।”

আর এক জন প্রজা বলিল, “আপনার জমীদারীর মধ্যে যে সকল ডাক্তারখানা আপনি স্থানে স্থানে বসাইয়াছেন, তাহা আর চলে না।” ঔষধাদি কিছুই নাই কোন কোন স্থানে ডাক্তারের জবাব হইয়াছে।” আর এক জন বলিল “মহাশয়! আপনার জমীদারীতে আমরা খাজনা ছাড়া এক পয়সাও অন্য কোনরূপে উপরি দিই নাই। এক্ষণে আমাদের নানা রকমে আবার দিতে হইতেছে। আমরা গরীব লোক আমরা মারা পড়ি।”

অন্য একজন বলিল, “আপনার জমীদারীর মধ্যে কল্যাণপুরের বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কার না করিলে এবারে বর্ষায় বন্যা আসিয়া গ্রামকে গ্রাম ধুইয়া লইয়া যাইবে। আপনি বাধ সংস্কারে হুকুম দিয়াছিলেন. কিন্তু তাহার কিছুই এ পর্য্যন্ত হইল না।”

আর একজন বলিল “গ্রামের পথ-সংস্কার না হওয়ায় আমাদের চলাফেরা কষ্টকর হইয়াছে।”

এইরূপে সকলে নানাপ্রকার অনুযোগ অভিযোগ সর্ব্বেশ্বর বাবুকে শুনাইলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু প্রাণপণে প্রজাদিগের মনোরঞ্জনে যত্নবান থাকিতেন, সকল বিষয় নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন, এক্ষণে গোবর্দ্ধনের কার্য্যপটুতায় অনেক ভার তাহার উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোবর্দ্ধন জমীদারের পাই পয়সা আদায় দেখাইত, প্রজারা যে সমস্ত আপনাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করিত, গোবর্দ্ধন তাহা মিটাইত. আদালতে মোকদ্দমা যাইতে দিত না, কিন্তু ঐরূপ নালিশে দুই পক্ষের জরিমানা করিত। তবে কম আর বেশী। জরিমানার বেশীর ভাগটা নিজেই লইত, কমটা জমীদার-সরকারে জমা দিত। জমীদারীর

উন্নতিকল্পে প্রজাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জন্য যে সমস্ত টাকা জমীদার হইতে খরচের হুকুম হইত, গোবর্দ্ধন তাহার দশ আনা ছয় আনা ভাগ করিত, দশ আনা নিজে লইত, ছয় আনা খরচের জন্য রাখিত। সমস্ত খাজনা আদায় দেখাইয়া, গোবর্দ্ধন জমীদার-সরকারে বাহাদুরী লইত। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত উপরি আদায় হইত তাহা জমীদার-সরকারে জমা দিলে, সর্ব্বেশ্বর বাবু রাগ করিবেন, ফেরৎ দিবার হুকুম দিবেন. কাজেই গোবর্দ্ধন সে সমস্ত নিজেই লইত। গোবর্দ্ধন দেওয়ান হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে টাকাকড়ির আয়ব্যয় হইতেছিল। জমীদার-সরকারে আয়ব্যয়ের বেশ আটাআঁটি হিসাব, কিন্তু ভিতর হইতে প্রজাদিগের মহাকষ্ট! তাই অনেকদিন সহ্য করিয়া প্রজারা জমীদার-সরকারে নালিশ করিতে আসিয়াছে। তাহারা সর্ব্বেশ্বর বাবুকে বেশ চিনিত, তাহারা সর্ব্বেশ্বর বাবুর কোন দোষ নাই, তাহাও জানিত, দেওয়ানজী টাকাগুলি নিজস্ব করিয়া লইতেছে; তাহাও বুঝিয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া এতদিন কোন কথা বলিতে পারি নাই। প্রজারা প্রথমে কানাঘুষা পরে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। তারপর প্রজাগণ ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের নিকট আসিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন দেওয়ান থাকিলে তাহারা জমীদারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।" সর্ব্বেশ্বর বাবু নিজে যদিও আয়ব্যয়ের হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। মধ্যে মধ্যে জমীদারীও দেখিতে যাইতেন, কিন্তু ক্রোশের উপর বহু ক্রোশব্যাপী বিশাল জমীদারীর সর্ব্বস্থলে যাওয়া অসম্ভব। সব নিজে তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না; দেওয়ানজীর উপর অনেক ভার দিতে হইয়াছিল। দেওয়ানজী সুযোগ পাইয়া ব্যয়ের ঘরের টাকা সমস্ত ব্যয় না করিয়া নিজে অনেকটা আত্মসাৎ করিতেছিল। আয়টা ঠিক দেখাইত, সে টাকায় হাত দিত না।

সর্ব্বেশ্বর বাবু প্রজাগণকে স্থির হইতে বলিয়া গোবর্দ্ধনকে পার্শ্বের কামরায় আসিতে বলিলেন। গোবর্দ্ধন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিলেন, গোবর্দ্ধন টাকা আত্মসাৎ করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "দেওয়ানজী প্রজারা জমীদারী ছাড়িয়া যাইতে চায় ব্যাপারটা কি? ওরা যাহা বলিতেছে তাহা কতদূর সত্য।"

গোবর্দ্ধন ইহার কি উত্তর করিবে? হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে, এখন কেবল পুলিস ডাকিলেই হয়। সর্ব্বেশ্বর বাবু দয়াবান লোক সে সব কিছুই করিলেন না। নিজের পুত্র নাই এক কন্যা, বিষয়াদি সকলই তাহার হইবে। এক জন জামাতা হইলে সে বিষয় কার্য্যে সাহায্য করিবে, টাকাকড়ি ভবিষ্যতে তাহার সব হইবে, কাজেই বিষয় আশয় দেখাশুনা করিতে তাহার যত্ন হইবে, এই সব ক্ষণেকের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর বাবু ভাবিলেন, ভাবিয়া কন্যার যাহাতে সত্বরে বিবাহ দিতে পারেন, তাহাই স্থির করিলেন এবং দেওয়ানজীকে প্রজাদিগের সমস্ত অভাব দূর করিবার জন্য আদেশ করিলেন, বলিলেন "দেওয়ানজী, আমি তোমারে এবারে কিছু বলিলাম না, দেখ যেন পুনরায় এরূপ ঘটনা না হয়। যত টাকা লাগে প্রজাদিগের অভাব মোচন কর। জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করা, নদীর বাঁধ সংস্কার করা শীঘ্রই আবশ্যক, ডাক্তারখানার বন্দোবস্ত না করিলে গরীব প্রজা নানারূপ পীড়ায় হস্তে মারা পড়িবে, এ সমস্তই বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়, অণুমাত্র ইহাতে আলস্য করিবে না। প্রজা সুখে থাকিলে তবে জমীদারের সুখ, প্রজা জমীদারের পুত্রতুল্য, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করা জমীদারের অবশ্যকর্ত্তব্য। যে জমীদার প্রজাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যতা না দেখিয়া আপনার আয়ের প্রতি কেবল লক্ষ্য রাখে, সে জমীদার প্রজার জমীদার নহে, যমতুল্য। তুমি প্রজাদিগের অভাব অভিযোগে বিশেষ,

মনঃসংযোগ করিবে, প্রজাদের দেয় কর ভিন্ন তাহাদিগের নিকট হইতে এক পয়সা অধিক যেন আদায় করা না হয়। কর আদায় দিতে অক্ষম প্রজাদিগের উপর যেন কোনরূপ উৎপীড়ন না হয়, অজন্মা হইলে প্রজাদিগের কর সম্ভবতঃ রেহাই দিবে, প্রজাদিগের অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া জমীদারী-সরকার হইতে বিনা সুদে সময়ে সময়ে টাকা ধার দেওয়া উচিত, সেই টাকা আদায়ের সময় যাহাতে প্রজাদের উপর কোনরূপ পীড়ন না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য, মড়ক হইয়া হালের গরু মরিতে থাকিলে প্রজাদিগকে গরু কিনিবার টাকার সরবরাহ করা কর্ত্তব্য, সে টাকা আদায় দিতে না পারিলে রেহাই দেওয়া আবশ্যক। আমাকে যেন প্রজাদিগের কষ্টের বা তাহাদের উপর পীড়নের কথা না শুনিতে হয়।" দেওয়ানজীকে সর্ব্বেশ্বর বাবু অতি গম্ভীর ভাবে এই-রূপ উপদেশ দিয়া প্রজাদিগের নিকট আসিলেন এবং প্রজাদিগকে অতি আদরের সহিত অতি মধুর কথায় সান্ত্বনা করিলেন এবং তাহা-দের অভাব শীঘ্র দূর হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। তাহাদের দেয় খাজনার উপর এককড়া কড়ি জমীদারের লোকদিগকে প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন, প্রজাগণ সর্ব্বেশ্বর বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। পুনর্ব্বার গোবর্দ্ধনকে দুই এক কথায় সাবধান হইতে বলিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বাটীর ভিতর গমন করিলেন। গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বর বাবু চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কি ভাবিল, পরে আপনাআপনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধনের আহ্লাদ আর ধরে না, সর্ব্বেশ্বর বাবু অতি ভদ্রলোক তথাপি তিনি যে প্রকারে গোবর্দ্ধনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহাতে অন্ত লোক হইলে লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইত কিন্তু গোবর্দ্ধনের অন্যান্য সকল গুণ অপেক্ষা নির্লজ্জতাই সকল গুণের মস্তকে আরোহণ

করিয়াছিল। গোবৰ্দ্ধনের ন্যায় বেহায়া নির্লজ্জ কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

সংসারে গোবর্দ্ধনের মত বড় মানুষ হইতে ইচ্ছা কর, তোমাকে কতকটা নির্লজ্জ হইতে হইবে। মান-অপমান অনেকসময়ে সমান জ্ঞান করিতে হইবে। ইজ্জৎ লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাও, মা লক্ষীর বরপুত্র হওয়া দায় হইবে। ধন উপার্জ্জন যদি তোমার লক্ষ্য হয়, একটু সহগুণ অভ্যাসের আবশ্যক হইবে। লোকের কথায় হাসিলে লোকের কথায় কাঁদিলে চলিবে না। হাসি-কান্না তোমার হাতধরা হওয়া চাই। অপমান তিরস্কার অঙ্গের আভরণ করিয়া লইতে হইবে।

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ
স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসো চ মূর্খতা

এই ঋষিবাক্যের দাস হইতে হইবে। গোবৰ্দ্ধন ঘোর বিষয়ী লোক, সে লাথি-ঝাঁটার ভয়ে নিজের কাজ হারাইত না। সর্ব্বেশ্বর বাবু টাকা ফেরৎ চাহিলেন না, দুই এক কথা মিষ্ট মিষ্ট বলিলেন, তাহাতে কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে? কিছু না বলিয়া যদি গোবর্দ্ধনের নিকট সর্ব্বেশ্বর বাবু টাকা ফেরত চাহিতেন বা প্রত্যার্পণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন তবে হয়ত গোবৰ্দ্ধনের সেই সঙ্গেই প্রাণটা বাহির হইয়া যাইত। সর্ব্বেশ্বর বাবু তাহা না করিয়া চুপে চুপে দুটা বকিয়া ঝকিয়া চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধনের তাহাতে কিছু আসে যায় না। সে সর্ব্বেশ্বর বাবুকে একটা মহৎ গাধা বলিয়া মনে করিত। গোবর্দ্ধনের মত লোকের কাছে ভদ্রতা মহা-দোষের বিষয়, ভদ্রলোককে গোবর্দ্ধনের মত লোক গাধাই মনে করিয়া থাকে। সেই ভাবিয়া গোবর্দ্ধনের হাসি আর ধরিতেছিল না। তখন প্রায় ৯টা বাজিয়াছে গোবৰ্দ্ধন বড়ই হৃষ্ট-মনে গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল। রাস্তায়

গোপেশ্বরের সহিত দেখা হইল। কৌশল্যার সহিত বিদায়-গ্রহণে অনেকটা বিলম্ব হইয়াছিল ও রাত্রিজাগরণের জন্য পথ চলিতে বড় কষ্ট হইতেছিল, রাস্তায় দুই এক জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কহিতে হইয়াছিল, এই সব কারণে বেলা হইয়াছিল। গোপেশ্বর রাস্তায় দেওয়ানজীকে দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন, মনে পাপ থাকিলে ঐরূপই হয়, শঙ্কা পাছে দেওয়ানজী গত রাত্রের কথা জানিতে পারিয়া থাকে, পাছে সন্দেহ করে, তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোপেশ্বর বাটী ফিরিতেছেন কিন্তু গোপেশ্বর যখন দেখিলেন, দেওয়ানজী একমনে কি বকিতে বকিতে যাইতেছে, কখন কখন মুখে হাসি দেখা দিতেছে, তখন গোপেশ্বরের মন প্রকৃতিস্থ হইল এবং ধীরগতিতে বাটীর দিকে গোপেশ্বর চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন বড়ই হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরিতেছিল। বাড়ী আসিয়া প্রথমেই রেবতী দাসীর সহিত দেখা হইল। রেবতী কর্ত্তা রাত্রে কেন বাটী আসেন নাই জিজ্ঞাসা করায় গোবর্দ্ধন কিছু উত্তর না দিয়াই অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন কৌশল্যা স্নান করিতেছিল। গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া কিছুই ব্যস্ত হইল না। একমনে স্নানই করিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনও কৌশল্যার সহিত বড় একটা সম্ভাষণ না করিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল। দাসী রেবতী কৌশল্যাকে কর্ত্তার আগমনবার্ত্তা জানাইল। কৌশল্যা "দেখিয়াছি" বলিয়া কথার উত্তর দিল। স্বামী কাল রাত্রে বাড়ী আসেন নাই, কেমন ছিলেন, কেমন আছেন, এ সমস্ত যে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কৌশল্যার তাহা মাথাতেও আসিল না, এ পর্য্যন্ত কখন আসেও নাই। যথাসময়ে স্বামী-স্ত্রীর দেখাশুনা হইল। প্রথমেই কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে দু'দশ টাকা কিছু আছে ?"

গো। "বড়ই মজা হয়ে গেছে, প্রতিদিন যে সব টাকা জমিদার-সরকার হইতে ঘরে আনা গিয়াছিল, সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

কৌশল্যার বড় ভয় হইল কেবল 'তবে কি টাকা সব ফেরত দিতে হবে?" গোবর্দ্ধনের জেল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও কৌশল্যার এত ভয় হইত না সেইজন্য টাকা ফেরতের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

গো। "সর্ব্বেশ্বরটা গাধা, আমি চিরকালই বলে আসছি। অত বড় গাধা মানুষের মধ্যে নাই, টাকা ফেরত চাওয়া দূরে থাকুক, সে কথা মুখেও আনে নাই। কেবল দুটা একটা মুখের আস্ফালন হল আর সব থেমে গেল"। কৌশল্যার বুক এতক্ষণ চিপ্ চিপ্ করিতেছিল, এখন স্বামীর উপর দুই একটা অপমানের কথা কহিয়াই যে সর্ব্বেশ্বর নিরস্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া কৌশল্যার ধড়ে প্রাণ আসিল, মুখে হাসি দেখা দিল।

গো। "এখন দিনকতক কিছু সাবধানে চলিতে হইবে। দিন কতক টাকাকড়ি আনা বন্ধ থাকিবে, তুমি সেই কয়দিন একটু হিসাব করিয়া চলিও, চাকরী কবে আছে, কবে নাই। যে কদিন আছে গুছাইয়া লওয়া আবশ্যক।"

কৌশল্যা জানিলে বলিত "Amen"

ঐ মতেই মত।

গোপেশ্বর কেবল এই কয়দিন হইল কৌশল্যার কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই গোপেশ্বর মদ ধরিয়াছেন। দাসী রেবতী চুপে চুপে মদ আনে। শুঁড়ি মনে করে দেওয়ানজী বুঝি মদ খায়। রাত্রি ৯টার পর চুপে চুপে রেবতী দোকানের পাশে গিয়া দাঁড়ায় শুঁড়ি মদ আনিয়া রেবতীর হাতে দেয়। রেবতী বাটীতে আনিয়া

কৌশল্যার নিকট দেয়। কৌশল্যা আদর করিয়া সেই মদ গোপেশ্বরকে খাওয়ায়। প্রথম প্রথম গোপেশ্বর "কখন মদ খায় নাই খাইতে পারিবে না" ইত্যাদি বলিয়া একটু আধটু অসম্মতি দেখাইয়াছিল। কিন্তু চতুরা কৌশল্যার কপট প্রণয়-জনিত অনুরোধের নিকট গোপেশ্বরের অসম্মতি কোথায় ভাসিয়া গেল। গোপেশ্বর বেশ মদ খাইতে লাগিল এবং ঐরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল।

৯

একদিন কৌশল্যা অভিমানভরে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় গোপেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল ; রেবতীকে অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রেবতী বলিল "আমি ত জানি না, শুনিয়াছিলাম আপনি আর আসিবেন না। শুনিয়া পর্যন্ত গৃহিনীর আহার নিদ্রা নাই। বলিয়াছেন—হয় নিজে মরিবেন, না হয় আপনাকে লইয়া আর কোথায় চলিয়া যাইবেন। আপনাকে না দেখিতে পাইলে উনি কখনই বাঁচিবেন না।" রেবতীকে যেমন পাঠ পড়ান হইয়াছিল সে ঠিক সেই রূপ আবৃত্তি করিল। গোপেশ্বরের আর আহ্লাদ ধরেনা। তাহাকে না দেখিতে পাইলে কৌশল্যা মরিতে চায় ? গোপেশ্বরের মত ভাগ্যবান পুরুষ জগতে আর কে আছে ? রেবতীর কথা কৌশল্যা সবই শুনিতে ছিল আর মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু গোপেশ্বর নিকটে আসিলেই কৌশল্যা চক্ষু হইতে দর দর জল-ধারা বাহির করিতে আরম্ভ করিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে কৌশল্যা গোপেশ্বরের পানে চাহিল। জানাইল—সে কাঁদিতেছে। সরল-হৃদয় গোপেশ্বর কৌশল্যার চাতুরীর গভীরতা কি বুঝিবে? সে একবারে যাইয়া কৌশল্যার অলক্তরাগরঞ্জিত-চরণ দুখানি আপনার বক্ষে ধারণ করিল এবং কৌশল্যাকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না বা সে যতদিন বাঁচিয়া

থাকবে ততদিন কৌশল্যার নিকট আগমন বন্ধ করিবে না, বলিয়া বার বার শপথ করিতে লাগিল। কৌশল্যা উঠিয়া বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়নদ্বয় মুছিল। গোপেশ্বরকে লইয়া কত আদর করিল। শীঘ্রই কৌশল্যার মনোমত রত্নখচিত বহুমূল্য অলঙ্কার আনিয়া দিবে, তাহাতে যদি তাহার একখানি বড় জমীদারী বাঁধা পড়ে, তথাপি পশ্চাৎপদ হইবে না, বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

গোপেশ্বর মদ খাইয়া আসিয়াছিল, ইদানীং গোপেশ্বর বাহিরে মদ খাইতে সঙ্কুচিত হইত না। নেশা অল্প অল্প জমিয়া আসিতেছে, কৌশল্যা নিকটে বসিয়া আছে, নানারূপ প্রেমালাপ চলিতেছে, এমন সময় কৌশল্যা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। গোপেশ্বরের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল—হয়ত কৌশল্যা আবার বলে সে মরিবে। কৌশল্যা ঠিক তাহাই বলিল। বলিল "আমি আর এ প্রাণ রাখিব না, তুমি আমাকে একদিন না একদিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, সে যন্ত্রণা, মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতেও অধিক ক্লেশকর,—ভাবিতেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়—দাও শেষ আলিঙ্গন দাও আমি মরিতে চলিলাম।" গোপেশ্বরের মুখ দিয়া আর কথা সরে না। গণ্ডদেশ রক্তহীন, মুখবিবর রস শূন্য হইয়া উঠিল। গোপেশ্বর বলিল "তুমি কেন এরূপ মিথ্যা ভাবনাকে মনে স্থান দিয়া বৃথা কষ্ট পাও—আমি তোমাকে ত্যাগ করিব—ইহাও কি সম্ভবে?"

আর একদিন কৌশল্যা দাসীকে দিয়া বাজার হইতে বিষ কিনিয়া আনিয়া আঁচলে বাধিয়া রাখিল, আর গোপেশ্বর আসিলেই কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক পীড়াপীড়ীর পর তাহার মনের ভাব জানাইল। বলিল "আমি এরূপ যাতনা আর কতদিন ভোগ করিব? গোপেশ্বর! তুমিও আমার নও আমার হইবেও না। তোমার সুন্দরী স্ত্রী আছে, তুমি তার—তার তুমি বার মাসের—আর আমার-তুমি চদিনের

ন্যায়—এক নিমিষের জন্য তুমি আমার। তোমার স্ত্রীর কি অদৃষ্ট, সে দিন রাত তোমায় দেখিতে পায়। আমি তোমাকে দেখিতে পাইব বলিয়া কত দেবতাকে মানিতে হয়—দেবতা প্রসন্ন হইলে অভাগিনী তোমায় মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পায়। আমি আর এ ছার প্রাণ রাখিব না। মরিব—এই দেখ বিষ কিনিয়া আনাইয়াছি। শেষ দেখা দেখিয়া মরিব বলিয়া এতক্ষণ মরি নাই" এই বলিয়া কৌশল্যা আঁচল হইতে বিষ বাহির করিয়া গোপেশ্বরকে দেখাইল। গোপেশ্বরের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে কৌশল্যার চরণ-প্রান্তে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল, বিষ ভক্ষণ হইতে তাহাকে নিরস্ত করিতে লাগিল, বিষ ফেলিয়া দিলে কৌশল্যার চরণ ছাড়িবে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। গোপেশ্বর সেই রাত্রে আর একখানি জমাদারী বাঁধা দিবার সংকল্প মনে মনে করিল। সেই বন্ধকের টাকা কৌশল্যার চরণে আনিয়া ঢালিয়া দিবে তাহাও স্থির করিল, নগদ টাকা-কড়ি গহনা ইত্যাদি গৃহে যাহা ছিল ২।১ মাসের মধ্যে কৌশল্যার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়া গোপেশ্বর সমস্তই হারাইয়াছিল। এক্ষণে জমীদারী বাঁধা পড়িতে লাগিল ও ২ ৩ মাসের মধ্যে ২।১ খানি জমিদারী বিক্রয় হইবারও উপক্রম হইল। তখন চারিদিকে বড়ই গোলযোগ হইতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু সব কথা শুনিলেন। গোপেশ্বর মদ ধরিয়াছে, বেশ্যা রাখিয়াছে, সর্ব্বস্ব খোওয়াইতে বসিয়াছে, এ সব তাঁহার কাণে উঠিল। কৌশল্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ের কথা তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই। সর্ব্বেশ্বরবাবু বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। জমিদারীর তত্ত্বাবধারণের ভার নিজে লইলেন। গোপেশ্বরের মাতা ও স্ত্রী আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে সব কথা জানাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে

অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু সর্ব্বমঙ্গলার সহিত পরামর্শ করিয়া গোপেশ্বরের নিকট হইতে সমস্ত জমীদারীর পত্তনি লইতে চাহিলেন। গোপেশ্বর আর টাকা-কড়ি পায় না। কেহ আর জমীদারী বন্ধক রাখিতে চায় না। কৌশল্যা দেখিল এখন আর গোপেশ্বর তাহাকে টাকা কড়ি দিতে পারিবে না। সে গোপেশ্বরকে পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন করে না। কটু কথা বলে, তথাপি গোপেশ্বর কৌশল্যার নিকট আসিতে ছাড়ে না। একদিন কৌশল্যা বলিল "গোপেশ্বর এখানে আর তোমার আসা চলে না। জানাজানি হইবার উপক্রম হইয়াছে। দেওয়ান-জীর কাণে এ সব কথা উঠিলে তোমার ও আমার দুইজনেরই প্রাণ যাইবে। তাই বলিতেছি তুমি আর এখানে আসিও না।" মাথায় বজ্রপাত হইবে জানিতে পারিলে গোপেশ্বরের এতদূর ভয় হইত কিনা সন্দেহ। সে কৌশল্যার চরণতলে পড়িয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিল তথাপি কৌশল্যার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। পাপীয়সী কৌশল্যার হৃদয়ে দয়া, মায়া, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি কোনরূপ সদ্বৃত্তিই অঙ্কুরিত হয় নাই। গোপেশ্বরের মান-সম্ভ্রম—টাকার খাতিরে, এখন টাকা পাওয়া বন্ধ হইয়াছে—কৌশল্যা এক্ষণে গোপেশ্বরকে মধু-অপহৃত মধু-চক্রের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে চায়। গোপেশ্বর কিন্তু কৌশল্যার রূপে উন্মত্ত। পুরুষ আপনাকে যতই বুদ্ধিমান মনে করুক না কেন, রমণীর দুর্ভেদ্য বুদ্ধিকৌশলের নিকট পুরুষকে চিরদিনই অবনত-মস্তকে থাকিতে হইবে। স্ত্রী জাতি মনে করিলে এই সংসারের—অবিশ্রান্ত কোলাহলময় এই সংসারের—পুরুষের বড় সাধের কার্য্যক্ষেত্র, এই সংসারের—গতি, একদণ্ডেই বন্ধ করিয়া দিতে পারে। হাট, বাজার বাণিজ্যস্থান রমণীর ইঙ্গিতে সমস্তই নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে। বেদান্ত-পুরাণ, উপনিষদ্, বিজ্ঞান, দর্শন পুরুষ-পরম্পরা

গত চিরসঞ্চিত জ্ঞানরাশি রমণীর কটাক্ষতাড়নে নিশ্চল আবর্জ্জনার ন্যায় অকর্ম্মণ্যভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে। কোন্ অবাধ্য পুরুষ রমণীর অভিমানজনিত বিম্ববাগরাগরক্ত-চারু-অধর-স্ফুরণে উপেক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণে সাহসী হইতে পারে? রমণীর প্রেম অবহেলা করিয়া কোন অপ্রেমিক সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে? এক্ষণ কি রমণীর তর্জ্জনীহেলনে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সমস্ত সৌরজগত নিজ নিজ কার্য্যে স্থির ভাবে রমণীর আদেশ অপেক্ষায় দণ্ডায়মান্ থাকিবে। পুরুষের বল, বীর্য্য, উদ্যম, অধ্যবসায় সকলই রমণীর সন্তোষ সাধনের উপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—একথা কে অবিশ্বাস করিবে? তবে দুর্ব্বল বুদ্ধি গোপেশ্বর, কৌশল্যার দাসানুদাস হইবে, পালিত ভল্লুকের ন্যায় কৌশল্যার ক্রীড়ার সামগ্রী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

গোপেশ্বর ইদানীং কৌশল্যাকে আর দেখিতে পায় না। কতবার কৌশল্যার বাটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে—কৌশল্যার মুখখানি যদি একবার দেখিতে পায়, যদি একবার তার মনমজান কথা শুনিতে পায়, গোপেশ্বর কত প্রকার অছিলায় কৌশল্যার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কখন কখন কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু কৌশল্যাকে দেখিতে পায় না। গোপেশ্বর তখন উন্মত্ত। কোন প্রকারে কৌশল্যার দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল। ইদানীং কতদিন কতবার কৌশল্যা গোপেশ্বরকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়া আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, রেবতী কত অপমান করিয়াছে, তথাপি গোপেশ্বরের চৈতন্য হয় নাই। তথাপি কৌশল্যার বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া

যায়. যদি বা কৌশল্যা একবার তাহার কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করে। কৌশল্যারও বিষম বিপদ, পাছে দেওয়ানজী জানিতে পারে, জানিতে পারিয়া দেওয়ানজী যদি একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধাইয়া বসে। দুশ্চারিণী-দিগের প্রাণের মায়া বড় অধিক। তাহারা অনায়াসে সব করিতে পারে, কেবল মরিতে পারে না। মরিবার বড় ভয়। কৌশল্যা গোপেশ্বরের হাত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে, দিবারাত্রি তাহাই তাহার ভাবনা।

.

গ্রীষ্মকাল—একদিন রাত্রে গোবর্দ্ধন ও কৌশল্যা দুইজনে ছাদের উপর বসিয়া গল্প করিতেছে। গল্প না রস প্রসঙ্গে পূর্ণ, প্রেমালাপের ধার দিয়াও যাইতেছিল না। কাহার নিকট কত টাকা আসল, কত কত সুদ পাওনা, কাহার বিষয়টা কিনিতে হইবে, কাহার ভদ্রাসন বাটী বেচিয়া লইতে হইবে, কাহার কি সর্ব্বনাশ করিতে হইবে দুইজনে স্ত্রী-পুরুষে একমনে তাহারই আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। কৌশল্যা বলিতেছিল,—"যদি জমীদারের বাটীর পাওনা থোওনায় গোল হইয়া থাকে, তবে সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া যাক—জমীদারের দিন দিন এমন ছোট নজর কেন হইতেছে, আগেত ছিল না, না হয় কর্ম্মটা ছেড়ে দাও, অনেক জায়গায় কর্ম্ম মিলিবে।" ছোট নজর—কেন না দেওয়ানজীর চুরির উপর জমীদারের নজর পড়িয়াছে কাজেই জমীদারের নজর ছোট। গোবর্দ্ধন—'হঠাৎ কর্ম্মটা ছাড়া যুক্তি সঙ্গত নহে দিনকতক যাউক,—প্রজা বেটাদের শাসন করিতে হইবে সেই বেটারাই জমীদারের চোক ফুটাইয়া দিয়াছে; সে বেটাদের সর্ব্বনাশ করি, জমীদারের জমিদারীতে ঘুঘু চরুক, তবে ছাড়িয়া যাইব। জমীদার—রাজীবকে পুলীশের হাত হইতে ছাড়াইয়া

লইয়াছেন. আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। রাজীব ও সর্ব্বেশ্বর বাবুর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে এবাটী হইতে বাহির হইব।

কৌশল্যা—রাজীবকে, আর তার মা মাগীকে রীতিমত জব্দ করিতে হইবে।"

গোব। "আমি সেই চেষ্টায় আছি।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ খিড়কীর দরজার দিকে কৌশল্যা দেখিল—অন্ধকার ভেদ করিয়া অতি সন্তর্পণে কে যেন বাটীর দিকে আসিতেছে। কৌশল্যা বুঝিল—গোপেশ্বর পাছে সে কোন রূপ গোলযোগ করে, এই ভাবিয়া কৌশল্যার মনে বড় ভয় হইল, পাছে সকল কথা গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারে এই জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা কৌশল্যা তখনই ভাবিয়া লইল। সে গোবর্দ্ধনকে অঙ্গুলী বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিল, "দেখ, খিড়কীর দিকে চোরের মত কে একটা আসিতেছে!"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"ওটা মানুষ নয় একটা কি জানোয়ার" তখন গ্রামে বন্য বরাহের ভয় হইয়াছিল, গোবর্দ্ধন ভাবিল,—ভদ্রাসনে হয়ত একটা বন্য বরাহ আসিয়াছে।

কৌশল্যা সুবিধা পাইয়া বলিল,—"শীঘ্র বন্দুকটা আন, উহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল তা না হইলে আমি খিড়কীর দিকে একেবারেই যাইব না" গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি বন্দুক আনিল এবং সেই অন্ধকারের ভিতর লক্ষ্য করিয়া জানোয়ারের প্রতি গুলি ছাড়িল. বন্দুকের শব্দের সঙ্গে "বাপ" বলিয়া একটা শব্দ গোবর্দ্ধন শুনিতে পাইল।

গোবর্দ্ধন বলিল একি? এত জানোয়ার নয়, মানুষের গলায় আওয়াজ শুনিলাম, ব্যাপার কি?

তখন দুইজনে একটা আলোক লইয়া খিড়কীর দিকে গেল—দেখিল

একজন সুন্দর যুবাপুরুষ, পরিধানে দিব্য বস্ত্র, ভূমিতে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আলোক অধিকতর নিকটস্থ হইলে গোবৰ্দ্ধন ভয়-ব্যাকুল-নেত্রে দেখিল—গোপেশ্বর।

গোপেশ্বরের বুকের ভিতর দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। রক্তে বক্ষদেশ ভাসিয়া যাইতেছে। ভয়ে গোবৰ্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া গেল। গোপেশ্বরের প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই। সে যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে ভূমে অবলুণ্ঠিত হইতেছিল; সে সময়েও কি তাহার মনের ঐকান্তিকী বাসনা কৌশল্যার সেই চারু চন্দ্রানন-খানি দেখিয়া মরে—তা কে বলিবে? কৌশল্যা ও গোবৰ্দ্ধন কতক্ষণ ধরিয়া সেবা, শুশ্রূষা করিল, কিন্তু গোপেশ্বর আর বাঁচিল না। সেই-খানে ভূমিশয্যায় কৌশল্যার পদ-প্রান্তে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে গোপেশ্বরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। পাপীয়সী কৌশল্যা রেবতীর মুখের দিকে তাকাইল, মৌনাবলম্বনে থাকিতে তাহাকে সঙ্কেত করিল, রেবতী কোন কথা কহিল না। কৌশল্যার হাড় জুড়াইল, তাহার মুখে দুঃখের চিহ্ন কোনরূপ লক্ষিত হইল না। কুলটার প্রেমের বিষময় ফল গোপেশ্বর হাতে হাতেই পাইল।

সেই রাত্রেই গোপেশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ থানায় দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বেশ্বরও তাহা শুনিলেন। প্রভাত হইলে গোপেশ্বরের মৃত্যু সংবাদ গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কি জন্য গোপেশ্বর গোবৰ্দ্ধনের খিড়কীতে অত রাত্রে আসিয়াছিল তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। সেই সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিল। স্থানে স্থানে লোকজন জড় হইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক, বাদানুবাদ করিতে লাগিল, প্রতিস্থানেই লোকের মধ্যে

মতভেদ হইতে দেখা গেল। কেহ বলিল—গোপেশ্বর প্রেমের অন্বেষণে গিয়াছিল। গোপেশ্বরের চরিত্র সম্প্রতি মন্দ হইয়াছিল সকলে তাহা জানিত, কিন্তু কৌশল্যার সহিত তাহার অবৈধ প্রণয়ের কথা অনেকেই জানিত না। অতি সাবধানে গোপেশ্বর কৌশল্যার বাড়ীতে যাতায়াত করায় গোপেশ্বর যে কৌশল্যার প্রণয়-জালে জড়িত হইয়াছিল তাহা অনেকেরই ধারণায় আসে নাই, গোপেশ্বর বেশ্যাসক্ত হইয়াছিল—ইহাই সকলে জানিয়াছিল; সেই জন্য গোপেশ্বর গোবর্দ্ধনের খিড়কীতে এত রাত্রে কেন গিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে এত কল্পনা জল্পনা হইতেছিল; এক্ষণে অনেকেই কৌশল্যার সহিত গোপেশ্বরের অবৈধ প্রণয়ের সন্দেহ করিল,কেহ বা বলিল—গোপেশ্বরের অবস্থা এক্ষণে মন্দ হইয়াছিল সে হয়ত দেওয়ানজীর বাটীতে চুরীর অভিপ্রায়ে গিয়াছিল। কৌশল্যাও দেওয়ানজীকে সেই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দেওয়ানজী গোপেশ্বরকে বেশ চিনিত,সে ও কথায় বিশ্বাস করিল না। দেওয়ানজী বলিল—গোপেশ্বর চুরি করিবে আমার বিশ্বাস হয় না। এখনও উহার যে সম্পত্তি আছে তাহা অন্যের পর্ব্বত। তখন কৌশল্যা রেবতীর সঙ্গে গোপেশ্বরের অবৈধ প্রণয়ের কথা পাড়িয়া বলিল "গোপেশ্বরের স্বভাবটা বড় মন্দ হইয়াছিল, সে মাঝে মাঝে রেবতীকে কি ঠাট্টা করিত, হয়ত রেবতী তাহাকে ডাকিয়াছিল।" সেই সঙ্গে সঙ্গে রেবতীকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিল, গোবর্দ্ধন এই কথাটা সঙ্গত মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই রাত্রে দারগা মহাশয়, সর্ব্বেশ্বরবাবু ও পাড়ার ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে দেওয়ানজীর বাটীতে আসিয়া গোপেশ্বরের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিলেন। সকলেই গোপেশ্বরকে ভাল বাসিতেন, গোপেশ্বরের মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইলেন। চক্ষের জলে সর্ব্বেশ্বরের

বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। প্রতিবেশীগণেরও চক্ষে জল আসিল, কেহ কেহ বা কাঁদিলেন। গোপেশ্বর সেই রাত্রে গোবর্দ্ধনের খিড়কীতে কেন আসিয়াছিল তাহা কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। সর্ব্বেশ্বর বাবু সেই দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দারোগা বাবুকে বিশেষ রূপে তদারক করিতে বলিয়া গেলেন। গোপেশ্বরের মৃত দেহ স্থানান্তরিত করা হইল। দারোগা মহাশয় ও গোবর্দ্ধন চুপে চুপে অনেক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দারোগা বাবু গোবর্দ্ধনকে তাহার বিপদের কথা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতি পূর্ব্বে রাজীবের চুরী সম্বন্ধে দারোগা মহাশয় গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়াছিলেন, দারোগা মহাশয় কাজেই গোবর্দ্ধনের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন এক্ষণে আবার অনেক টাকা পাইবার আশায় দারোগার আহ্লাদ আর ধরে না। পরামর্শও শেষ হয় না, অনেক ক্ষণ পরে উভয়ের নির্জ্জন কথোপকথন শেষ হইলে দারোগা মহাশয় মৃত্যু (Accidental) বলিয়া রিপোর্ট দিবেন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সব শেষ হইল, কাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইলনা, কেবল গোপেশ্বরের জননী—নয়নের তারা হারাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকে তাঁহার মৃত্যু হইল—আর গোপেশ্বরের অভাগিনী পত্নী বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া—চির দুঃখিনী হইয়া রহিলেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলা গোপেশ্বরের মৃত্যুতে বড়ই ব্যথিত হইলেন, অনেক কান্না কাটি করিলেন। কৌশল্যার আপদের শেষ হইল পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কৌশল্যা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল এক

গোপেশ্বর হইতেই গহনা নগদ টাকা প্রভৃতিতে ২০।২৫০০০ টাকা আদায় করিয়াছে।

কৌশল্যার অবৈধ প্রণয়ের কথা রেবতী সকলই জানিত,কৌশল্যা—কার্য্য উদ্ধারের জন্য রেবতীকে বাহ্যিক বড়ই ভাল বাসা দেখাইত। মাসে ২ এটা ওটা সেটা ভাল ভাল পুরস্কার দিত। প্রকাশ করিয়া দিবার ভয়ে কৌশল্যাকে রেবতীর মন যোগাইতে হইত। এদিকে রেবতী জানিত কৌশল্যা তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, যখনই পীড়ন করিবে তখনই টাকা কড়ি আদায় করিতে পারিবে। কথাটাও ঠিক ; রেবতী মাঝে মাঝে,যে আবদার ধরিত কৌশল্যাকে সেই আবদার সহিতে হইত। গোপেশ্বরের অপঘাত মৃত্যুর পর হইতে কৌশল্যার মনে বড় ভয় হইয়াছিল, সেই জন্য কৌশল্যাকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য কুলটা বৃত্তি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কাজেই তাহার নিজের উপার্জ্জনের পথও বন্ধ হইয়াছিল। রেবতী কিন্তু একটা দাঁও মারিবার চেষ্টায় ঘুরিত। গোপেশ্বরের মৃত্যুর কারণ রেবতী অনেকটা জানিত। সে কৌশল্যাকে ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে একটা মোটা রকম টাকা আদায়ের চেষ্টায় ছিল। কৌশল্যাকে কাজেই রেবতীর অনেক অত্যাচার সহিতে হইতেছিল। কৌশল্যা স্তোক বাক্যে রেবতীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত শান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রেবতী আর থাকিতে চায় না। তাহাকে মুটা মুটা টাকা গা-ভরা গহনা না দিলে সে সব প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। কৌশল্যাও রেবতীর হাত কিরূপে এড়াইবে সেই ভাবনা লইয়াই দিন রাত ব্যস্ত রহিল। কৌশল্যা রেবতীকে অত টাকা অত গহনা কখনই দিবেনা বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল।

একদিন রেবতী বড় বাঁকা বাঁকা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সে কৌশল্যাকে বলিতে ছিল "আমাকে যে কয় টাকা ও সোনা দানা দিবে বলিয়াছ, দাও, আমি ঘরে যাইব। আমি আর চাকরী করিব না, না দাও আমি সকল কথা বাবুর কাণে তুলিয়া দিব। তুমি দিবে,দিতেছি, বলিয়া অনেক স্তোক দিয়াছ আর আমি সেকথা শুনিব না।" কৌশল্যা মহা ফাঁফরে পড়িল সে বলিল, রেবতী তুই কি আমায় চিনিস্ না? আমি যা দেব বলিয়াছি সে সবই তোকে দিব তুই কি আর দিন কয় সবুরকরিতে পারিস না? আমি ত পলাইয়া যাইতেছি না।

রেবতী—"ও কথা আমি বার বার শুনিয়াছি, আর আমি শুনিব না, তোমার সিন্দুক পোরা টাকা রহিয়াছে আবার গোপেশ্বরের নিকট কত টাকা পাইলে, আর আমাকে ৪০০ টাকা দিতে পার না; গহনা সমেত না হয় আমাকে ১০০০ টাকা দিবে। এতে আর দেরি করিলে আমি শুনিব না।"

কৌশল্যা—"রেবতী তুই যে টাকা টাকা করে পাগল হবার যো হলি। আমরা কিন্তু অত টাকা ভালবাসি না।"

রেবতী - "তাত সত্যি তুমি ত টাকা কিছুই ভালবাস না। রেবতী দাসী সব জানে ওর কাছে আর বড়াই কেন?

কৌশল্যা—'আচ্ছা টাকা আজই দেওয়া যাইবে তাহলেই ত হবে—তুই ত তাহলে আর টাকা চাহিতে পারিবি না।"

রেবতী—"পেলে আবার চাইব কেন? এমন বাপে আমায় জন্ম দেয় নাই।"

কৌশল্যা—"এখন চল দুজনে খিড়কীর পুকুর হতে গা ধুয়ে আসি আসিয়া তোকে টাকা কড়ি বুঝাইয়া দিব, দেখিস সর্ব্বসমেত ১০০০৲ টাকা। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোকে

ফাঁকি দেব একথা তুই মনে স্থান দিলি কেমন করে? আমি যদি টাকা ভালবাসতেম, তাহ'লে ঢের টাকা করিতে পারিতাম—গোপেশ্বরের নিকটই লক্ষ টাকা আদায় করিতে পারিতাম, আমার চক্ষু লজ্জাই আমাকে বাড়িতে দিল না। এবার অবধি যাতে চক্ষুলজ্জাটা না থাকে তাই করবো।

রেবতী কৌশল্যার চক্ষু লজ্জার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল কোন কথা বলিল না। রেবতী কৌশল্যার সহিত খিড়কীর পুকুরে গা ধুইতে গেল। যেখানে গোপেশ্বর গুলি খাইয়া পড়িয়াছিল সেস্থানে এখনও রক্তের দাগ দেখা দিতেছিল। সেখান দিয়া যাইতে রেবতীর গা শিহরিয়া উঠিল কিন্তু কৌশল্যার তাহাতে মুখে হাসি ধরে না। সে দাসীকে কত ঠাট্টা করিল।

দেওয়ানজীর খিড়কীর পুষ্করিণীটি বেশি বড় না হউক বেশ গভীর ছিল, পুষ্করিণীর জল বেশ, সান বাঁধান ঘাট, চারিটী পাহাড় বেশ পরিষ্কার, পাহাড়ের চারিধারে ফুল গাছ লাগান। কোন গাছে কুঁড়ি হরিয়াছে, কোনটীতে ফুল ফুটিয়াছে কোনটীতে আধ ফুটন্ত ফুল, কোনটা বা ফুটিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, ফুটিলেই যেন জীবন সার্থক হইবে।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—এমন সময় কৌশল্যা ও রেবতী গা ধুইবার জন্য পুষ্করিণীতে আসিল। কৌশল্যা বলিল "গোপেশ্বরের মৃত্যুতে আমার যা কষ্ট হইয়াছে তা, রেবতী, তোকে আর কি বলিব—দেখাইবার হইলে বুক চিরিয়া দেখাইতাম—সে আমাকে কি ভালই বাসিত—সর্ব্বেশ্বর বাবুই ত গোপেশ্বরের মরণের কারণ হোলেন, তিনি যদি তাহার বিষয় আশয় নিজের হাতে না লইতেন, তাহা হইলে সে ত আমার কাছে আসিতে পাইত। আমি তাহাকে আসিতে দিলে

সে অমন করে খিড়কীর নিকট আসিত না, মারাও পড়িত না। সর্ব্বেশ্বর বাবুর এ পাপ রাখিবার স্থান থাকিবে না। বেচারার হাতে টাকা না থাকাতেই ত এই বিপত্তি ঘটিল।" এইরূপ আধ-খাতিরে দুঃখ করিতে করিতে কৌশল্যা রেবতীকে লইয়া খিড়কীর ঘাটে আসিল। রেবতী কৌশল্যার তর্কের যুক্তি শুনিয়া অবাক হইয়া রহিয়াছিল—কোন কথা না কহিয়া গোপেশ্বরের মৃত্যুর অকাট্য যুক্তি কৌশল্যার মুখ হইতে শুনিতে শুনিতে আসিতেছিল। ঘাটে আসিলে রেবতী কৌশল্যাকে বলিল—"দেখ আজ এই ঘাটে আসিতে আমার প্রাণে কেমন একটা ভয় হইতেছে!

কৌশল্যা—"গোপেশ্বরের মৃত্যুর কথা হইতেছিল তাই তোর মনে ঐ রকম একটা ত্রাসের ভাব হইতেছে ও কিছুই নয়—খানিক খাকে সব ভুলিয়া যাইবি", বলিতে বলিতে কৌশল্যা একবারে একগলা জলে গিয়া দাড়াইল। রেবতী আস্তে আস্তে নামিতে লাগিল রেবতী পুনর্ব্বার বলিল—"দেখ, রোজ এই ঘাটে আসিতেছি, কতবার আসিতেছি—কতবার জলে নামিতেছি কিন্তু আজ জলে নামিতে পা কাঁপিতেছে—এ রকম কেন হইতেছে?"

কৌশল্যা—হাঁসিয়া বলিল "তুই দিন দিন কচি খুকী হইতেছিস্ দেখিতেছি, তোর ভূতের ভয় আছে? আমি এখানে রহিয়াছি তোর কিসের ভয় না? কলসাটা নিয়ে শীগ্‌গির নেমে আয়।"

রেবতী কৌশল্যার কথায় কতকটা সাহস পাইল। ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া জলের মধ্যে কৌশল্যার পাশে গিয়া দাড়াইল। দুই জনে নিজ নিজ গাত্র রগড়াইতে লাগিল। রেবতী বড়ই অন্য মনস্ক কৌশল্যাও কি ভাবিতেছিল। কলসী জলের উপর অধোমুখে ভাসিতেছিল এবং জলের হিল্লোল-তাড়নে অল্পে অল্পে সরিয়া যাইতেছিল।

করিতে হইল, ত্রিপুরা সুন্দরী তাহা না বুঝিতে পারিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছেন। সংসারের এমনই নিয়ম যে যখন বিপদ আসে তখন চারিদিক দিয়া আসিতে থাকে। কুমুদনাথের মৃত্যু সেই সঙ্গে পূর্ব্ব-সুখের অবস্থার পরিবর্ত্তন ইহাই ত্রিপুরাসুন্দরীর পক্ষে এক প্রকার অসহনীয় রাজীবের মুখ দেখিয়া ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কোনরূপে আপন বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ আসিতে দেখা যায়। অকস্মাৎ রাজীবের লাঞ্ছনায় ত্রিপুরাসুন্দরী চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপদসাগর দেখিতে লাগিলেন। রাজীবকে চোর বলায় তিনি লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গিয়াছিলেন। লোকে কুমুদনাথের পুত্রকে চোর বলিবে এ ঘৃণা রাখিবার স্থান কোথায়? এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন।

গোবর্দ্ধন রাজীবের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিল না দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবুর সর্ব্বনাশে দৃঢ়সংকল্প হইল। গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বর বাবুর উপর বড়ই চটিয়াছিল, তাহার পরম শত্রু কুমুদনাথের পুত্রকে সাহায্য করায় সর্ব্বেশ্বর বাবুর উপর গোবর্দ্ধনের রাগের সীমা ছিল না। যে সর্ব্বেশ্বর বাবু হইতে তাহার জীবনের সমস্ত উন্নতি। অনাথ পথের ভিখারী নিরন্ন, কুমুদনাথের গলগ্রহ গোবর্দ্ধন,আজ যাঁহার কৃপায় মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া সমাদৃত, গোবর্দ্ধন আজ সেই সর্ব্বেশ্বর বাবুর সমস্ত দয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই সর্ব্বনাশে কৃত সংকল্প হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বরের নিকট সে কতদূর উপকৃত একবারও তাহার পাপ মনে স্থান পাইল না। রাজীব আর কর্ম্মে আসে না বাটীতেই থাকে, তবে তাহাকে কি প্রকারে জব্দ করা যাইতে পারে, ত্রিপুরা সুন্দরীর কিরূপে সর্ব্বনাশ করা যায় গোবর্দ্ধনের দিবা-রাত্রের

এই জল্পনা হইয়াছে। রাজীবকে জব্দ করিতে না পারায় তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগের উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদনাথের জীবিত কালে কুমুদনাথের সহিত গ্রামের মধুসূদন রায়ের বিশেষ প্রণয়াছিল. মধুসূদনের তেজারতী কারবার ছিল, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুমুদনাথ সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেন, আবার সময়ে পরিশোধ করিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন রায়ের নিকট কুমুদনাথ কিছু টাকা ধার লইয়াছিলেন। কুমুদনাথ সেই দেনা পরিশোধ না করিয়াই পরলোক গমন করেন। মধুসূদন সুদখোর লোক ছিলেন বটে কিন্তু এদিকে ততদূর মন্দ ছিলেন না। অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় তাঁহার ব্যবহার ততটা কঠিন ছিলনা। দুই এক টাকা সুদ ছাড়িয়া দিতে মরিয়া যাইতেন না। একদিন দেওয়ান জীর নিকট মধুসূদন রায় আসিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানজীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এবং একদিন দেওয়ানজীর সহিত কথায় কথায় কুমুদনাথের দেনার কথা উল্লেখ করেন। গোবর্দ্ধন কুমুদনাথের নিকট বিশেষরূপ উপকৃত থাকায় মধুসূদন রায় মনে করিয়াছিলেন যে দেনার কথা জানাইলে গোবর্দ্ধন হয়ত দেনাটা শোধ দিয়া দিবে অথবা তৎক্ষণাৎ অন্য কোনরূপ একটা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে। গোবর্দ্ধন কিন্তু ঐকথা শুনিয়া দ্বিরুক্তি করিল না অধিকন্তু তাঁহার নিকট হইতে কুমুদনাথের কোথায় কোথায় আরও দেনা আছে জানিয়া লইল। কুমুদনাথের অন্য অন্য মহাজনদিগের মধ্যে কেহ টাকার ডিক্রী করিয়াছে কি না তাহাও জানিয়া রাখিল। পরে গোবর্দ্ধন উক্ত ডিক্রীদারদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও ডিক্রীজারী করিতে অনুরোধ করিল। দেওয়ানজীকে অনেকেই ভয় করিত তাহাকে আবার আপন আপন টাকার কিনারা হইবে এই ভাবিয়া ডিক্রীজারী বিষয়ে কেহ

আপত্তি করিল না। যাহারা যাহারা ভাবিয়াছিল যে ডিক্রীজারী করিলে দেওয়ানজী রুষ্ট হইবেন তাহারা দেওয়ানজীর ডিক্রীজারী বিষয়ে মত আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেওয়ানজীর উত্তেজনায় একে একে সকলেই ডিক্রীজারী করিয়া কেহবা কুমুদনাথের ভদ্রাসন বাটী. কেহবা তাহার তৈজস-পত্র যাহা কিছু ছিল আদালতের নীলামে বিক্রয় করিয়া লইল।—সংসারের নিয়মই এই। কুমুদনাথ মৃত। তাঁহার নিকট আর কোনরূপ উপকার পাইবার আশা নাই - এদিকে গোবর্দ্ধন এক বড় জমীদারের দেওয়ান মহা প্রতাপশালী—সমাজ তাহারই পদানুসরণে পালায়িত, সকলেই কুমুদনাথের কথা পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছে. তবে আর কিসের উপরোধে কুমুদনাথের পরিবার সমাজের চক্ষে সহানুভূতি পাইবার আশা করিতে পারে? আমরা বলি কিছুতেই নয়। কাজেই কুমুদনাথের পরিবার ক্রমে ক্রমে সমস্ত হারাইতে বসিল। একজন মহাজন গোবর্দ্ধনের পরামর্শে যখন ত্রিপুরা সুন্দরী আহার করিতে বসিয়াছিলেন তখন তাঁহার ক্রোড় হইতে অন্নের পাত্র কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরা সুন্দরীর আহার হইল না। একদিন ত্রিপুরা-সুন্দরী রাজীব ও চারুবালাকে লইয়া আহারে বসিয়াছেন এমন সময় বাহিরে ঘন ঘন ঢোলের শব্দ শ্রুত হইল, কারণ অনুসন্ধানের জন্য ত্রিপুরাসুন্দরী চারুবালাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন. চারুবালা বাহিরে আসিয়া দেখে বিস্তর লোক জমা হইয়াছে, আদালতের লোক-জনও সেই সঙ্গে উপস্থিত। বস্তুতঃ নাজীর, পেয়াদা ঢুলি, সেই সঙ্গে মহাজন. মহাজনের লোক, গ্রামের লোকজন. স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিল।

চারু শুনিল একজন বলিতেছে "ছিঃ এমন সময়—বাড়ীর ভিতর যাওয়া উচিত নয় উহারা সকলে আহারে বসিয়াছে আহার শেষ হউক তবে উহাদিগকে বাটীর বাহির করিয়া দিইও।" আদালতের নাজীর,

পেয়াদা, তাহা শুনিল না। গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ রজত মুদ্রা হস্তগত হইয়াছিল, দয়া প্রদর্শন সে স্থলে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না, তাহারা বাটীর ভিতর চলিয়া গেল এবং ত্রিপুরা সুন্দরীকে পুত্র কন্যা লইয়া বাটীর বাহির হইতে বলিল। ত্রিপুরা সুন্দরী বাটীর ভিতর লোকজন আসিতে দেখিয়াই আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া ছিলেন একণে আদালতের লোকের ঐরূপ বজ্রসম বাক্য শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল চক্ষে জল আসিল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধনের অনুরোধ ছিল যে, ত্রিপুরাসুন্দরীকে আহারের সময় বাড়ী হইতে তাড়াইতে পারিলে দু-দশ টাকা বেশ বক্সিস্ পাইবে। সেই লোকে ত্রিপুরার ঐরূপ হৃদয় বিদারক অবস্থা দেখিয়াও নাজীর বাবুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। কাতরোক্তি বিফল হওয়ায় ত্রিপুরা সুন্দরী অগত্যা পুত্র কন্যা সমভিব্যবহারে বাটীর বাহিরে আসিলেন। তৈজস-পত্রাদি পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, যাহা কিছু ছিল সেই গুলি লইয়া কন্যা পুত্রের হাত ধরিয়া ত্রিপুরা সুন্দরী অকুল পাথারে ঝাঁপ দিলেন। নাজীর মহাশয় কুমুদনাথের বাটী ডিক্রীদারকে দখল দিয়া চলিয়া গেলেন। গ্রামের কাহার বা আনন্দ কাহার বা দুঃখ হইল কেহ কেহবা আইনের নিন্দা করিল। কিন্তু ত্রিপুরা সুন্দরীর দুঃখে সংসার যাত্রা কাহারও বন্ধ হইল না, আহার নিদ্রা সকলেরই সমভাবে চলিতে লাগিল। আজ কুমুদনাথ জীবিত থাকিলে অন্য পরিবারের ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিলে নিজের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, হয়ত তিনি সেই পরিবারকে বাসচ্যুত হইতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার পরোপকারের ফল বড়ই বিষম হইয়া [illegible] এদিকে গোবর্দ্ধন যখন কুমুদ [illegible] বাটী দখল করিবার [illegible] ত্রিপুরা

সুন্দরী পুত্র কন্যা লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত কথা শুনিল তখন সে হর্ষভরে বলিয়া উঠিল "এতদিনে জানিলাম ভগবান আছেন, পাপের ফল ভুগিতেই হইবে, তাহাতে দুঃখ করিলে কি হইবে? ভগবান্! তুমি সত্য আমার একটা চক্ষু জোর করিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়ায় জন্মের মত আমাকে একচক্ষু হইয়া থাকিতে হইয়াছে। আমাকে লোকে কাণা গোবর্দ্ধন বলিয়া উপহাস করে 'ভগবান্! তুমি ইহার বিচার সূক্ষ্মই করিয়াছ। আমি তোমার বিচারে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছি।" গোবর্দ্ধনের সংকল্প সিদ্ধ হইল ত্রিপুরা সুন্দরী আজ গাছতলায়।

সর্ব্বেশ্বর বাবুর অতিথিশালায় আজ লোক ধরে না এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী সকলের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় বলিয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসীর প্রশস্ত ললাট, প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল নয়ন, সুগৌর দীর্ঘ দেহ—দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসীর মুখে সদানন্দের চিহ্ন, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, মস্তকে জটা, মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, পরিধানে কৌপীন, অঙ্গে বহির্ব্বাস, হস্তে কমণ্ডলু, কথায় অমৃত ঢালিয়া দিতেছিল, কত লোক কত প্রশ্ন করিতেছিল, সন্ন্যাসীর মুখে বিরক্তির লেশ মাত্র নাই। পাড়ার অনেক লোক জমিয়াছে। ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, সন্ন্যাসী নানা প্রকার রোগের ঔষধ জানেন, অকাতরে ঝুলি হইতে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন, কাহাকেও বা ঔষধ সংগ্রহ করিয়া লইতে বলিয়া দিতেছেন। কাহারও মস্তকে হস্তার্পণ করিয়াই রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন যেই আসিতেছে সন্ন্যাসী-চরণে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া একে একে পার্শ্বে দাঁড়াইতেছে। সন্ন্যাসী সকলকেই হাস্যমুখে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বেলা ৪টা

থাকিয়াছে, সর্ব্বেশ্বর বাবু সন্ন্যাসীর আগমনের কথা শুনিয়া সস্ত্রীক সন্ন্যাসীর অভ্যর্থনার জন্য অতিথিশালায় আসিলেন। লোকজন সকলে সরিয়া গেল, সর্ব্বেশ্বর বাবু সন্ন্যাসীকে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া সস্ত্রীক সন্ন্যাসীর পাদ গ্রহণ করিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা সন্ন্যাসীর পাদমূলে নিরাসনে ভূমিতলে বসিলেন। সন্ন্যাসী ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি এদেশের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, এক্ষণে কামাখ্যা-দেবী দর্শন করিতে কামরূপে যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়াছি। পথে বিশ্রাম করিবার জন্য আপনার অতিথিশালায় আসিয়াছি। আপনার অতিথিশালার বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়াছি.' অনেক স্থলে এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত নাই। আপনার গুণকাহিনী বহুদূর হইতে শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি। আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম।"

সর্ব্বে—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, ভগবন্! আপনি যে আমার অতিথিশালায় পদার্পণ করিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। মহাশয়কে দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে আপনি একজন মহাপুরুষ। মহাপুরুষ দর্শনে অদ্য আমরা উভয়েই কৃতার্থ হইলাম।"

সন্ন্যা—"আপনার গুণাবলী যেরূপ শুনিয়াছিলাম অদ্য প্রত্যক্ষ তাহাই দেখিলাম, আপনার ন্যায় ধনী ব্যক্তির নম্রতা বড়ই সুমধুর। আমি ঈশ্বরের স্থানে সর্ব্বদাই আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।"

সর্ব্বে—"মহাশয়ের অনুগ্রহ। মহাশয় কি দুই এক দিন এস্থানে থাকিয়া আমাদের সকলকে অনুগৃহীত করিবেন?"

সন্ন্যা—"আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত

চইতাম কিন্তু আমাকে অদ্যই এস্থান হইতে যাইতে হইবে আমাকে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে আষাঢ় মাসের মধ্যে গমন করিতে হইবে, সেইজন্য আমার এক স্থানে অধিক দিন থাকিবার উপায় নাই। মনে কর এই দীর্ঘ পথ আমাকে পদব্রজে যাইতে হইবে। তাহাতে আমি একাকী।”

সর্ব্বে—“প্রত্যাগমনের সময় ভগবানের চরণ দর্শনের প্রত্যাশা করি” এই কথায় সন্ন্যাসীর মুখ যেন কি এক প্রকার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, সুন্দর মুখকান্তি যেন ম্লান হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন—“আমার প্রত্যাগমনে কিছু বিলম্ব হইবে—কিন্তু” এই বলিয়া সন্ন্যাসী মৌন হইয়া রহিলেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবু সন্ন্যাসীর কথার শেষ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—“আপনি একজন মহাধার্ম্মিক পুরুষ, গৃহাশ্রমে ধর্ম্মচর্চ্চার অনেক অন্তরায়। আপনি সে সমস্ত অন্তরায় অগ্রাহ্য পূর্ব্বক স্বার্থের কলুষময় পথ দূরে রাখিয়া ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতেছেন। আপনার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী মহা ভাগ্যবান, আপনার ন্যায় গৃহস্থ জগতে বিরল।”

সর্ব্বেশ্বর বাবু বুঝিলেন সন্ন্যাসী যাহা পূর্ব্বে বলিতে চাহিতেছিলেন তাহা না বলিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সর্ব্বে। “মহাশয় আপনি আমার অযথা প্রশংসা করিতেছেন। আমি কোনরূপ সুখ্যাতিরই অধিকারী নহি, এক্ষণে অনুমতি করেন ত কোন কথা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি।”

সন্ন্যা—“আমি আপনার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি আপনি

সকল বিষয়ে ভাগ্যবান আপনার কিছুরই অভাব নাই, আপনি কুবেরের সদৃশ ধনবান, কর্ণ-সদৃশ দানশীল, পরোপকার আপনার জীবনের লক্ষ্যস্থল, সৌভাগ্য বশে আপনি মনোমত পত্নী লাভ করিয়াছেন। আপনার মনে বিশেষ কোন বিষয়ে লালসা নাই, সংসার আশ্রমে থাকিয়া আপনার ন্যায় বীতস্পৃহ ব্যক্তি অতি দুর্লভ এক্ষণে আপনি আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবু সন্ন্যাসীর প্রগাঢ় জ্ঞানের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন "আপনি আমাকে আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে চাহেন। আপনাকে আমি পূর্ব্বে সেই কথা বলিতেছিলাম, কিন্তু কারণ বশতঃ সমস্ত বলিতে পারি নাই। পাছে আপনার মন ক্ষুণ্ণ হয় সেই জন্য আমি বলিতে নিরস্ত হইয়াছিলাম।"

সর্ব্বে। "ভগবানের মনে যাহা আছে তাহা হইবে। এ বিষয়ে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে নিয়তির অধীন, নিয়তি দুরতিক্রম্য। আপনি বলুন, যদিও অপ্রিয় হয় তথাপি শুনিলে আমার মনে কোন ক্লেশ হইবে না।"

তখন জলদ গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন—"অপ্রিয় হইলে সত্যও বলিবে না ইহাই ঋষিবাক্য। আমি অন্য কেহ দুর্ব্বল চিত্ত লোকের নিকট তাহার মৃত্যুকথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতাম, কিন্তু আপনি মহা ধার্ম্মিক পুরুষ, আপনার হৃদয়ের বল অধিক, এই জন্য আপনার সমক্ষে আপনার মৃত্যু বিষয়ক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি। আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিলে, ভোগ-সুখপ্রিয় সাধারণ লোকের হৃদয় ভয়ে অবসন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যুকে সন্নিহিত দেখিয়া সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। ইহকালের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতেছে দেখিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম

সকল সত্বরে সম্পাদন করিয়া লন। যদি কিছু বিলম্বে সম্পন্ন করিবেন বলিয়া রাখিয়া দিয়া থাকেন ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যুকাল সমুপস্থিত দর্শনে সেই সমস্ত বিষয় সম্পাদনে সত্বর হইয়া থাকেন। মৃত্যুকাল নিকটস্থ জানিতে না পারিলে হয়ত ইহ-জীবনে সে সমস্ত কর্ম্ম অসম্পাদিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এই জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে আপনার মৃত্যু অকালে ঘটিবে এবং সেই অকাল-মৃত্যু আপনার কোন এক অধীনস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে সংঘটিত হইবে। আপনাকে এই অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইবার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।" সন্ন্যাসীর বাক্যে সর্ব্বেশ্বর বাবু অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না কিন্তু এমন কে কর্ম্মচারী আছে যে তাহা হইতে তাঁহার অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সহাস্য বদনে সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন, মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিতে পাইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু যেন কি একটা মহামূল্য বস্তু লাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অভিপ্রেত কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন ভাবিয়া মনে মনে বড়ই হৃষ্ট হইলেন। মৃত্যু সংবাদ না পাইলে হয়ত অনেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না ভাবিয়া মনে মনে সন্ন্যাসীকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার কিন্তু বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া—মনুষ্য জীবন যে নশ্বর ও ক্ষণকাল স্থায়ী সর্ব্বমঙ্গলাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার মন কিন্তু কিছুতেই আশ্বস্ত হইল না। সন্ন্যাসী বলিলেন পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে আমরা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, ইহাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের কতগুলি কর্ম্মের ফল অনিবার্য্য তাহা ইহজন্মের পুরুষকার দ্বারা নিবারণ

করা যায় না। আবার আর কতগুলি কর্ম্মের ফলের নিবারণ আমাদের সাধ্যায়ত্ত। পুরুষকার দ্বারা আমরা সেই সেই কর্ম্মের ফলের অন্যথা করিতে পারি। প্রিয়-বিয়োগ-জনিত দুঃখ আমাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি আমরা ঔষধাদির দ্বারা আমাদের প্রিয়জনের রোগ-নিবারণের চেষ্টা করি। কতক স্থলে ঔষধে রোগ নিবারণ হয় না—প্রিয়জন-বিয়োগ-জনিত দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার আমরা আর কতক স্থলে সেই রোগ নিবারণে সক্ষম হই এবং আমাদের প্রিয়জনকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি। উভয় স্থলেই আমরা ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকি। যেখানে কর্ম্মফল অনিবার্য্য সেইখানে রোগ নিবারণ হয় না, আর অন্য স্থলে পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম-ফলের অন্যথা হইতে দেখিতে পাই। হয় ত আমরা ঔষধ প্রয়োগ না করিলে দুই স্থলেই আমাদের প্রিয় বিয়োগ-জনিত দুঃখ-ভোগ করিতে হইত। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল-নিবন্ধন আপনার অকাল-মৃত্যু অনিবার্য্য। পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি যে আপনাকে এই অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইবার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি দানে হরিশ্চন্দ্র, ক্ষমায় যুধিষ্ঠির, সহ্যগুণে সর্ব্বংসহা সদৃশ। আপনি পূর্ব্ব-জন্মে অনেক সুকৃতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে একটা এমন দুষ্কৃতি আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাহার ফলে আপনাকে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার ফল অকাল-মৃত্যু। আপনি মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।”

আপন বাক্যে সর্ব্বমঙ্গলাকে সন্তপ্ত দেখিয়া সন্ন্যাসী সর্ব্বেশ্বরবাবুকে বলিলেন—“তবে সর্ব্বেশ্বরবাবু আপনি সৎ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ হোমাদি দ্বারা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা

করুন। দেবতা প্রসন্ন হইলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারা যায়। অন্ততঃ দেবার্চ্চনায় পুণ্য সঞ্চয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলা সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার মন বড়ই বিষণ্ণ হইয়া রহিল। তবে সর্ব্বেশ্বরবাবুর অকাল-মৃত্যু কবে ঘটিবে কত-বৎসর পরে ঘটিবে তাহা সন্ন্যাসী প্রকাশ না করায় সর্ব্বমঙ্গলা মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইতেছিলেন—তিনি ভাবিলেন—হয়ত সর্ব্বেশ্বরবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার নিজের মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাহা হইলে তাঁহাকে আর স্বামীর বিয়োগ-জনিত দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। সর্ব্ব-মঙ্গলা সাশ্রুনয়নে দেবতার নিকটে আপনার অচির মৃত্যু বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বেশ্বরবাবুর একমাত্র কন্যা প্রতিভা বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে পাত্রের অনুসন্ধানে দেশে দেশে লোক প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু ইচ্ছা মত পাত্র মিলিতেছিল না। সর্ব্বেশ্বরবাবুর ইচ্ছা একটি রূপবান দরিদ্র পাত্রে প্রতিভাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। পাত্রটী ঘর-জামাতা হইয়া থাকিবে ইহাই সর্ব্বেশ্বরবাবুর ইচ্ছা, কেন না তাঁহার অতুল সম্পত্তি একদিন সেই জামাতার হইবে এবং জামাতাকে কাজেই গৃহে রাখিয়া বিষয়-কার্য্য শিখাইতে হইবে। দরিদ্র না হইলে হয়ত জামাতা তাঁহার বাটীতে থাকিতে চাহিবে না। তিনি কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য জামাতার মুখাপেক্ষী কেন হইবেন? জামাতার অর্থ কন্যার প্রতিপালন জন্য কোনমতেই আবশ্যক হইবে না তাঁহার অতুল

বিষয়-সম্পত্তি কন্যার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ-পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অধিকন্তু জামতা ধনবান হইলে হয়ত প্রতিভাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে, তাহা তিনি প্রাণ থাকিতে করিতে পারিবেন না। প্রতিভাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে হইলে সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলা প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইবেন। এই সমস্ত কারণে সর্ব্বেশ্বরবাবু দরিদ্র সদ্‌কুলোদ্ভব অথচ রূপবান্ একটী পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। নানাস্থান হইতে পাত্রের সন্ধান আসিতে লাগিল কিন্তু কোন পাত্রই প্রতিভার পিতা মাতার মনোনীত হইল না। যদি বা কোন পাত্র পিতার মনোনীত হয় মাতার মনে ধরে না। মাতার মনোমত হইলে পিতার মনোমত হয় না। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল প্রতিভার যোগ্য পাত্রের সন্ধান হইল না। অথচ সন্ন্যাসীর বাক্য সত্য হইলে প্রতিভার বিবাহ অতি শীঘ্র দেওয়া কর্ত্তব্য।

একদিন সর্ব্বেশ্বরবাবু সর্ব্বমঙ্গলাকে বলিলেন—"দেখ, কোন পাত্রই ত মনোমত হইতেছে না। আমি কবে আছি কবে নাই। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন অথচ রূপবান্ পাত্র পাওয়া বড়ই দুষ্কর।"

সর্ব্বমঙ্গলা। "কুৎসিত বরে প্রতিভার বিবাহ কখন দেওয়া হইবে না। এত বিলম্ব হইয়াছে না হয় আরও কিছু বিলম্ব হইবে। হরিশ-পুরের পাত্রটি সকল প্রকারে ভাল,দেখিতে সুন্দর,বয়স অল্প. কুলে শীলে সর্ব্ব বিষয়ে ভাল তাতে তুমি যে কেন অমত করিতেছ আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সর্ব্বেশ্বর। "পাত্রের পিতামহ টাকার লোভে মেয়ে বেচেছিল, সে ঘরে আমি মেয়ের বিবাহ দিব না। সে ঘরের ছেলের মেজাজ বড়ই ছোট হবে এবং সমাজেও আমাকে নিন্দনীয় হতে হবে।"

সর্ব্বমঙ্গলা। "তাইত প্রতিভার বিবাহ বা না হয়।"

সর্ব্বেশ্বর। দেখ কুমুদনাথের ছেলের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিলে কেমন হয়?

সর্ব্বমঙ্গলা। রাজীবের সঙ্গে?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ।

সর্ব্বমঙ্গলা। "মন্দ নয়। ছেলেটী দেখিতে যেন কার্ত্তিক, আর বেশ ভাল ঘর, ছেলের বাপ নাই এই যা, তবে ত্রিপুরাসুন্দরীর মত স্ত্রীলোক কলিকালে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

সর্ব্বেশ্বর। সেই ভাল। দেখ ঘরের কাছে পাত্র থাকিতে আমরা কত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

সর্ব্বমঙ্গলা। "ত্রিপুরা সুন্দরী ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পাইতে-ছিল, এখন কেমন আছে? অনেক দিন ত তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, লওয়াও হয় নাই।"

সর্ব্বেশ্বর। "গোপেশ্বরের মৃত্যু প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহাদের কোন সংবাদ লওয়া হয় নাই। মাসে মাসে কিন্তু তাহা-দিগকে আমি ২০৲ টাকা মাসহারা দিবার জন্য দেওয়ানজীকে বলিয়া দিয়াছি।"

সর্ব্বমঙ্গলা। "দেওয়ানজী যেন মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে বিলম্ব না করে তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই।"

সর্ব্বেশ্বর। "সেটা আমি দেখিব।"

সর্ব্বমঙ্গলা। "তবে এখনই দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা কর।"

সর্ব্বেশ্বরবাবু গোবর্দ্ধনকে ডাকাইলেন। গোবর্দ্ধন বাটীর ভিতর আসিত সর্ব্বমঙ্গলা তাহার সহিত কথা কহিতেন। গোবর্দ্ধন আসিলে সর্ব্বেশ্বরবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ানজী! ত্রিপুরা-

সুন্দরীকে মাসে মাসে টাকা পাঠান হইতেছে ত'? টাকা পাঠাইবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছ ?"

গোবর্দ্ধন। "টাকা কোথায় পাঠাইব? তাহারা এখানে নাই।"

সর্ব্বেশ্বর। "কারণ?"

গোবর্দ্ধন। "মহাজনেরা তাহাদের ভদ্রাসন বাড়ী বেচিয়া লইয়াছে তাহারা এ গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছে।"

সর্ব্বেশ্বর। "কই এ কথা ত আমি শুনি নাই; কত টাকার জন্য ঘর বাড়ী বিক্রয় হইয়াছে? আমাকে এ কথা কেন বল নাই?"

গোবর্দ্ধন। "সেটা আমার মাথায় আসে নাই। প্রায় ২০০০৲ টাকা দেনা হইয়াছিল।"

সর্ব্বেশ্বর। "এই সামান্য টাকার জন্য কুমুদনাথের পরিবারকে বাসচ্যুত হইয়া গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে হইল? বড়ই আক্ষেপের বিষয়—কুমুদনাথ অপরের জন্যই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী কোথায় পুত্র কন্যা লইয়া গিয়াছেন তুমি তাহার সন্ধান যত শীঘ্র পার আমায় দিবে। না জানি তাঁহারা কত কষ্ট পাইতেছে।"

গোবর্দ্ধন, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

চিত্রগ্রাম ত্যাগ করিয়া পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে ত্রিপুরাসুন্দরী রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন কে আশ্রয় দিবে কোথায় যাইলে পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ঠিকানা হইবে ত্রিপুরা সুন্দরী এই সমস্ত দুর্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে চলচ্ছক্তিহীনা হইতেছিলেন; যিনি কখন বাটীর বাহিরে পদার্পণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, অদৃষ্টচক্রের নিষ্পেষণে আজ তিনি রাজপথে সর্ব্বজন-সমক্ষে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছেন, পুত্র কন্যারাও মাতার ম্লান মুখ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত—

তাহারা মাঝে মাঝে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছিল—"আমরা কোথায় যাইতেছি?"—মাতা তাহাতে কি উত্তর দিবেন? নিস্তব্ধে তাহাদিগকে লইয়া রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী গভীর চিন্তায় মগ্না—রাজীব জ্ঞানবান হইয়াছে সে আপনাদের দুরবস্থার বিষয় বেশ বুঝিতে পারিতেছে, চারুবালা—বালিকা, মাতা আছেন মাতা তাহাদের কোন না কোনরূপ উপায় করিবেন সে এই আশায় আশ্বস্ত হইতেছিল। ত্রিপুরা সুন্দরী লক্ষ্যশূন্য হৃদয়ে পুত্র কন্যা লইয়া যাইতেছেন। পথ-পর্য্যটনে, নানারূপ দুশ্চিন্তায়, তাঁহার দেহ মন অবসন্ন—কোথায় যাইবেন কিছুরই স্থিরতা নাই, তথাপি পথ ধরিয়া চলিতেছেন। কত লোক কত জন কতদিকে যাইতেছে কত লোক কত সুখের হাসি হাসিতে হাসিতে যাইতেছে, সকলেরই গন্তব্য স্থান আছে, লক্ষ্যের স্থিরতা আছে, কেবল ত্রিপুরা সুন্দরী এ জগতে একাকিনী আশা হীনা লক্ষ্যহীনা আশ্রয় বিহীনা ব্যাকুল হৃদয়ে পাগলিনীর ন্যায় পুত্র কন্যা লইয়া রাজপথ বাহিয়া যাইতে-ছিলেন। রাজীব পাছে আবার কোন বিপদে পড়ে এই ভয়ে ত্রিপুরা সুন্দরী সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ীতে যাইতে সাহসী হয়েন নাই। পথে যাইতে যাইতে চারুবালা বলিল 'মা আমরা কোথায় যাইতেছি আমি ত আর চলিতে পারি না।' চারু স্নেহে যত্নে আদরে প্রতিপালিত কবে আর হাটিবার কষ্ট পাইয়াছে? সে এক্ষণে পথ হাটিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। ত্রিপুরা সুন্দরী চারুর কথায় কি উত্তর দিবেন? কোথায় যাইতেছেন বলিবেন? তাঁহার চক্ষে জল আসিল, চারু আর কোন কথা কহিল না। ক্রমশঃ রাত্রি গাঢ় হইয়া আসিতেলাগিল। কত লোকের সহিত ত্রিপুরার সাক্ষাৎ হইল, কত লোক ত্রিপুরার সেই অবস্থা দেখিল এ সংসারে কে কাহার সংবাদ রাখে? বিশেষ দুঃখীর উপর

কয়জন লক্ষ্য করে? সকলেই আপন কার্য্যে ব্যস্ত আপন আপন চিন্তায় মগ্ন। কেহই ত্রিপুরা বা তাঁহার পুত্র কন্যার বিষয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

ত্রিপুরাসুন্দরী, কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সন্মুখে বিস্তীর্ণা তরঙ্গিণী; রাত্রির অন্ধকার-অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠন-বতী চিত্রানদী নিজ-পতি সাগরের উদ্দেশে দ্রুত-গমনে যাইতেছে। হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন চাপিয়া রাখিতে না পারায় কল-কল-নাদে বহিয়া চলিতেছে আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই; নিজ-লক্ষ্য স্থির করিয়া,—অন্ধকার ভেদ করিয়া, সে একদিকে সাগরের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। ত্রিপুরা আর কোথায় যাইবেন? ইচ্ছা—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমন করেন। যেখানে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, এমন স্থানে চলিয়া যান কিন্তু চিত্রা তাঁহার গতির বিরোধিনী হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সেই নদী-তীরে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ইচ্ছা—চিত্রার ন্যায় নিজ-পতি কুমুদনাথের অনুসরণ করেন। চিত্রার জলে ঝাঁপ দিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা দূর করেন। কিন্তু স্নেহের পুতুলী পুত্র কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া ত্রিপুরাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। তখন তিনি রাজীব ও চারুকে এক বৃক্ষতলে বসিতে বলিয়া নিজে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অঞ্জলি পূরিয়া সেই নদী জল পান করিতে লাগিলেন। এমন বস্ত্র ছিল না যে সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন। কাজেই এক বস্ত্রা ত্রিপুরা সুন্দরী সেই আর্দ্র বস্ত্রেই বৃক্ষ তলে পুত্রকন্যার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ত্রিপুরা সুন্দরী কোথায় যাইবেন কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় একজন নৌকার মাঝি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝির নাম ক্ষুদিরাম। সে

ত্রিপুরাসুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে,—পুত্র কন্যা লইয়া রাত্রিকালে নদীতীরে—বৃক্ষতলে, আর্দ্র-বস্ত্রে। ত্রিপুরা সুন্দরীর অবস্থায় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া ত্রিপুরার সম্মুখে দাঁড়াইল। ত্রিপুরা মাঝিকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাছা তুমি কি চাও ?"

"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী. আপনারা কারা ?"

ত্রিপুরা। আমরা চিত্রগ্রামের কায়স্থেরা।

মাঝি। কোথায় যাবেন ?

ত্রিপুরা। বলিতে পারি না।

মাঝি। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা—আপনি কি বাড়ী হতে রাগ করে এসেছেন ?

ত্রিপুরা। না বাবু, আমাদের বাড়ীই নাই।

মাঝি ত্রিপুরার আকৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে ভদ্র ঘরের মেয়ে; ক্ষণে এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় বৃক্ষতলে রাত্রিকালে অল্প-বয়স্ক পুত্র-কন্যা লইয়া বসিয়া থাকা তাহার বিবেচনায় যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। সে ত্রিপুরাকে বলিল—"নিকটে আমার বাড়ী—সেখানে আমার পরিবার ছেলে পিলে আছে—চলুন আমার বাড়ীতে রাত্রে থাকিবেন; আপনারা এখানে থাকিলে অনেক বিপদ হইতে পারে।" মাঝির কথায় ত্রিপুরা অগত্যা সম্মত হইলেন এবং মাঝির সঙ্গে তাহার বাড়ীতে যাইলেন। মাঝি-ক্ষুদিরামের বয়স প্রায় ষাট বৎসর, এখনও বেশ শরীরে শক্তি সামর্থ্য আছে। বাড়ীতে আসিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল। স্ত্রী বাহিরে আসিয়া দেখিল একজন পরমা-সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সঙ্গে আসিয়াছে—সে জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কারা ?"

মাঝি। এদিকে বাড়ীর মধ্যে লয়ে ভাল জায়গায় বসাও আমি কিছু দই চিড়ে আনিতে যাই।

ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে নিষেধ করিলেন।

মাঝি। তাও কি হয় মা ঠাকুরাণী! খুদিরাম থাকতে কি তার বাড়ীতে আপনারা উপবাস করে থাকবে?

ক্ষুদিরামের স্ত্রীও ঐ কথায় যোগ দিল এবং অতি যত্নে ত্রিপুরা-সুন্দরীকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। ক্ষুদিরাম বাজার হইতে ছেলে মেয়েদের জন্য দই চিড়া মুড়কী আনিয়া দিল, রাজীব ও চারু চিড়া মুড়কী দধি সংযোগে আহার করিল, ত্রিপুরা কিছুই খাইলেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ত্রিপুরাসুন্দরীকে মাঝির স্ত্রী ও মাঝি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। ত্রিপুরা আপনার পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন দেখিয়া মাঝির স্ত্রী আর বেশী কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী পরে ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে কি কোথাও অতিথিশালা আছে?

মাঝি। অতিথিশালা আমাদের জমীদার সর্ব্বেশ্বর বাবুর আছে।

ত্রিপুরা। সেত চিত্রগ্রাম—এগ্রামে কি অন্যস্থানে অতিথিশালা নাই?

ক্ষুদিরাম। এ গ্রামকেও চিত্রগ্রাম বলে, চিত্রগ্রাম অনেক বড় গ্রাম। অতিথিশালা এগ্রামে আর নাই, ওপারে রামনগরে অতিথি-শালা আছে—রাজার অতিথিশালা।

ত্রিপুরাসুন্দরী তৎপর দিন প্রাতে রামনগরে যাইবেন মনে মনে স্থির করিলেন। মাঝি ত্রিপুরাসুন্দরী ও তাঁহার পুত্র-কন্যার জন্য একটী পরিষ্কার বিছানা করিয়া দিল, ত্রিপুরা পুত্র-কন্যা লইয়া সেই বিছানায় শয়ন করিলেন। তিনজনে শয়ন করিয়া আছে এমন সময়

চারুবালা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আমরা আর বাড়ীতে যাইব না?"

ত্রিপুরা। না মা, সে বাড়ী আর একজনের হয়েছে—সে কিনে নিয়েছে।

রাজীব। তবে আমরা কোথায় থাকিব মা?

ত্রিপুরা। ভগবান যেখানে রাখিবেন।

চারু। ভগবান কে মা? তিনি আমাদের জন্য কি একটা বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিবেন?

ত্রিপুরা। ভগবান নারায়ণ, যার কথায় দিন রাত হইতেছে, তিনিই আমাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তা।

রাজীব চারুকে চুপ করিতে বলিল। চারু চুপ করিয়া রহিল, চারু ও রাজীব দুইজনে পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ত্রিপুরা ভগবানকে অনেক ডাকিলেন। বলিলেন "দেব! জ্ঞানেও কখন কোন পাপ করি নাই,তবে এ যন্ত্রণা কেন দিতেছ দেব? দুধের ছেলে রাজীব, দুধের মেয়ে চারু ওরাত তোমার চরণে কোন অপরাধ করে নাই, ওদের এত কষ্ট কেন নারায়ণ! তা তোমার দোষ কি দিব? পূর্ব্ব-জন্মে কত মহাপাপ করেছিলাম তাই এই জন্মে দেবতার মত অমন স্বামী হারালেম, বাড়ী-ঘর-দোর সকল খোয়ালেম—পথের ভিখারিণী হলেম; নারায়ণ, সকল অপরাধ দাসীর মার্জ্জনা করুন।" এইরূপে ত্রিপুরা ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। মাঝি ও মাঝির স্ত্রী ও তাহার পুত্র-কন্যা সকলের মঙ্গলের জন্য নারায়ণকে বার বার ডাকিলেন।

অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইতে হইল। ত্রিপুরার চক্ষে নিদ্রার লেশ মাত্র উদয় হইল না। অপার ভাবনা, সম্মুখে বিশাল তরঙ্গিনী

পশ্চাতে নির্ম্মম সংসার—কোথায় যাইবেন ? চিত্রগ্রাম ফিরিয়া গিয়া কি করিবেন ?

এককালে যেখানে কত সুখে কত সম্মানে কালযাপন করিয়াছেন, এক্ষণে দুঃখের সময় সেই স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। ত্রিপুরাসুন্দরী মনে মনে সংকল্প করিলেন—চিত্রগ্রামে আর যাওয়া হইবে না: সম্মুখে গভীর জলরাশি—ইচ্ছা উহার মধ্যেই চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হন যে জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে ভেদ করিতেছিল—সে জ্বালা নিমিষের মধ্যে জুড়াইতে পারেন, কিন্তু সে পথের কণ্টক রাজীব, সে পথের অন্তরায় চারুবালা—তাহাদের কার কাছে রাখিয়া যাইবেন ? আর তাহাদের কে আছে ? এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মাতা ভিন্ন রাজীব ও চারুবালার আর কে আছে ? তবে কিরূপে মরিতে পারা যায় ? পিতার বিয়োগে তাহারা মাতার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। মাতার বিয়োগে কি তাহারা আর বাঁচিবে ? তাহাতে আত্ম-হত্যা মহাপাপ, পুণ্যশীলা ত্রিপুরাসুন্দরী আত্মহত্যা করিতে একেবারেই অক্ষম, চিত্রার সুশীতল ক্রোড়ে ত্রিপুরার শয়ন করা হইল না।

ক্রমশঃ রজনী গভীর হইয়া আসিল—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—চিত্রার কল কল ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। রাজীব ও চারুবালা মাতার আশ্রয়ে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। ত্রিপুরা, রাত্রি আর কত আছে দেখিবার জন্য একবার ঘরের বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে আকাশের কোলে মেঘ দেখা দিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যে কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ দেখা দিল—মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। ত্রিপুরা ঘরের ভিতর আসিলেন, আসিয়া পুত্র-কন্যাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইলেন। ক্রমে বৃষ্টি আসিল, বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধি হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উঠিল, চিত্রার

কলকল-ধ্বনি বাড়িতে লাগিল, বাতাস ক্রমে জোরে বহিতে আরম্ভ করিল, চিত্রার কল্লোচ্ছ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল, মাঝির ঘর ঝড়ে দুলিতে লাগিল, চাল ভেদ করিয়া প্রথমে টোপে টোপে, পরে ঘরের সর্ব্বস্থান হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দরিদ্রের ঘর অনেক দিন সংস্কার হয় নাই। রাজীব ও চারুবালার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহারা ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক করিয়া সরিয়া বসিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমশঃ ঘরের সর্বস্থান হইতে বৃষ্টি-ধারা তাহাদের অনাবৃত দেহের উপর পড়িতে লাগিল। বাহিরে অনর্গল বৃষ্টি পড়িতেছে, হুহু শব্দে বাতাস বহিতেছে, বিদ্যুৎস্ফুরণে চতুর্দ্দিক ঝলসিত হইতেছে, বজ্রনিনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ঘরের ভিতরে বৃষ্টি অবিরল-ধারায় পড়িতেছে, অসংস্কৃত পর্ণকুটীর প্রবল বায়ু-তাড়নে দুলিতেছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বিষম বিপদেই পড়িলেন, ঘন ঘন ক্ষুদি-রামকে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। ক্ষুদি-রামের গোয়াল ঘর বায়ুবেগে ভূমিসাৎ হইল। গরুগুলি দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়া গেল। রাজীব ও চারুবালা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল, ত্রিপুরা নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, করযোড়ে বলিতে লাগিলেন— "প্রভু, এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন আমার রাজীব ও চারুবালা যেন ঘর চাপায় মারা না যায়।" চিত্রা-নদীর মূর্ত্তি তখন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, গৃহের উঠানের উপর চিত্রার জল ঘন ঘন আছড়াইয়া পড়ি-তেছে—ঘোর বিপদে কুমুদনাথের প্রাণাধিকা পত্নী—মূর্ত্তিমতী-গৃহলক্ষ্মী ত্রিপুরাসুন্দরী, বড় আদরের রাজীব, বড় সাধের কন্যা চারুবালা, আজ অপার দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত। উদ্ধারের লোক নাই। চারু বলিল "মা আর ত ভিজতে পারি না, আর কষ্ট সয় না।" ত্রিপুরা কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাজীব চারুর মাথার উপর আপনার বস্ত্রের

কতকাংশ ধরিয়া নিজে ভিজিতে লাগিল। এইরূপ মহাবিপদে রজনী কাটিল। ঝড়-বৃষ্টি থামিল। চিত্রা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল বিদ্যুৎ আকাশের কোণে লুকাইল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রধ্বনি নিস্তব্ধ হইল। প্রকৃতিদেবীর অশান্ত-মূর্ত্তি শান্তভাব ধারণ করিল। ক্ষুদিরাম উঠিয়া আসিল এবং ত্রিপুরার ও তাহার পুত্র-কন্যার দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইল। ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিদায় দিবার সময় বলিল—"মা আপনি আমাকে আপনার পুত্র বলিয়া জানিবেন। যখন কোন প্রয়োজন পড়িবে আপনি আমাকে ডাকিতে ভুলিবেন না।" ত্রিপুরাসুন্দরী আশীর্ব্বাদ করিয়া চিত্রা তীরে গমন করিলেন। ক্ষুদিরাম আপন নৌকায় ত্রিপুরা, রাজীব ও চারুকে সযত্নে তুলিয়া অপর পারে লইয়া গেল। পরে বাটিতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক আপনার গাভীর অন্বেষণে বাহির হইল। সারদা ও ক্ষুদিরাম কতদিন ত্রিপুরার কথা লইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছে তাহা বলা যায় না। ক্ষুদিরাম বলিত 'আমি ঠিক বলিতেছি ত্রিপুরাসুন্দরী বড় লোকের পরিবার—আমি ঢের ঢের লোককে পার করেছি কিন্তু এমন ভদ্রলোকের মেয়েকে পার করি নাই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী অপর পারে পঁহুছিয়া প্রথমে অতিথিশালার সন্ধান লইতে চেষ্টা করিলেন। একবার চিত্র-গ্রামের দিকে তাকাইলেন। চক্ষে জল আসিল, বিবাহ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কথা মনে পড়িল, বিবাহের পর কুমুদনাথের গৃহিণী হইয়া কত সুখে দিন-যাপন করিয়াছিলেন একে একে পূর্ব্বের সকল সুখের কথা মনে পড়িল. আর চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। সত্বরে চক্ষের জল মুছিয়া অতিথিশালায় যাইবার রাস্তা অনুসন্ধান করিলেন। অত প্রত্যুষে কোন লোকজন চিত্রা-নদীর তীরে না থাকায় ত্রিপুরাসুন্দরী নদীতীরে

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে একজন যুবক চুরুট খাইতে খাইতে সে স্থানে আসিল। যুবকের বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে, রাজীবের অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় হইবে, বর্ণ অতি কৃষ্ণ। মুখ অতি কদাকার, দন্তগুলি বড় কিন্তু দন্তগুলি বেশ শুভ্র, হাসিলে সব দাঁত বাহির হইয়া পড়ে, কেশ অতি যত্নের সহিত মধ্যভাগে দ্বিধা বিভক্ত, সোজা কথায় মাথার মাঝখানে টেরি কাটা, কাপড়-চোপড় ফিটফাট, হাতে একগাছি ছড়ি। যুবকটী খঞ্জ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নদী-তীরে ত্রিপুরার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চারু তাহার আকৃতি দেখিয়া মাতার পশ্চাদ্‌ভাগে সরিয়া গেল; কিন্তু যুবকটী চারুর মুখখানির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। অর্দ্ধ-বিকশিত স্থলপদ্ম-সদৃশ অতি সুন্দর কনক-চম্পক গৌর কমনীয় দেহ-যষ্টি আনিতম্ব-লম্বিত-অবেণী-বদ্ধ-আলুলায়িত কেশদাম, দ্বাদশ বর্ষীয়া চারু-বালার রূপ-রাশি দেখিয়া যুবকের নয়ন নিমেষ শূন্য হইয়া দাঁড়াইল। কতকক্ষণ পরে সে ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কোথায় যাইবেন?"

ত্রিপুরা অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"রামনগরের অতিথিশালায়।"

যুবক—অতিথিশালায়? সে ত আমার জিম্মায়, আমি ত সেখানকার কর্ত্তা।

ত্রিপুরাসুন্দরী যুবকের ভাবগতিক দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিলেন, রাজীব অবাক হইয়া যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, যুবক চুরুট খাইতে লাগিল মধ্যে মধ্যে হাতের ছড়ি ঘুরাইতেছিল। ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে বলিলেন "বাছা, তুমি যদি আমাদের অতিথিশালায় লইয়া যাও"।

যুবক বলিল—"এখনই আমি যাব তবে অতিথিশালার দোর খোলা হবে। আমিই অতিথিশালার কর্ত্তা—আমিই সব হিসাব-পত্র রাখি আমি বাজার করি তবে বাজার হ'বে লোকজন খেতে পায়।"

যাইতে যাইতে ত্রিপুরাসুন্দরী যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন—যুবক বলিল "আমার নাম ভৈরবচন্দ্র দাস বসু জাতিতে কায়স্থ বাড়ী গণ্ডগ্রাম, আমার পিতার নাম বলিলে চিনিতে পারিবেন না তিনি অতি গরিব ছিলেন। আমার ভগিনীপতি চিত্রগ্রামের দেওয়ান, আমার দিদির সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে তাই দেওয়ানজী আমার ভগিনীপতি। আমার দিদি একজন পাকা সুন্দরী। আপনার এই মেয়েটা বড় হলে দিদির মত হবে।" ভৈরব এইরূপে আপনার পরিচয় দিতে দিতে অতিথিশালার দিকে যাইতেছিল।

ত্রিপুরা ভৈরবের কথা শুনিয়াই বুঝিলেন ভৈরব একটু আধ পাগলা, মনটা ভাল। ত্রিপুরা দেওয়ানজীর কথা শুনিয়া বলিলেন "দেওয়ানজীর নাম?"

ভৈরব হাসিল—হাসিয়া বলিল "দেওয়ানজীর নাম আপনি জানেন না? বড়ই তারিফের কথা। আমার ভগিনীপতিকে চেনে না এমন লোক কে আছে? তাঁহার নাম গোবর্দ্ধন ঘোষ লোকে কেউ কেউ তাকে কাণা গোবর্দ্ধন বলে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী গোবর্দ্ধনের নামে চমকিয়া উঠিলেন, ভৈরব তাহা দেখিতে পাইল দেখিতে পাইলেও বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, গোবর্দ্ধন চিত্রগ্রামে, এখানে তাহার শ্যালক, না জানি আবার কি বিপদ হয়। তখনি কিছু না বলিয়া অগত্যা ভৈরবের সঙ্গে অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হইলেন।

যাইতে যাইতে ভৈরব হাসিয়া ফেলিয়া বলিল শালারা আমাকে খোঁড়া ভৈরব বলে খেপায় তা আমি খেপি না।

রাজীব এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল ভৈরব ও রাজীব প্রায় সমবয়স্ক, ২।১ বৎসরের ছোট বড়, রাজীব ভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, হাতে একটা পুঁটুলি আছে। ভৈরব নিজে পুঁটুলিটি লইবার জন্য বলিল "তুমি আমাকে পুটুলিটা দাও না আমি খানিক নিয়ে যাই।"

রাজীব বলিল "থাক এ তত ভারি নয়।"

ভৈরব বলিল "ভারি হইলেই কি ভৈরব ডরায়. বাজারের মোট কতবার আমাকে মাথায় করিয়া আনিতে হয়। তারপর রাজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল—তোমার নাম কি ভাই?

রাজীব। আমার নাম রাজীব চন্দ্র মিত্র বাড়ী চিত্রগ্রাম।

ভৈরব। ও ভবেত ভাল দেওয়ানজীকে তবে তোমরা খুব চেন। দেওয়ানজী আমার ভগিনীপতি আমার ভগিনীর নাম কৌশল্যা আমার দিদিকে দেখেছ?

রাজীব না

ভৈরব। দেখলে বুঝতে পারতে সুন্দরী কাকে বলে। তোমার ভগিনী এই মেয়েটী ত?

রাজীব। হাঁ

ভৈরব। এ ত সুন্দরী কম নয় বড় হলে দিদির মত হতে পারে।

রাজীব চুপ করিয়া থাকিল ভৈরব নানা রকম অসম্বদ্ধ কথা কহিতে কহিতে অতিথিশালায় পৌঁছিল। ভৈরব রাস্তায় যাইবার সময় কেহ কেহ 'খোঁড়া ভৈরব খোঁড়া ভৈরব যাইতেছে' বলিয়া ভৈরবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল। ভৈরব সে কথায় কান দিল না। এক একবার চাকুর মুখেরদিকে তাকায় ও চুরুট টানে কখন বা

ছড়ি ঘুরায়। অতিথিশালায় পৌঁছিয়া ভৈরব লোহার চাবি আনিয়া সদর দরজা খুলিল তখনও অতিথিশালার লোক জন আসে নাই। ভৈরব ত্রিপুরা সুন্দরীকে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থানে লইয়া গেল। চারুবালা মাতার সঙ্গে রহিল। রাজীবকে বাহির দিকের একটা ঘরে বসিতে দিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতিথিশালাটী রামনগরে। রামনগর একটী সমৃদ্ধিশালী স্থান। রামনগরে রাজা আছেন। অতিথিশালা তাঁহারই। অতিথিশালার বন্দোবস্ত বেশ। রামনগরে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত. গাড়ী ঘোড়া রাস্তায় সর্ব্বদাই চলাচল করে। সহর জায়গা অনেক লোকের বাস, রাস্তার দুইধারে দোকানী পসারী, অনেক গাড়ী ঘোড়ার যাতায়াতে, লোকের জনতায় দিবা ভাগে রাস্তা চলা ভার।

অতিথিশালায় প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কতকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন পরে সকলকার আহারাদি শেষ হইয়াছে এমন সময়ে অতিথিশালার ম্যানেজার (কর্ম্মকর্ত্তা) হরিমোহন বাবু সেখানে আসিলেন। হরিমোহন জাতিতে ব্রাহ্মণ উপাধি বন্দোপাধ্যায়। হরিমোহন বাবুর অতিথিশালা সংলগ্ন নিজের থাকিবার বাসাবাটী। বাসাবাটীর স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়না। ইনি লোকজনের আহারাদীর তত্তাবধারণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করেন। ইনিই অতিথিশালার ষোল আনার কর্ত্তা। রাজা ইহাঁর হস্তে অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে টাকা কড়ি পাঠাইয়া দেন। ইনি কতক খরচ করেন কতক খরচ করেন না। নিজের সময় অসময়ের ব্যবহার জন্ম রাখিয়া দেন। হরিমোহন বাবুর বয়স ৩০ বৎসর হইবে। সম্প্রতি একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া হরিমোহন বাবুর স্ত্রী পরলোক গত হইয়াছেন। হরিমোহন বাবু আপন শিশু সন্তানটী লইয়া বড়ই বিব্রত। একজন স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আছেন। সদ্বংশজাতা স্ত্রীলোক

হইলেই ভাল হয়। ভৈরব যতদূর নির্ব্বোধ হউকনা কেন ত্রিপুরাসুন্দরীর অবস্থা বেশ বুঝিয়া ছিল যে ত্রিপুরাসুন্দরী বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছেন। সেই জন্য যদি হরিমোহন বাবুর সংসারে ত্রিপুরাসুন্দরী পুত্র কন্যা লইয়া বাস করেন ও হরিমোহন বাবুর শিশুসন্তানের লালন পালন করেন, সেই জন্য ভৈরব হরিমোহন বাবুকে সংবাদ দেয়. হরিমোহন বাবু এইরূপ একটী স্ত্রীলোক খুঁজিতে ছিলেন—ভৈরব তাহা জানিত। হরিমোহন বাবু সেইজন্য ত্রিপুরাসুন্দরীর আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। এরা তাঁহাকে আবার পরিচয় দিতে বলিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী রাজীবকে ডাকাইয়ালেন এবং আপনাদের পরিচয় দিতে বলিলেন। কুমুদনাথ বাবুকে সকলে চিনিত তাঁহার পুত্র কন্যা স্ত্রীর এরূপ দশা হইয়াছে দেখিয়া হরিমোহন বাবুর মনে দুঃখ হইল। তিনি তৎপরে আপনার মনোগত ইচ্ছা ত্রিপুরাসুন্দরীকে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন আপনি দয়া করিয়া আমার শিশু পুত্রটীর লালন পালনের ভার লউন। আমি আপনাদের যথারীতি প্রতিপালন করি... আপনার পুত্রেরও যাহাতে ভবিষ্যতে ভাল হয় তাহা করিতে স... রহিলাম। ত্রিপুরা অগত্যা সম্মত হইলেন, অতিথিশালা ছাড়াইয়া তি... এখন কোথায় যাইবেন ? পুত্র-কন্যাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিয়া-ছেন। হরিমোহন বাবুর কথায় সম্মত হইলেন। এবং হরিমোহনবাবুর শিশু-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

একজন মহাসম্ভ্রান্ত সর্ব্বজন পরিচিত সর্ব্বস্থানে সম্মানিত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির ধর্ম্মপত্নী হইয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে অতিথিশালায় দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। ভগবানের রাজ্যে সকলই সম্ভবে, অথবা আমাদের সুকৃতি দুঃষ্কৃতির ফল অনিবার্য্য। যাহাই হউক সংসারে এরূপ হৃদয়ভেদী দৃশ্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সংঘটিত হইতেছে।

কেন হয় কে বলিবে ? তুমি বলিবে—"কর্ম্মফল"—ত্রিপুরা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে প্রথমে কুমুদনাথের পত্নী হইয়া পরম সুখভোগ করেন, পরে অন্যরূপ কর্ম্মেরফলে আজ গৃহচ্যুতা পথের ভিখারিণী অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশাপন্না। কেহ কেহ বলিবেন যে কুমুদনাথের অবিমৃষ্যকারিতাই তাঁহার পরিবারের এই দুর্দ্দশার কারণ। কর্ম্মফল—কথাটী বড়ই দুজ্ঞেয়; কিন্তু অনেকেই কুমুদনাথের কার্য্য কলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; দেখিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে কুমুদনাথের দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা না থাকাই তাঁহার পরিবারের এই দুঃখের কারণ; তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা, নির্ব্বুদ্ধিতাই তাঁহার পরিবারের এই দুর্দ্দশার কারণ। এই ঘোর পাপের দিনে মানুষ কেন সদ্বৃত্তির অনুশীলন করে ? যদিও করে তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত কেন কার্য্য না করিয়া থাকে ? লোকে আরও বলিয়া থাকে যে এই মহাপাপের দিন সদ্বৃত্তির অনুশীলনে মনুষ্যকে যে পদে পদে বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। যদি তুমি সমস্ত শুনিয়া শুনিয়াও দয়া মায়া করিতে চাও, পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হইতে চাও, তোমার পরিবারবর্গকে তবে এইরূপ বিপদে ফেলিবেই জানিবে। যদি পরের দুঃখে তোমার চক্ষে জল আসে, পরের দুঃখে তোমার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়,হইয়া যদি তুমি তোমার যথা সর্ব্বস্ব পরহিতে ব্যয় করিতে চাও, এই অধঃপতিত সময়ে তোমার পরিবারবর্গ পরের গলগ্রহ হইবে। তাহা হইলে যে তোমার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অনেকেই ঐরূপ বলিয়া কুমুদনাথের কার্য্য গুলিকে নিন্দা করিবেন; কুমুদনাথ দয়া মায়া বদান্যতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সমূহকে জলাঞ্জলি দিয়া আজ যদি স্বার্থপরতাকে হৃদয়ের উচ্চস্থানে বসাইতে পারিতেন, নিজদ্বারদেশে দরিদ্রের কাতরোক্তি শ্রবণ করিতে করিতে অবিচলিত চিত্তে নিজের চব্য চষ্য লেহ্য পেয় আহার

অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আজ কুমুদনাথের পোষ্যবর্গকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না। সম্মুখে গৃহদাহে প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইতেছে তুমি জল সেচনের পরিবর্ত্তে যদি সেই অগ্নি সেবনে নিজের শীত ক্লিষ্ট দেহকে সুতপ্ত করিতে পার তাহা হইলে হয়ত তোমার পুত্র-কন্যাকে দারিদ্র্যের কঠোর নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হইতে হইবে না; অনেকেই এরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া কুমুদনাথের দাতৃত্বে দোষ দেখাইবেন ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আজ অতিথিশালায় দাসীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া বলিবেন—তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতাতে এ সমস্তই সংঘটিত হইয়াছে। যেমন কর্ম্ম সেরূপ ফল হইয়াছে, কে তাহার কি করিবে, ত্রিপুরা-সুন্দরীর কষ্টে হয়ত কেহ অনুমাত্র বিচলিত হইবে না; কিন্তু আমরা বলি—সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে সর্ব্বথা সুফল লাভেরই সম্ভাবনা। যদি কোথাও তাহার অন্যথা দেখা যায়, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকং" এঋষি-বাক্যের সম্মান রক্ষা করিয়া লোকের উপকারে প্রবৃত্ত থাকিবে।

রেবতীর মৃত্যুর পর কৌশল্যা সরস্বতী নামে আর একজন দাসীকে নিযুক্ত করে। সরস্বতীকে কৌশল্যা কখন কখন ভৈরবের সংবাদগ্রহণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিত। এবং ভৈরবকে দুই এক টাকাও দিয়া সময় সময় সাহায্য করিত। ত্রিপুরাসুন্দরী অতিথিশালার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একদিন সরস্বতী অতিথিশালায় ভৈরবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। সে ত্রিপুরার সমস্ত সংবাদ লইয়া গিয়া যথা সময়ে গোবর্দ্ধনকে জ্ঞাত করে। গোবর্দ্ধন শুনিয়াছিল যে ত্রিপুরাসুন্দরী চিত্রগ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু জানিত না তিনি কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। দাসীর মুখে ত্রিপুরাসুন্দরী

রামনগরে অতিথিশালায় বাস করিতেছেন শুনিয়া—দাসীকে সেকথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল এবং সর্ব্বেশ্বর বাবু গোবর্দ্ধনকে ত্রিপুরার সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিজেও সে বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবে অজ্ঞ বলিয়া ভান করে। একদিন সর্ব্বেশ্বর বাবু গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করেন—দেওয়ানজী তুমি কি ত্রিপুরার কোন সংবাদ পাইয়াছ? আজ্ঞে না, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সংবাদ পাই নাই।" "আমি শীঘ্রই তাঁহার সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। চতুর্দ্দিকে লোক নিযুক্ত কর তাহাতে যে ব্যয় হইবে তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না" "যে, আজ্ঞে" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন সর্ব্বেশ্বর বাবুকে সন্তুষ্ট করিল।

পরে সর্ব্বেশ্বর বাবু অন্যরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। "দেওয়ানজী, সেদিন প্রজাদের অভিযোগ তুমি শুনিয়াছ তাহার প্রতিকারের কি করিলে আমি শীঘ্রই নিজে সমস্ত দেখিতে যাইব।" "যে আজ্ঞা আমি প্রজাদের কষ্ট নিবারণের সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহাদের অভাব শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।"

সর্ব্বেশ্বর বাবু সমস্ত শুনিয়া গোবর্দ্ধনকে সকল কর্ম্মেই সত্বর মনসংযোগ করিতে আদেশ করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেওয়ানজী, তুমি যখন গোপেশ্বরকে গুলি কর তখন সে সেখানে কি করিতেছিল?"

পরে জানিতে পারি যে আমার বাড়ীর দাসীর সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার কথা মত সে সেস্থানে আসিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া সর্ব্বেশ্বরবাবু কতকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন,—"একথাটা আমার যেন বিশ্বাস হয় না।"

"আজ্ঞে কথাটা ঠিক", কৌশল্যা দেওয়ানজীকে ঐরূপ বুঝাইয়া-

ছিল, সেও ঐরূপ বুঝিয়াছিল। পুরুষ যতই বুদ্ধিমান ও চতুর হউক না কেন রমণী-বুদ্ধি চিরদিনই বিশ্ব-বিজয়িনী।

সর্ব্বেশ্বর। "তোমার দাসীর মৃত্যু ও ভয়ানক।"

গোবর্দ্ধন কোন উত্তর করিল না।

সর্ব্বেশ্বর। সে যাহা হউক তুমি শীঘ্রই ত্রিপুরাসুন্দরীর অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সংবাদ আমাকে আনিয়া দাও, এটী আমার বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া জানিবে। আর গোপেশ্বরের যে কোন সম্পত্তি যেখানে যেখানে বন্ধক আছে সমস্তই আমার টাকা দিয়া খোলসা করিবে, করিয়া গোপেশ্বরের স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিবে। হিসাব করিয়া কত টাকা হয় আমাকে জানাইবে।

গোবর্দ্ধন। যে আজ্ঞে।

সর্ব্বেশ্বর। গোপেশ্বর টাকাগুলো কিসে খরচ করিল। কাকে অত টাকা দিল? তোমার দাসীকে অত টাকা দিয়াছিল নাকি? তাহা হইলে সে কি তোমার বাড়ীতে দাসী-বৃত্তি করিত। তোমার স্ত্রী কতকটা ত জানিতে পারিত। যাহা হউক সন্ধান রাখ—ইহার ভিতর অনেক রহস্য আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

গোবর্দ্ধন—আমিও ঐটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। অত টাকা যদি আমার দাসীকে দিবে তাহা হইলে সে আমার দাসী-বৃত্তি করিতে থাকিবে কেন? টাকা ত কম নয়!

সর্ব্বেশ্বর—আমিও তাই বলি। তার হাতের আংটীটারই দাম এক হাজার টাকা, তার বিবাহের সময় আমি তাহাকে দিই। যাহা হউক গোপেশ্বরের সম্পত্তিগুলি উদ্ধার কর। হিসাব করিয়া কত টাকা হয় সব আমার তহবিল হইতে দাও।

গোবর্দ্ধন বলিল—যে আজ্ঞা।

গোবর্দ্ধনের নিজের ধনাগমের একটা সুযোগ আসিল দেখিয়া গোবর্দ্ধন বড় খুসী হইল। বলিল—"আমি যত শীঘ্র পারি গোপেশ্বর বাবুর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিব।"

সর্ব্বেশ্বর—আর ত্রিপুরার সংবাদ।

গোবর্দ্ধন—সেটাও শীঘ্র আনিয়া দিতেছি।

গোবর্দ্ধনের এ কথাটা সম্পূর্ণই মিথ্যা—যাহাতে সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরার সংবাদ না পান গোবর্দ্ধন সে চেষ্টা করিবে তাহাই মনে মনে করিতে ছিল।

এইরূপে সর্ব্বেশ্বর বাবু গোবর্দ্ধনের সহিত নানা বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিলেন।

মহানুভাব অকপট-হৃদয়, দেব-চরিত্র সর্ব্বেশ্বর বাবু স্বার্থপর, নীচান্তকরণ, ঘোর বিষয়ী দেওয়ানজীর সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং শীঘ্রই ত্রিপুরার সংবাদ পাইবেন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন।

গোবর্দ্ধন ত্রিপুরাসুন্দরীর যাহাতে রামনগর হইতে অন্য কোন দূরদেশে অপসারিত করিতে পারে তাহারই চেষ্টায় রহিল।

কিছুদিন পরে আর একদিন সর্ব্বেশ্বর বাবু ত্রিপুরাসুন্দরীর সংবাদ গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবর্দ্ধন তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই বলিয়া, সর্ব্বেশ্বর বাবুকে জানাইল। সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন—আমার ইচ্ছা একটী ভালঘরের সচ্চরিত্র পাত্রের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিই, ছেলেটী গরিবের ঘরের হওয়া চাই নতুবা প্রতিভাকে আমার বাটীতে রাখিতে চাহিবে না। আমার পুত্র কন্যা আর নাই প্রতিভাই আমার সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারি হইবে। জামাতার ধনের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ধনবান জামাতা হইলে আমার ঘরে বাস করিবে না, আমার ইচ্ছা—জামাতা

আমার ঘরেই থাকে আর বিষয় আশয় দেখা-শুনা করে। সমস্ত বিষয় পরে তাহাদেরই হইবে। জামাতাকে তোমার হাতে হাতে দিব, তুমি তাহাকে জমাদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শিখাইবে. ইহাতে তোমার মত কি ?

গোবর্দ্ধন। আপনার অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সঙ্গত।

সর্ব্বেশ্বর। তুমি তবে আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী-পাত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও. ত্রিপুরার সন্ধানেও ক্ষান্ত হইও না। আমি শীঘ্রই তাঁহার সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি।

গোবর্দ্ধন। "যে আজ্ঞা—আমি শীঘ্রই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিব।

গোবর্দ্ধন চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইল, তাহাদিগকে পাত্রের সন্ধান করিতে বলিল। সেই সঙ্গে ত্রিপুরারও সংবাদ লইতে আদেশ করিল। সর্বদিকেই লোক পাঠান হইল। কেবল রামনগরে লোক পাঠান স্থগিত রহিল। সে কর্ম্মভারটা গোবর্দ্ধন নিজের ঘাড়ে রাখিয়া দিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিভার বিবাহ সম্বন্ধে সর্ব্বেশ্বরের সহিত সর্ব্বমঙ্গলার পরামর্শের কথা পাঠকগণকে জানাইয়াছি। যখন চারিদিক হইতে লোক ফিরিয়া আসিতে লাগিল তখন তাঁহারা রাজীবের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিবেন একেবারেই সংকল্প করিলেন এবং চারিদিকে আপনার লোক পাঠাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনের উপর এত বড় একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। সর্ব্বেশ্বরবাবু গোবর্দ্ধনকে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ দেওয়ানজী প্রতিভার বিবাহ রাজীবের সহিত দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। রাজীবকে দেখিতে কার্ত্তিকের মত, কুমুদনাথের পুত্র সকল দিকেই যোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যতদূর জানা গিয়াছে চুরীর কথাটা সমস্তই মিথ্যা—ওটা কোন শত্রুর কাজ—আমার মতে রাজীব প্রতি-

তার যোগ্য পাত্র। তুমি প্রাণপণে তাহাদের সন্ধান লইতে চেষ্টা কর।

গোবর্দ্ধন রাজীবের সহিত প্রতিভার বিবাহ হইবে শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন গোবর্দ্ধনের সে ভাব দেখিতে পাইলেন না। যাহার সর্ব্বনাশের জন্য সে নিয়ত ব্যস্ত, যাহার সর্ব্বনাশের জন্য তাহার কৌশল-জাল সর্ব্বত্র বিস্তারিত, সেই রাজীবকে নিজ হস্তে সর্ব্বেশ্বরের বিশাল জমীদারীর অধিকারী করিয়া দিতে গোবর্দ্ধন অসমর্থ। তৎসঙ্গে তাহাকে রাজীবের অধীনে চাকরী করিতে হইবে। তাহা গোবর্দ্ধনের অসহ্য। গোবর্দ্ধন আপন পরমশত্রু কুমুদনাথের পুত্রকে স্বহস্তে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে পারিবে না। তাহার প্রাণের ভিতর শত বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা উপস্থিত হইল। অনেক কষ্টে সে আপন মনোভাব গোপন করিল। ইচ্ছা সেই স্থানে সর্ব্বেশ্বরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে এবং রাজীবের ভবিষ্যতের সকল সুখের পথ রোধ করিয়া দেয়। গোবর্দ্ধন প্রথমে অনেক আপত্তা তুলিল, সে আপত্য সর্ব্বেশ্বরের নিকট টেকিল না। পরে সে রাজীবের চরিত্রের উপর সন্দেহ জন্মাইতে চেষ্টা করিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু তাহাও হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে গোবর্দ্ধনের অন্নদাতা, জীবন দাতা কুমুদনাথের পুত্রের সুখে গোবর্দ্ধনের আপত্তি কেন। যাহা হউক সর্ব্বেশ্বরবাবু রাজীবের সন্ধানের ভার নিজের হস্তেই লইলেন এবং তাহাদিগকে নিজবাটীতে আনাইবার জন্য নিজেই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

হরিমোহন বাবুর অতিথিশালা হইতে ত্রিপুরাসুন্দরীকে সত্বরে সরাইয়া দিবার জন্য গোবর্দ্ধন বড়ই ব্যস্ত হইল। সে একদিন রাম-নগরে যাইয়া হরিমোহনবাবুর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিল এবং

নানা কথার পর রাজীব যে টাকা চুরী করিয়া ধরা পড়িয়াছিল সেই কথা উত্থাপন করিল। হরিমোহনবাবুর সহিত গোবৰ্দ্ধনের বিশেষ সখ্যতা ছিল। আজ গোবর্দ্ধনের সুপারিসে ভৈরব অতিথিশালায় কৰ্ম্ম পাইয়াছিল, হরিমোহনবাবুর দুই একটী আত্মীয়কে আবার গোবৰ্দ্ধন সৰ্ব্বেশ্বরবাবুর জমীদারীর মধ্যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। এক্ষণে আবশ্যক হওয়ায় গোবৰ্দ্ধন নিজেই হরিমোহনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং দুইজনে নির্জ্জনে ত্রিপুরাসুন্দরীর সর্ব্বনাশ সাধনোদ্দেশে পরামর্শ করিতে লাগিল।

হরি। এই বয়সেই এতদূর—আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে কুমুদনাথ বাবুর পুত্র হইয়া রাজীবের চুরী করিতে ইচ্ছা হইল।

গোবৰ্দ্ধন। অভাবে স্বভাব নষ্ট, অভাব হইতে সর্ব্বপ্রকার দোষের উৎপত্তি হইতে পারে; বোধ হয় ইহাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর শিক্ষা ছিল।

হরি। অসম্ভব কি?

গোবৰ্দ্ধন। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছিলাম—এখানে উহাদের জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। কোন দিন অতিথিশালার সর্ব্বনাশ করিবে আর আপনাকে দায়ে পড়িতে হইবে। যে কোন কারণে হউক উহাদিগকে আপনাকে দেশান্তরে পাঠাইতে হইবে।

হরি। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি এখন ত্রিপুরাসুন্দরীকে ছাড়াতে পারি না; তাহা হইলে আমার পুত্রটি মারা পড়িবে। ত্রিপুরাসুন্দরী ছেলেটীকে বেশ যত্নে রখিয়াছেন। বলেন ত আমি রাজীবকে দেশান্তর করি। রাজীব চলিয়া গেলে ত্রিপুরা একাকী অতিথিশালার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না।

গোবৰ্দ্ধন ত্রিপুরাসুন্দরীকে শুদ্ধ সরাইতে চায়—পাছে সর্ব্বেশ্বরবাবু

ত্রিপুরার সন্ধান পান। কিন্তু হরিমোহনবাবু ত্রিপুরাকে ছাড়িতে চাহেন না। অগত্যা রাজীবকে দেশান্তরে পাঠাইবার পরামর্শই স্থির হইল।

গোবর্দ্ধন। তা যদি ত্রিপুরাকে ছাড়ালে আপনার এতদূর অসুবিধাই হয়, তবে রাজীবকে আপনি শীঘ্রই সরাইবার চেষ্টা করুন।

হরি। বিদেশে আমার কোন লোকের সহিত আলাপ নাই। আপনি যেখানে স্থির করিবেন আমি সেই থানেই রাজীবকে পাঠাইতে সম্মত আছি।

এই কথায় গোবর্দ্ধন হরিমোহনবাবুর কাণে কাণে কি বলিল হরিমোহন বাবু বলিলেন—ভাল আজি তাহাই করিব।

গোবর্দ্ধন। দেখিবেন আমি যে ইহার মধ্যে আছি রাজীব বা ত্রিপুরাসুন্দরী ঘুণাক্ষরে না জানিতে পারে; তাহা হইলে সর্ব্বেশ্বরবাবু আমার উপর মহাক্রুদ্ধ হইবেন। আমার চাকরী রাখা দায় হইবে।

হরি। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সকল কার্য্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করিব।

গোবর্দ্ধন। তবে পাপনি এই টাকাগুলি এখন রাখুন। প্রয়োজন মতে আরো টাকা পাঠান যাইবে।

হরি। টাকা গুলি এখন আমার নিকট দিবার আবশ্যক? লোক মারফৎ আপনি পাঠাইয়া দিবেন।

গোবর্দ্ধন। না—আপনিই রাখুন প্রয়োজন মত খরচ করিবেন। আনিয়াছিলাম, আর কেন ফিরাইয়া লইয়া যাইব।

হরি। তবে দিন, আমিই রাখি। যাহা খরচ হয় আপনাকে পরে জানাইব। এক্ষণে আহারাদি কি এইখানেই হইবে?

গোবর্দ্ধন। না—সহরে আমাদের জমীদারের বাসা আছে সেই স্থানেই আহারাদি করিব। জমীদারী সংক্রান্ত দুই একটী কাজের জন্য আমাকে আদালতেও যাইতে হইবে।

হরি। মোকর্দ্দমা মামলা পড়িয়াছে নাকি?

গোবর্দ্ধন। না—জমীদারের হুকুম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয় আশয় যাহা যাগা বাঁধা পড়িয়াছে খোলসা করিয়া তাহার স্ত্রীর নামে দানপত্র রেজেষ্টারী করিতে হইবে, তজ্জন্য একবার রেজেষ্টারী আফিসে যাইতে হইবে।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধন হরিমোহনবাবুর হস্তে একটি নোটের তাড়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিমোহনবাবু বাসা বাড়ীতে গিয়া নোটের তাড়াটী বাক্সে রাখিলেন। দেখিলেন নোট সর্ব্বসমেত পাঁচশত টাকার। হরিমোহনবাবু নিজে কৃপণ স্বভাব ছিলেন। অতিথিশালা হইতে মাহিনা বাদে বেশ দশটাকা সঞ্চয় করিতে ছিলেন। পরের টাকা আত্মসাতে হরিমোহনবাবুর অভ্যাস জন্মিয়াছিল। এক্ষণে এত টাকার মধ্যে অধিকাংশ নিজস্ব হইতে পারিবে—এই ভাবিয়া হরিমোহনবাবুর আনন্দ-সুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। ত্রিপুরাসুন্দরী হরিমোহনবাবুর শিশু পুত্রকে তখন অতি যত্নে দুধ খাওয়াইতেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরার একমাত্র পুত্রকে নিরুদ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে হরিমোহনবাবু সচেষ্ট রহিয়াছিলেন এবং উপায় উদ্ভাবনে নিজ মস্তক আলোড়িত করিতেছিলেন। ধন্য সংসার! তোমার মহিমা বুঝা ভার।

অতিথিশালায় ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। দুঃখেই হউক আর সুখেই হউক সময় কাহার জন্য অপেক্ষা করে না, অতি দুঃখে কতকষ্টে ছয় মাস কাটিল। ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবিয়া

ত্রিপুরাসুন্দরী দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিলেন। রাজীবের ভবিষ্যতে কি উপায় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দিন দিন তাঁহার মনের উদ্বেগ বাড়িতেছিল। এদিকে চারুবালা দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীতা হইল। কুমুদনাথ কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ দিবেন না, চারু বড় হউক ধূমধামের সহিত বিবাহ দিব, এই কথা প্রায়ই বলিতেন, আমার একটী কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে যাইবে, যতদিন পারি ঘরে থাকুক—এই সমস্ত ভাবিয়া কুমুদনাথ চারুবালার বিবাহ সম্বন্ধে তত আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে ত্রিপুরা পথের কাঙ্গালিনী, তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়া বড়ই দুরূহ। গরিবের মেয়ে বিবাহ করিতে কেহই সম্মত নহে। কাজেই চারুবালার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইল, তথাপি বিবাহের নাম নাই। পেটে অন্ন যোটে না, কন্যার বিবাহ হয় কি প্রকারে। ত্রিপুরার ইহাও আর একটী মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারুবালা পরিণত যৌবনা ছিল, দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পীড়নে যদিও তাহার মুখ কান্তি মলিন লক্ষিত হইত, বসন অভাবে যদিও মলিন, ছিন্ন [illegible] বই আবৃত থাকিত, বিন্যাস-বিহীন কেশদাম সর্ব্বদা আলুথালু থাকিত, তথাপি দেখিলেই চকবালাকে সুন্দরীর অগ্রগণ্যা বলিয়া বোধ হইত। ত্রিপুরা মধ্যে মধ্যে চারুবালার বিবাহের বিষয় ভাবিতেন, বয়স্থা কন্যার কিরূপে সত্বরে বিবাহ সংঘটন হইবে সেই চিন্তায় [illegible] প্রায়ই অবসন্ন হইয়া থাকিত। ক্লেশের অবধি নাই, দুঃখের ইয়ত্তা ছিল না। কুমুদনাথের পরিণীতা হইয়া পরিচারিকা-বৃত্তি অবলম্বন [illegible] নিজের ও পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন কথঞ্চিৎরূপে নির্ব্বাহিত করিতে হইতেছে। রাজীবের ভবিষ্যতে কি হইবে, কি প্রকারে রাজীব নিজের ভরণ পোষণের উপায় করিবে, কতদিন বা এইরূপ

জঘন্য-বৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে—এই সমস্ত চিন্তায় ত্রিপুরার হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশনের-জ্বালা উপস্থিত হইত। তাঁহার উপর আবার কন্যার বিবাহ। ভদ্র পরিবারের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার আবশ্যক। কোথায় পাত্র, পাত্র থাকিলেই বা বিবাহের খরচ কি প্রকারে জুটিবে? এই সমস্ত ভাবনায় ত্রিপুরার দেহ দিন দিন অধিকতর শুষ্ক হইতে লাগিলেন। এমন কি হরিমোহনবাবুর শিশু-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্য সম্পাদনও ত্রিপুরার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। যদিও বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে নাই তথাপি এই বয়সেই ত্রিপুরাসুন্দরী দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া অকালে জরাগ্রস্ত হইতেছিলেন। সেই সুন্দর দেবী-মূর্ত্তি দিন দিন হতশ্রী হইয়া পড়িতেছিল। ত্রিপুরাসুন্দরীর দেহ শুষ্ক, বদন কালিমা-জড়িত, নয়নদ্বয় সম্পূর্ণরূপে আভাহীন হইয়া আসিতেছিল। অকাল-বার্দ্ধক্যে তাঁহার দেহের লাবণ্য একেবারেই তিরোহিত হইতেছিল।

হরিমোহনবাবুর মেজাজ তত ভাল ছিল না। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বভাব অধিকতর রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মিষ্ট কথা কহিতে জানিতেন না, সর্ব্বদাই লোক-জনের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। একদিন ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁহার শিশু পুত্রকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। পুত্র ক্রন্দন করিতেছিল। কিছুতেই সান্ত্বনা হইতেছিল না। হরিমোহনবাবু ত্রিপুরাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপারটা কি? একটু ভাল করিয়াই ছেলেটাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা হউক না।

ত্রিপুরা। "বোধ হয় খোকার কোনরূপ অসুখ হইয়া থাকিবে,

আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না” অতি ধীরভাবে ত্রিপুরাসুন্দরী এই কয়েকটী কথা কহিলেন।

হরি। “কি? আমার মুখের উপর সমান উত্তর? ভাত পেয়ে বড় তেজ বেড়েছে? ঝাঁটা মারবো আর রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেব।

ত্রিপুরাসুন্দরী সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। চক্ষুর জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগবানকে ডাকিলেন, বলিলেন,—অদৃষ্টে আরও কত আছে, প্রভু! কখনও ত স্বপ্নেও তোমার চরণে কোন দোষ করি নাই, তবে এত সাজা কেন নারায়ণ? অনর্গল নয়ন হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। কাতর-কণ্ঠে ঈশ্বরের নিকট মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। হরিমোহনবাবুর রাগ হইলে সহজে হ্রাস পড়িত না—একজন না একজনকে প্রহার না করিলে তাঁহার সে ক্রোধের উপশম হইত না, যখন ত্রিপুরাকে গালি দিতেছিলেন এমন সময় রাজীব সেখানে উপস্থিত হইল। রাজীবকে দেখিয়াই হরিমোহনবাবুর শরীর রাগে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজীবের চুল ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরা স্বচক্ষে পুত্রের শাস্তি দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই। চারু-বালার বুক দাদার ক্রন্দনে ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে দাদাকে ছাড়াইতে গিয়া নিজে দুই চার চড় খাইল। তখন হরিমোহনবাবু সকলকেই বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে গেলেন। ত্রিপুরা কি করেন কোথায় যাইবেন, অনেক সাধা সাধনা, কাকুতি মিনতি করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া হরিমোহনবাবুকে শান্ত করিলেন। হরিমোহনবাবু আর সেদিন তাড়াইয়া দিলেন না। এইরূপ ঘটনা বাটীতে প্রত্যহ হইতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরীর যাতনার শেষ রহিল না। সংসারে এমন লোক কেহই ছিল না যে যাহার নিকট

আপন দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে পারেন। সর্ব্বদাই ত্রিপুরাসুন্দরী একাকিনী থাকিতেন। কেহই বাটীতে আসিত না। চারুবালা মাতার নিকট হইতে কোথাও যাইত না। মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মাতার যাতনা নিবারণের চেষ্টা করিত। রাজীবকে অতিথিশালায় বেকার খাটিতে হইত। প্রায়ই বাজার হইতে জিনিস পত্র আনিতে হইত। মুটে না পাইলে কখন কখন মাথায় করিয়া মোটও বহিতে হইত। অতিথিশালায় অন্যান্য অনেক কাজও করিত। প্রায়ই হরিমোহনবাবুর হস্তে প্রহার খাইত, গালাগালি অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল। অতিথিশালার কার্য্য অভ্যাস না থাকায় সুচারুরূপে করিতে পারিত না,সেজন্য হরিমোহনবাবু রাজীবকে বড়ই লাঞ্ছনা করিতেন গালি প্রহার অনবরতই চলিত। রাজীব মাতার নিকট আসিয়া কাঁদিত। মাতা নিরুপায়—শোকে, দুঃখে বিহ্বলা হইতেন, আর ভগবানকে ডাকিতেন। তাঁহার নিকট মৃত্যু-কামনা করিতেন। দুঃখে, যাতনায় ত্রিপুরাসুন্দরীর আহারে পর্য্যন্ত অরুচি জন্মাইল। তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িবেন এমন হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি হরিমোহনবাবুর ভয়ে প্রাণপণে খাটিতে হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোবর্দ্ধনের শ্যালক ভৈরব অতিথিশালায় কাজকর্ম্ম করিত। ভৈরব দেওয়ানজীর সুপারিষে বাজার-সরকারী কাজ পাইয়াছিল। ভৈরব বাজার করিত ও কষ্টে শ্রেষ্টে এর ওর পায়ে পড়িয়া চাকরীটা ঠিক করিয়া রাখিত। ভৈরব ও কৌশল্যা মার-পেটের ভাই ভগিনী; কিন্তু দুই জনের চেহারা দেখিলে কে বলিবে যে তাহারা এক মার পেটে জন্মিয়াছে। কৌশল্যা যেমন রূপবতী, ভৈরব সেইরূপ কদাকার ছিল। কৌশল্যার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, ভৈরব সেইরূপ

নির্ব্বোধ ছিল। ভৈরব কৌশল্যার ছোট। ভৈরব যদিও অতদূর কুৎসিত ছিল, তাহার ধারণা কিন্তু যে সে একজন বড়ই সুপুরুষ। আর তার দিদির মত সুন্দরী পৃথিবীতে নাই—এই জন্যে তাহার মনে অহঙ্কার ধরিত না। এদিকে কিন্তু তাহার মনটা বড় সাদা ছিল, লোকের দুঃখ দেখিলে বড় কষ্ট পাইত, প্রাণপণে লোকের দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভৈরব চুল ফেরায়, চুরুট খায় সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট থাকিতে ভালবাসে। যদিও সে খোঁড়াইয়া চলিত তবুও মনে মনে তাহার ধারণা ছিল তাহার মত সুপুরুষ আর নাই। ভৈরব কিছুদিন পাঠশালে গিয়াছিল তাহাতেই একটু টাকা-কড়ির হিসাব করিতে শিখিয়াছিল। বেশ একটু ভারি গোছের হইলে লোকের কাছে গিয়া সেটা ঠিক করিয়া আনিত। কিন্তু মনে মনে ধারণা ছিল সে অঙ্ক-শাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী মহা পণ্ডিত। হিসাবে ভুল হইলে রাজীবকে হিসাব মিলাইতে বলিত, রাজীবের বিলম্ব হইলে তাহাকে ঠাট্টা করিত এবং তাহার নিকট অঙ্কটা শিখিয়া লইতে রাজীবকে উপদেশ দিত। যাহা হউক ভৈরবের মনে মনে আপনাকে রূপবান, গুণবান্, বুদ্ধিমান, বিদ্বান বিশেষতঃ অঙ্ক-শাস্ত্রে একটা পাকা মুরুব্বি বলিয়া তাহার জ্ঞান ছিল। এক দিকে সে দেওয়ানজীর শ্যালক অন্য দিকে তাহার দিদি সুন্দরী, সেই সঙ্গে নিজে সর্ব্বগুণে গুণবান। নির্ব্বোধ ভৈরবের মনে আহ্লাদ ধরিত না। সে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিতে থাকিত। তাহার আর একটা গর্ব্বের কারণ হইয়াছিল যে বিবাহের সময় সে অনেক টাকা কড়ি পাইবে। এমন সুপাত্রে যিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ কিছু খরচপত্র ত করিতে হইবে; কিন্তু ভৈরব যে সে মেয়েকে বিবাহ করিবে না, দিদির মত সুন্দরী পাত্রী না হইলে ভৈরব বিবাহ করিবেই না—সংকল্প করিয়াছিল। তাহার

আর একটা ধারণা ছিল—ভগিনী, ভগিনীপতি শীঘ্রই তাহার বিবাহের যোগাড় করিয়া দিবে ; কিন্তু তাহার ভগিনী, ভগিনীপতি ভৈরবকে একটা জানোয়ার বলিয়া জানিত এবং ভৈরবকে যে কেহ নিজ-কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে ইহা তাহাদের ধারণার মধ্যেও ছিল না। আমারা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে ভৈরব অতিথিশালার চাকরীতে দুই বেলা আহার ছাড়া মাসে নগদ ৪৲ টাকা বেতন পাইত। কিন্তু হিসাবে ভুল করিত বলিয়া প্রায়ই তাহাকে মাহিনা বাদে ঘর হইতে কিছু কিছু দিতে হইত। কৌশল্যা মাঝে মাঝে যে কিছু ভ্রাতাকে পাঠাইত সেই টাকায় কাপড়-চোপড় চুরুটের খরচ চলিত। ভৈরব, কৌশল্যা ও গোবর্দ্ধনের উপর আপনার বিবাহের ব্যাপারটা নির্ভর করিয়া আসিতেছিল। অনেকদিন দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন দেখিল ভগিনী ভগিনীপতি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন সে ভগিনী ভগিনীপতির উপর মহা চটিয়া গেল। সে ভাবিল অনেক টাকা সে বিবাহ করিয়া পাইবে,—তাহাতেই ভগিনী ভগিনীপতির হিংসা হইয়াছে, সেইজন্যই তাহারা তাহার বিবাহের যোগাড় করিতেছে না। কৌশল্যা বা গোবর্দ্ধন ভৈরবের মনের ভাব কিন্তু বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা ভৈরবের রাগ দেখিয়া কেবল বিস্মিত হইয়াছিল। কৌশল্যা ইদানীং ভৈরবের সাহায্যে কিছু টাকা পাঠাইলে ভৈরব দায়ে পড়িয়া টাকা লইত বটে কিন্তু দিদির সে আদর তাহার ভাল লাগিত না।

ত্রিপুরাসুন্দরী অতিথিশালায় বাস করিতেছেন। রাজীবের সঙ্গে ভৈরবের একরূপ প্রণয় জন্মিয়াছে। দুই জনেই প্রায় সমবয়স্ক। রাজীবের মাতার নিকট সর্ব্বদা বাড়ীর ভিতর থাকে মাতা তাহাকে বিবাহ

যোগ্য দেখিয়া বাটীর বাহিরে আসিতে দেন না। চারুবালা এক্ষণে বালিকা, কিন্তু যৌবনে চারু যে রূপবতী-কুল-রাজ্ঞী হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। বিশেষতঃ ভৈরবের চক্ষে চারুর রূপের তুলনা ছিল না। সে এতদিন দিদির মত সুন্দরীকে বিবাহ করিবে বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে চারুকে দিদির মত সুন্দরী দেখিয়া সে তাহাকে বিবাহ করিবে ও বিবাহ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে চিরদিনের জন্য চরিতার্থ করিবে, মনে মনে সংকল্প করিয়া সে প্রথম যেদিন যে মুহূর্ত্তে চিত্রা-নদীতীরে মাতার সঙ্গে চারুবালাকে দেখিয়াছিল, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই চারুবালাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল। সেইজন্য রাস্তায় আসিতে আসিতে ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট তাঁহাদের পরিচয় লইতেছিল। যখন দেখিল যে তাহার সঙ্গে চারুবালার বিবাহে জাতিগত প্রতিবন্ধক নাই, তখনই সে চারুবালাকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। সেইদিন হইতেই ভৈরবের প্রাণে যেন একটা কি নূতন ধরণের সুখের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে চারুবালাকে দেখিয়াই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এতদিনে দিদির মত সুন্দরী স্ত্রী ভাগ্যে জুটিল, তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার মনের সাধ মিটাইবে এই ভাবিয়া তাহার প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় সুখের তরঙ্গ দেখা দিল। নির্ব্বোধ ভৈরব সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজীবকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ত্রিপুরাসুন্দরী যখন দেখিলেন ভৈরব রাজীবকে ভালবাসে, চারুবালার জন্য এটা ওটা সেটা কিনিয়া আনে, তখন তিনিও ভৈরবকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। চারুবালা তাহার স্ত্রী হইলে রাজীব তাহার শ্যালক হইবে, কাজেই শ্যালকের সে বড়ই যত্ন করিতে লাগিল। সে রাজীবের মাথা হইতে জিনিসের মোট কাড়িয়া লইয়া নিজে মাথায় করিয়া আনিত। চারুবালার

ভ্রাতার কষ্ট সে জীবিত থাকিতে কেমন করিয়া দেখিবে? এদিকে ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে যত্ন করিতেছে দেখিয়া, চারুবালার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী এত যত্ন করিতেছেন এই ধারণা একেবারেই নির্ব্বোধ ভৈরবের মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। ত্রিপুরাসুন্দরী যে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন ইহাতে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। ভৈরব কখন কখন ত্রিপুরার নিকট ২১ টাকা আনিয়া [illegible] ত্রিপুরা যত্নের সহিত ভৈরবের টাকা তুলিয়া রাখিতেন। ভৈ[illegible]হা জানিত না, সে মনে করিত— ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার টাকা নিজের আবশ্যক মত খরচ করেন। তাহাতে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে ভাবিত জামাতার টাকা শাশুড়ী খরচ করিলে তাহাতে দোষ কি? ইদানীং ভৈরব ও রাজীব সর্ব্বদাই এক স[illegible]াকিত। প্রাতঃকালে দুই জনে চিত্রানদী-তীরে বেড়াইতে যাইত। ভৈরবের বড় সাধ রাজীব চুরুট খাইতে শিখে; কিন্তু রাজীব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় ভৈরব বড়ই দুঃখিত। রাজীব বলিত লোকে চুরুট তামাক খাইতে খাইতেই মদ ধরে। ভৈরব রাজীবকে ছেলেমানুষ বলিয়া ঠাট্টা করিত।

একদিন ভৈরব রাজীবকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেছিল। যাইতে যাইতে রাজীব আপনাদের কষ্টের কথা ভৈরবকে বলিতেছিল।

রাজীব। ভাই আর ত কষ্ট সয় না—খেতে পাই না পাই—ম্যানেজার বাবুর তাড়না ত আর সয় না।

ভৈরব। ম্যানেজার বাবু সকলের উপরই টিক্‌টিক্ করেন।

রাজীব। বাবা যখন ছিলেন, তখন ভাই আমাদের কোন কষ্টই

ছিল না। আমাদের বাড়ীতে অতিথিশালায় লোক রোজ আসিত। কত লোক আমাদের বাড়ীতে খাইত, কত লোক কত টাকা-কড়ি লইয়া যাইত। আমাদের যে এত কষ্ট হবে তা কে জানিত।

ভৈরব। ভৈরব থাকিতে তোমাদের কোন কষ্টই হতে দেবে না, আমি টাকা-কড়ি রোজগার করি তোমাদের সব দিতে রাজি আছি

রাজীব। তুমিত ভাই ৪৲ টাকা মাহিনা পাও তাতে আমাদেরই বা কি দিবে তুমিই বা কি খরচ করিবে। তোমারই খরচ কত বেশী।

রাজীব তাহার মাহিনার বিষয় জানিয়াছে দেখিয়া ভৈরব বড় অপ্রতিভ হইল। মনে করিয়াছিল যে তাহার চাল-চলনে রাজীব ও ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে একটা মস্ত লোক বলিয়া জ্ঞান করে। পরে ভৈরব বলিল—তাহা বটে কিন্তু আমার দু'টাকা উপরি ত আছে, তাহা ছাড়া আমার দিদির অনেক টাকা আছে, দরকার হইলেই, মনে করিলেই, সেখান হইতে টাকা আনিব।

রাজীব। তোমার দিদির কত টাকা আছে?

ভৈরব। অনেক।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাজীব নদীতে মুখ হাত ধুইবার জন্য নামিল। ভৈরব তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—রাজীব, আমি কি সঙ্গে যাইব?

রাজীব। না তুমি থাক আমি আসিতেছি।

ভৈরব তীরেই দাঁড়াইয়া রহিল—তখন সূর্য্যোদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে। অনেকে নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছে—অনেকে স্নান

করিতেছে—কেহ বা সন্ধ্যা আহ্নিকে ব্যস্ত আছে—অবগুণ্ঠনবতী যুবতীগণ এক পার্শ্বে সলজ্জ-ভাবে স্নান করিতেছে বর্ষীয়সীগণ গাত্র মার্জ্জন করিতেছেন, সঙ্গের পুত্র-পৌত্রগণকে ধমকাইতেছেন, পুত্রবধূগণের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন চলিতেছে, অনেকেই প্রতিবেশীর নিন্দায় ব্যস্ত আছেন। রাজীব একমনে মুখ ধুইতেছে ও আপনাদের অবস্থার কথা ভাবিতেছে। ভৈরব চুরুট খাইতেছে আর তাহার দিদির মত কেহ সুন্দরী আছে কি না তাই দেখিতেছে। সে আবার কখন একটী যুবতীর মুখের সহিত দিদির মুখের তুলনায় ব্যস্ত আছে। এমন সময়ে একখানি নৌকা রাজীবের কাছে আসিয়া তীরে লাগিল। তন্মধ্য হইতে একটী ভদ্রলোক রাজীবকে নৌকায় আসিতে সঙ্কেত করিল। রাজীব নৌকার ভিতর সেই লোকটির কাছে যেমন যাইল। লোকটি রাজীবের সঙ্গে নানা কথা পাড়িল, বলিল—তোমার বাপের নাম কুমুদনাথ না?"

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ, কেন?

লোক। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। এখন তোমরা অতিথিশালায় আছ?

রাজীব আজ্ঞে হাঁ।

লোক। তোমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে শুনিয়াছি—আহা কুমুদনাথের স্ত্রী পুত্র এতকষ্ট পাইবে কে জানিত? সকলি অদৃষ্টের কথা। তা আমি তোমাদের কষ্টের কথা শুনিয়া তোমাদের তল্লাস করিতেছি তোমার কোন একটা কাজকর্ম্ম করিলে ভাল হয় না?

রাজীব। ভাল ত হয়ই, কিন্তু কাজ-কর্ম্ম কোথায়?

লোক। আমি সেই জন্যই তোমায় ডাকিয়াছি আমি তোমাকে

একটা কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া দিব। এখন তুমি এই টাকা কয়টা রাখো। এই বলিয়া টাকা পয়সা দুআনি সিকি আধুলি মিশাইয়া কতকগুলি মুদ্রা রাজীবের কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া বলিল গুনিয়া দেখত কত আছে ?

রাজীবের আহ্লাদ ধরে না। মাতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এখনি টাকাগুলি দিবে,টাকা পাইয়া মাতার কত আহ্লাদ হইবে—এই ভাবিতে ভাবিতে রাজীব টাকাগুলি গুনিতে লাগিল। প্রথমে টাকা গুনিল পরে আধুলি, পরে, সিকি পরে দুআনি তাহার পর পয়সা গুনিতে আরম্ভ করিয়া, এদিকে নৌকা নিঃশব্দে তীর ছাড়াইয়া তীর বেগে চলিতে লাগিল। যখন টাকা পয়সা শেষ হইল তখন রাজীব তীরে নামিবে বলিয়া যেমন উঠিল—দেখিল যে নৌকা তীরে নাই বহুদূরে নদীর মাঝখান দিয়া চলিতেছে—তাহার মনে ভয় হইল এবং বলিল "নৌকা তীরে লাগান" সে কথা কেহ শুনিল না, নৌকা আরও তীর বেগে ছুটিল।

রাজীব। আমি কোথায় যাইতেছি ?

লোক। কর্ম্মস্থলে।

রাজীব। মাকে বলা হইল না ?

লোক। আবশ্যক নাই, বিলম্ব হইলে কর্ম্ম হাত ছাড়া হইয়া যাইবে কর্ম্মস্থল হইতে পত্র লিখিলেই চলিবে এই বলিয়া লোকটি হাসিতে লাগিল।

রাজীব। মা যে আমার জন্য ভাবিবেন। ভয়ে রাজীবের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে সে বলিল—আমি মাকে না বলিয়া কোথাও যাইব না। নৌকা ফিরাও।

কেহ তার কথা শুনিল না, নৌকা দ্রুতবেগে গন্তব্য-পথে চলিল, পালে বাতাস পাইয়াছিল, নৌকা নক্ষত্রবেগে চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রাম-নগরের ঘাট অদৃশ্য হইয়া গেল। রাজীব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল লোকটী তাহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে চলিল।

এদিকে ভৈরবের যখন দিদির মুখের সহিত স্নানরতা রমণীর মুখের তুলনা শেষ হইল সে তখন তাকাইয়া দেখিল যে রাজীব ঘাটে নাই। মনে করিল রাজীব অতিথিশালায় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাকে না ডাকিয়া গিয়াছে ভাবিয়া রাজীবের উপর তাহার অভিমান হইল। সে ত্বরিতগতিতে অতিথিশালায় আসিয়া রাজীবকে ঢের খুঁজিল কিন্তু দেখিতে পাইল না।

*

বেলা বাড়িতে লাগিল অতিথিশালায় লোক জনের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। তথাপি রাজীব ফিরিল না। চতুর্দ্দিকে লোক খুঁজিতে বাহির হইল, কেহই রাজীবের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইল না। ত্রিপুরা সুন্দরী ভৈরবকে ডাকাইলেন ভৈরব বলিল—"আমরা দুইজনে প্রাতে যেমন প্রতিদিন বেড়াইতে যাই, আজও গিয়াছিলাম কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা নদীতীরে যাইলাম। নদীতীরে অনেকে তখন স্নান করিতে আসিয়াছে। তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভৈরব মুখ হাত ধুইবে বলিয়া নদীতে গেল। সে মুখ ধুইতে লাগিল আমি এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম" ভৈরব যে একজন যুবতীর মুখের সহিত তাহার দিদির সুন্দর মুখের তুলনায় ব্যস্ত ছিল সে কথা সে বলিল না, সে বলিতে লাগিল আমি যখন দেখিলাম অনেক বিলম্ব হইতেছে তখন রাজীবকে ডাকিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া দেখি, রাজীব নাই।

অনেক ডাকিলাম এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিলাম রাজীবকে দেখিতে পাইলাম না পরে মনে করিলাম রাজীব আমাকে ফেলিয়া অতিথি-শালায় আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি অতিথিশালায় আসিলাম রাজীবকে খুঁজিলাম দেখিতে পাইলাম না।” ত্রিপুরাসুন্দরী সব শুনিলেন, তাঁহার মুখ প্রথম হইতেই শুকাইয়া গিয়াছিল, নানা প্রকার দুর্ভাবনা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল, ভৈরবের কথা শুনিয়া ত্রিপুরা-সুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ধারণা হইল রাজীব জলে ডুবিয়া গিয়াছে, মাতার প্রাণ আর কি প্রকারে স্থির থাকিবে তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সংসারের একমাত্র অবলম্বন রাজীব নদীগর্ভে প্রাণ হারাইয়াছে এ যাতনা মাতার অসহ্য। তিনি আর কাঁদিতে পারিলেন না তাঁহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, শরীর পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল এক্ষণে রাজীবের শোকে তিনি শয্যাগত হইলেন।

ভৈরব রাজীবকে ভালবাসিত তাহাতে চারুবালার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়াছে সে মনে করিয়াছিল। সে কতদিন চারুকে বিবাহ করিয়া ঘর-কন্না করিতেছে স্বপ্নে দেখিয়াছিল। ত্রিপুরা-সুন্দরীর যত্নে সে বিশ্বাস তাহার আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। ত্রিপুরা-সুন্দরীর প্রাণে স্নেহ বড় প্রবল ছিল। তিনি সকলের উপর চিরদিনই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। এই দুঃখের সময়েও তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহাতে ভৈরব রাজীবের বন্ধু কাজেই ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবকে ভালবাসেন। ভৈরব মনে করে যে চারুবালার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়াই ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে ভালবাসেন যত্ন করেন। এদিকে চারুবালা মাতার অবস্থায় নিতান্ত

ম্রিয়মানা থাকিত। এক্ষণে ভ্রাতার অদর্শনে মৃতকল্পা হইয়াছিল। ভৈরব যাহা বলিত অনিচ্ছা থাকিলেও সে তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত না। রাজীব চলিয়া গেলে পর ভৈরবই ত্রিপুরাসুন্দরীর খোঁজ-খবর লয়। ত্রিপুরাসুন্দরীকে যখন তখন সান্ত্বনা করে। কাজেই চারুকে তাহার সম্মুখে মাতার কাছে থাকিতে হইত। এই সব কারণে নির্ব্বোধ ভৈরব ভাবিত, চারু তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পাগল হইয়াছে সে বিষয়ে তাহার মনে অন্যরূপ সন্দেহই ছিল না। ক্রমশঃ একে ওকে তাকে সর্ব্বস্থলে নিজের বিবাহের কথা নিজেই প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। দিদিকে সংবাদ দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাছে দিদি বা দেওয়ানজী এ বিষয়ে শত্রুতা-সাধন করে সেই জন্য লিখিতে সাহস করে নাই। ভৈরবের বিশ্বাস যে দিদি বা দেওয়ানজীর মনে মনে তাহার বিবাহে বড়ই হিংসা করে। সেইজন্য তাহাদের উপর মনে মনে চটিয়া গিয়াছিল। এই সব কারণে উঁহাদিগকে চিঠি লেখা হয় নাই। ভৈরবের পিতামাতা কেহই ছিল। সে একদিন আপনার এক বাল্য-বন্ধুকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল।

ভাই যাদব,

বহুদিন যা চেয়ে আসিতেছিলাম এতদিনের পর তাই পাইলাম। দিদির মত সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গিয়াছে। এর মধ্যেই সে আমাকে দেখিয়া আমাকে বিবাহ করিতে পাগল হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বড় দুঃখী—টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পারিবে না। তোমার মত কি? ইতি—

তোমারই—

ভৈরব।

বন্ধু উত্তরে লিখিল—

ভাই ভৈরব,

তোমার পত্র পাইলাম—তোমার বিবাহের কথা যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার অমত নাই। টাকা-কড়ি ক'দিনের জন্য। যদি মনের মত পাত্রী পাও তৎক্ষণাৎ বিবাহ করিবে। তোমার রূপে সে যখন মুগ্ধ হইয়াছে—তখন সে বিবাহে পরিণামে সুখেরই সম্ভাবনা; যাহা হউক, কথাটা ত ঠিক? পাত্রীর অভিভাবকদের কি মত, তাহা ত লেখ নাই। ইতি -

তোমারই—

যাদব।

ভৈরব চিঠি পড়িয়া মহা চটিয়া গেল "কথাটা ত ঠিক" চিঠির এই কথায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কথা ঠিক না হইলে আমি কি পত্র লিখি, এটা যাদবের মাথায় আসিল না। নির্ব্বোধ বোকাদের সঙ্গে ভাব রাখা দায়। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ভৈরব তাহাকে আর চিঠি দিল না। মনের কথা মনেই রহিল। এই সময়ে ভৈরবের মাস কাবারী হিসাব দিবার সময় আসিয়াছিল, রাজীব এখানে নাই। রাজীবকে যদিও ভৈরব হিসাব জানে না বলিয়া ধমক ধামক দিত, কিন্তু মনে মনে রাজীবের উপর বড়ই সন্তুষ্ট ছিল। রাজীব শীঘ্রই হিসাবটা ঠিক করিয়া দিতে পারিত। এখন আবার ভৈরব কার কাছে যায়? বাহিরের লোক সর্ব্বদা এসব লইয়া বিরক্ত হইতে চায় না। কাজেই ভৈরবের বড়ই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে ভাবিতেছে আর ঘন ঘন চুরুট টানিতেছে ও ছড়ি ঘুরাইতেছে এমন সময় দিদির নূতন দাসী সরস্বতী আসিল। সরস্বতীকে দেখিয়া ভৈরব হাসিয়া বলিল,—বিয়ের কথা শুনিয়াছিস্ সরস্বতী!

"হুঁ। তুমি ত আমাকে কিছু বল না। গিন্নি লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমাকে ইহার সত্যাসত্য জানিতে পাঠাইয়াছেন!"

ভৈরব। দিদির বুঝি বিশ্বাস হয় না সরস্বতি! আমি বলি শোন, বিবাহের সব ঠিক হয়ে গেছে, মেয়ের মার ইচ্ছা, মেয়ের নিজের ইচ্ছা, মেয়ে আমাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হয়েছে, যদি এখানে বিবাহ ভাঙ্গাতে এসে থাক, এই ছড়ি তোমার পিটে ভাঙ্গিব।

এই সব কথা শুনিয়া সরস্বতী ত্রিপুরাসুন্দরী যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে গেল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে দাসীর চক্ষেও জল আসিল। পুত্র-শোকে কাতরা ত্রিপুরাসুন্দরীও সরস্বতীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। চারুবালা ছিল, সেও কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ বাদে ত্রিপুরাসুন্দরীকে সরস্বতী বলিল,—"মা ঠাকরুণ, আমরা শুনিলাম যে ভৈরব বাবুর সঙ্গে আপনার মেয়ে চারুবালার বিবাহের সব স্থির হইয়া গিয়াছে। তাই জানিতে আসিলাম, বিবাহের দিন কবে স্থির হয়াছে। গিন্নি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করেন নাই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী দাসী উপহাস করিতেছে মনে করিয়া, মরমে মরিয়া গেলেন, ভাবিলেন হা পরমেশ্বর এমন অবস্থা করিলে যে দাসী দাসী-কেও ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিপুরা। সরস্বতী একি ঠাট্টার সময়?

তখন সরস্বতী বলিল, ভৈরব চারিদিকে বিবাহের কথা বলিয়া বেড়াইতেছে, এবং আমাকে বিবাহের কথা সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, বলায় আমি আপনার নিকট ঐ কথার উল্লেখ করিলাম। এই বলিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিবাহের কথা উল্লেখ করিবার তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বারংবার সে ত্রিপুরাসুন্দরীকে সে কথা বলিল। ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবকে নির্ব্বোধ বলিয়া জানিতেন এবং

ভৈরব যে সরস্বতীকে নিজে বিবাহের কথা বলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

পরে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সরস্বতীকে বলিলেন, রাজীব ত গিয়াছে, আমি নিজে মরিতে বসিয়াছি। মরিলে চারুবালার অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে, বাঁচিয়া থাকিতে আর—

এই বলিয়া ত্রিপুরার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। সরস্বতী তাঁর মনের ভাব বুঝিল। বুঝিল যে ত্রিপুরা জীবিত থাকিতে ভৈরবের মত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে না।

এদিকে কতক্ষণে সরস্বতী বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিবে সেই প্রতীক্ষায় ভৈরব অতিথিশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে ত্রিপুরাসুন্দরী বিবাহের দিন পর্য্যন্ত সরস্বতীকে ঠিক করিয়া বলিয়া দিবেন। সে চুরুট টানিতে টানিতে এদিক ওদিক করিয়া পায়চারী করিতেছিল আর তাহার হাতের ছড়ি ঘুরাইতেছিল।

সরস্বতী বাহিরে আসিলে ভৈরব হাসিতে হাসিতে বলিল,— কেমন সরস্বতী! যা বলেছিলাম তা কি মিথ্যা, এখন দিনটা করে স্থির করে এলি।

সরস্বতী। ভৈরবের পাগলামীতে মনে মনে হাসিতে লাগিল। বাহিরে বলিল, "কই ত্রিপুরাসুন্দরী ত বিবাহ দিতে স্বীকার করেন না।"

ভৈরব। তোকে বুঝি দিদি এই বিয়ে ভাঙ্গাতে পাঠাইয়াছিল।

সরস্বতী। তুমি বিয়ে-পাগলা হ'লে নাকি। রাজীববাবু কোথায় চলে গিয়াছেন। মাতা ঠাকুরাণীর ঐ শরীরের অবস্থা, এখন কি মেয়ের বিবাহ দিবার সময়?

ভৈরব। তাই বল, সময়ে বিবাহ হবে, তা আমারও এত তাড়াতাড়ি নেই।

সরস্বতী হাসিয়া ফেলিল।

ভৈরব মহা ক্রুদ্ধ হয়ে বলিয়া উঠিল,—হাসিলি যে সরস্বতী?

সরস্বতী ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন ভৈরব হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল ও বলিল, হায় হায় ভগবান! স্ত্রী-লোকদের বুদ্ধি কেন দেন নাই। তখন সে সরস্বতীর সহিত আর ও কথা না কহিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল "সরস্বতী আর আমি বিলম্ব করিতে পারিনা আমার ঘাড়ে কত কাজ। এখনি মাস-কাবারের হিসাব নিকাশটা ঠিক করতে হবে। বাজারে বা যেতে হয়! দেখ অতিথিশালাটা আমি না থাক্‌লে এক দণ্ডও চলিত না। ম্যানে-জারবাবুর কেবল রাগ আছে। হিসাব নিকাশে কোন জ্ঞান নেই। বুদ্ধি বড় মোটা বলি যদি, মারতে আসবেন। আমার কাছে যদি একটু একটু অঙ্কটা শিখেন ত কত ভাল হয়।" সরস্বতী দাঁড়াইয়া ভৈরবের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছিল। এবং তাহার বুদ্ধির দৌড় বুঝিতে সরস্বতীর বাকী রহিল না। তখন সরস্বতী ভৈরবকে ক্ষেপাইবার জন্য বলিল "দাদা মেয়েটি কিন্তু বড় কুৎসিত ওকে তোমার মত লোকের বিবাহ করা সাজে না। তুমি হলে কত বড় লোক, আবার দেওয়ানজীর শালা। ত্রিপুরাসুন্দরীর মেয়ে, দুঃখীর মেয়ে, রং তেমন নয় মুখ, চোকও কি এমন ভাল। তোমার দিদির পায়ের যোগ্য রূপ নয়।"

ভৈরব। সরস্বতী তোর বুদ্ধি ত নেই তার পর তোর চোকও নেই। চারুবালাকে তুই বলিস কুৎসিত। সময়ে দিদির চেয়েও সুন্দরী হবে।

সরস্বতী। মেয়ের মা তোমাকে যাদু করেছে। না হলে তুমি এ বিবাহে এত ক্ষেপবে কেন?

ভৈরব। গরীবের দায় উদ্ধার করলে পুণ্য আছে। টাকাত ঢের রোজগার করা যাইতেছে, টাকা ত হাতের ময়লা। কত এল কত গেল

সরস্বতী ! ভৈরবকে যাদু করে এত বুদ্ধি কে ধরে ? তবে মেয়ের মা আমাকে ভালবাসেন বটে —

সরস্বতী। তোমার মত পাত্র পাবেন কোথায় যে ভালবাসবেন না। হাঁ দাদাঠাকুর তুমি এই বলিলে ঢের টাকা রোজগার করেছ কই আমাদের ত একদিনও সন্দেশ খাইতে এক পয়সাও দেওনি ?

ভৈরব। সন্দেশ খাবার দিনের আর দেরি কি, এই বিবাহ সময়ে সন্দেশের ছড়াছড়ি হবে।

সরস্বতী। দাদাঠাকুর কতটাকা জমাইয়াছ ?

ভৈরব। টাকা কেমন করে জমিবে খরচ কত।

সরস্বতী। তুমি কত মাহিনা পাও দাদাঠাকুর ?

ভৈরব মহা দায়ে পড়িল সরস্বতীকে কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ঘন ঘন চুরুট টানিতে লাগিল।

সরস্বতী নাছোড়বান্দা বারংবার ভৈরবের মাহিনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

ভৈরব আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিল, মাহিনায় কি করে ? উপরি ঢের পাওয়া যায়।

সরস্বতী। তবু মাহিনাটা কত ?

ভৈরব। চারিটাকা।

সরস্বতী বলিল "পোড়া কপাল। এইতে পরের মেয়ে ঘরে আনতে চাও, ত্রিপুরাসুন্দরী বলেছে মেয়ের গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ফেলে দেবে তবু তোমার সঙ্গে বিবাহ দেবে না।" তখন ভৈরব রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ইচ্ছা হাতের ছড়ি সরস্বতীর পিঠে বসায়।

সরস্বতী ভৈরবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—"মারবে মার, এখনি তোমার এই বিয়ে একবারে ভাঙ্গাইয়া দেব" ভৈরব এক কথায় ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বিবাহ ভাঙ্গাইয়া দিলেই ত সর্ব্বনাশ সে—সরস্বতীকে বলিল সরস্বতী, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম, তুই রাগ করিস না আমার বিবাহের সময় তোকে তসরের কাপড় বক্‌সিস্ দেব আর সন্দেশ খাবার জন্য এই টাকাটা তুই নিয়ে যা। এই বলিয়া একটা টাকা জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া সরস্বতীর হাতে দিল। সরস্বতী যথা লাভ হইল মনে করিয়া টাকাটা আঁচলে বাঁধিল। আর বেলা গিয়াছে, গিন্নী দেরী করিলে রাগ করিবেন, এইসব ওজর করিয়া সেখান হতে সরিয়া পড়িল—পাঠককে আর বলিতে হইবে না যে ভৈরব যে টাকাটা সরস্বতীকে দিল সেটাকা অতিথিশালার বাজারের টাকা। টাকা দিবার পর ভৈরবের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ঐ টাকাটার কিরূপে হিসাব দিবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

সরস্বতী যথা সময়ে কৌশল্যাকে সকল কথা জানাইল। গোবর্দ্ধন ত্রিপুরার অবস্থা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার চক্ষে জল দেখা দিল। রাজীব অতিথিশালা হইতে কোথায় গিয়াছে শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল, পাছে সরস্বতী বুঝিতে পারে যে সে উহার ভিতরে আছে। কৌশল্যাও ত্রিপুরার কষ্ট শুনিয়া বড় সুখী হইল। পরের দুঃখে বিনা কারণে অনেকেই সুখবোধ করে। কোন লোকের সুখের কথা লোকের কাছে বল, দেখিবে অনেকেরই সে কথা শুনিয়া মুখ শুকাইয়া যাইবে। কথাটা ভাল লাগিবে না। আবার সেই সঙ্গে আর একজনের কষ্টের কথা উত্থাপন করে তোমার গলা ধরিয়া সেই কথা শুনিতে থাকিবে। সংসারের ব্যাপারই এইরূপ। কৌশল্যা আবার

রাজীব কোথায় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিল "বেঁচেছি শুনেছিলাম ভৈরব তার সঙ্গে উঠা বসা করে, রাজীবের সঙ্গে আর দিন কত থাকিলে ভৈরব ও হয়ত চোর হইয়া দাঁড়াইত। ভৈরব নির্ব্বোধ বটে. কিন্তু তাহার স্বভাব চরিত্র রাজীবের মত নয়"। পরে সরস্বতাকে সেইজন্য ভৈরবের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিল, সরস্বতী বলিল "ভৈরব বিয়ে পাগলা হয়েছে মেয়েটাকে কি চক্ষে দেখেছে তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছে।"

কৌশল্যা। সেই মেয়ের মায়ের কি মত?

সরস্বতী। "গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ফেলে দেবে তবু ভৈরবের সঙ্গে বিবাহ দেবেনা।" সরস্বতী এই খানে ত্রিপুরাসুন্দরীর কথায় বেশ একটু অলঙ্কার দিয়া বলিল।

কৌশল্যা। হারামজাদীর কি আস্পর্দ্ধা! দাসী বৃত্তি করিতেছেন তথাপি অহঙ্কারের কথা দেখ। ভৈরব যদি তার মেয়েকে বিবাহ করে তবে তার বাপের ভাগ্য।

কৌশল্যা এই বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে বেশ দশ কথা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু ভৈরবের পাগলামী দেখিয়া কৌশল্যা ও গোবর্দ্ধন দুইজনেই ভৈরবকে সতর্ক করিয়া দিতে হবে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। এবং সেই উদ্দেশ্যে ভৈরবকে ডাকিয়া বাড়ীতে আনিবে সেই বন্দোবস্তে রহিল।

রাজীবকে লইয়া নৌকা তীব্রবেগে ছুটিল। নৌকা নদীর মধ্য দিয়া চলিতেছে, কারণ রাজীব চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। নদীর দুই ধারে কত গ্রাম, কত ঘর দ্বার, কত ঘাট, কত ঘাটের উপর মন্দির, কত বন জঙ্গল ছাড়াইয়া নৌকা চলিতে লাগিল

রাজীব প্রাণের ভয়ে কেবল কাঁদিতেছে। কখন কখন সেই লোকটাকে অনুনয় বিনয় করিতেছে। কখন তাহার পায়ে ধরিতেছে। কিন্তু সংসারে স্বার্থ ভয়ঙ্কর বস্তু, স্বার্থ মানুষকে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হৃদয় থাকিতে হৃদয়-হীন করিয়া তুলে। স্বার্থবশে পিতা সন্তানের স্নেহ ভুলিয়া যায়, পুত্র পিতাকে পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে, ভ্রাতা, ভ্রাতাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নৌকার সেই লোক আজ স্বার্থের দাস। রাজীবকে সরাইতে পারিলে বেশ দশ টাকা পুরস্কার স্বরূপ মিলিবে। এই লোভে লোকটী দয়া মায়া মনুষ্যত্ব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয় প্রস্তর সমান কঠিন করিয়াই সে আজ রাজীবের দুঃখে অন্ধ, কাতরোক্তিতে বধির হইয়া স্বার্থ সাধনোদ্দেশে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িল। লোকটা রাজীবকে কিছু আহার করিতে বলিল। রাজীব শুনিল না, কাঁদিতে লাগিল, কেবল লোকটীকে বলিতেছে—

"আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমাকে মার কাছে যাইতে দিন। মা আমাকে না দেখিতে পাইলে দুঃখে মারা যাইবেন। মার এখন বড়ই কষ্টে দিন যাইতেছে। তাহার উপর আমায় না দেখিতে পাইলে হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন। মহাশয়, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

স্বার্থ বলিল—"ওকথা শুন না—ও ছোঁড়ার কথা শুনিতে গেলে তোমার লোকসান কত? একবার ওকে গন্তব্য স্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিলেই তোমায় এক কাঁড়ি টাকা লাভ হইবে। তাহার সঙ্গে হরিমোহনবাবু আর দেওয়ানজী তোমার কত বাধ্য হইয়া থাকিবে ছোঁড়াটা চেঁচাক আর মাথা খুঁড়ুক ওর কথা কাণে কোরো না, ওর

দুঃখ চেয়ে দেখ না। এত দয়ামায়া করিতে গেলে মানুষ কখনই নিজের উন্নতি করিতে পারবে না।"

আবার রাজীব লোকটীর নিকট কত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। বলিল—"আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, আমি আপনার পুত্রের সমান। আমাকে আর কষ্ট দিবেন না—আমার মাকে কষ্ট দিবেন না। আমার ভগিনী ছেলেমানুষ, আমাকে না দেখিতে পাইলে সে কাঁদিয়াই মারা যাইবে। আমাদের বাড়ী নাই—আমাদের ঘর নাই—সব গিয়াছে। আমরা অতি দুঃখী, আমাদের অন্নের সংস্থান নাই। আমরা এককালে কত সুখে কাটাইয়াছি। এখন আমার মা, যিনি কখন বাটীর বাহির হয়েননি, আমার মা পরের বাড়ীর দাসীর মত হয়ে আছেন—তাঁহার যন্ত্রণার শেষ নাই, আমাদের মুখ দেখিয়াই তিনি প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। আমাকে না দেখিতে পাইলে তিনি ভাবিবেন আমি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছি; আমাকে ছাড়িয়া দিন নৌকা ফেরান। আমি আপনার পায়ে ধরি।"

লোকটীর মন রাজীবের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু নরম হইবে এমন সময় স্বার্থ তাহার কর্ণে জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিল "নির্ব্বোধ ওর কথায় মনকে নরম করিতে চাহিতেছিস, বোকা বাঁদর দুঃখে দুঃখে তোর দিন যাইতেছে কোঁচড় পুরিয়া টাকা পাবি—সে টাকায় ছেলে মেয়ে স্ত্রী সকলের জন্য কত ভাল ভাল জিনিস কিনিতে পারবি। কত বিঘা ধান জমী—কত বড় বড় বাগান কিনিতে পারবি—ঘরের চালে খড় নাই নূতন ঘর পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতে পারিবে টাকা দেখিলে তোর স্ত্রী কত সুখী হবে তুই ঘরে কত আদর পাবি আর মনকে নরম করলে দয়া মায়া দেখালে লাভ? সংসারে যে বোকা, সেই দয়া মায়া দেখায়, সেই পরের দুঃখে দুঃখিত

হয়। আজ তোর সম্মুখে জ্বলন্ত উদাহরণ রহিয়াছে। কুমুদনাথের খোকামিতে আজ তার পরিবার পরের বাড়ীর দাসী, ছেলে মেয়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়া অন্নাভাবে শরীর শীর্ণ, মুখ শুষ্ক, অর্থাভাবে সমাজে শিয়াল কুকুর অপেক্ষা হেয়। সাবধান মনুষ্য! নিজের সুখ চাও ত আমার উপাসনা কর; দশজনের একজন হইতে চাও ত আমার কথা শুন, আমাকে ছাড়িলে পথের ভিখারীর অধম হইতে হইবে।

লোকটীর চমক ভাঙ্গিল মনে মনে কহিল সত্যইত আমার মত নির্ব্বোধ জগতে আর কে? ছোঁড়ার চোকের জল দেখিয়া আমার মন গলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। তাইত এখন ছোঁড়াটাকে ছাড়িলে আমার ত লাভের সীমা নাই। হাতে হাতে এক কাঁড়ি টাকার লোকসান আর জন্মের মত দেওয়ানজীর বিষনয়নে পড়িব, হরি-মোহনবাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারিব না সে যাহা হউক, আমার স্ত্রীই বা ঘরে কি বলিবে? তখন সে পাথরে আবার বুক বাঁধিল হাজার হোক ভগবানের জীব একবারে এতটা আসুরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে সব শিখিতে হয় অভ্যাসে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব পিশাচের সহোদর হইয়া উঠে। পুণ্য! তুমি সর্ব্বেশ্বর মহাপুরুষ, সংসর্গ-দোষে নরকের কীটের স্বভাব ধারণ কর। লোকটী রাজীবকে খাইতে বলিল, রজীব কি করে অন্য উপায় নাই দেখিয়া কিছু আহার করিয়া নদী হইতে জল তুলিয়া জলপান করিল। ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। নৌকা অবিশ্রান্ত চলিতেছে, ঝুপ ঝাপ দাঁড় পড়িতেছে, মাঝি দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে গল্প করিতেছে ঠাট্টা তামাসা চলিতেছে লোকটী মধ্যে মধ্যে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। সকলেরই মনে একটা আনন্দের স্রোত চলিল কেবল রাজীব আপনার

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, মাতা ভগিনীর অবস্থা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া—কেবল রাজীব মরমে মরিয়া রহিয়াছে এইরূপে সমস্ত দিন নৌকা বাহিবার পর সন্ধ্যা আসিল বহুদূরে সদূরপল্লী মধ্যে গৃহে গৃহে দীপালোক দেখা দিল দূর হইতে দীপের ক্ষীণালোক দেখা যাইতে লাগিল। আহা, আশার ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষীণ আলোক রাজীবের হৃদয়ে কত সুখ আনিয়া দিতে পারিত কিন্তু রাজীবের হৃদয় গাঢ় অন্ধকারাবৃত নদীতীরবর্ত্তী নিবিড় কাননের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যতদূর দেখা যায় সুদূর-ব্যাপী অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। রাজীব বেশ বুঝিয়াছিল যে ইহার মধ্যে কি একটা গূঢ় রহস্য আছে, নতুবা এই লোকটার আমার উপরে এত দয়া দেখাইবার কি প্রয়োজন। প্রকৃতই যদি আমাদের কষ্ট নিবারণের জন্য, আমাদের দুঃখ অপনোদনের কারণ আমাকে কোন কর্ম্মস্থলে লইয়া যাওয়া এই লোকটার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার মাতার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে দিলে না কেন? মাতাকে লুকাইয়া আমার কি কর্ম্ম করিয়া দিবে? এইরূপ রাজীব যত ভাবিল, ততই তাহার মনে ঘোর সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঘোর বাত্যা-তাড়নে কানন-মধ্যে যেরূপ বৃক্ষলতাদি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, নানারূপ দুশ্চিন্তার ঘোর আন্দোলনে রাজীবের হৃদয় সেইরূপ সুখ-ভ্রষ্ট হইতেছিল। নৌকার গতির বিরাম নাই; রাত্রি আসিল, গগনের নীল অঙ্গে তারকা-রাজী একে একে ফুটিল, বোধ হইল যেন সুন্দরীর নীল বসনে স্বর্ণখচিত পুষ্পাদি বিরাজ করিতেছে, অথবা যমুনার নীলজলে অবগাহনবতী রমণী বৃন্দ আপনাদের মুখগুলি জলের উপর জাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নৈশ-সমীরণ নদীর সহিত কত রঙ্গ করিতেছিল, নদীর তাহা ভাল লাগিতেছিল না,

আপন দয়িত সরোবরের নিকট কি প্রকারে মুখ দেখাইবে? সতী পর-পুরুষের নিশ্বাসেও কলুষিত হইয়া পড়ে।

নৌকা এইরূপে চলিয়া তার পরদিন প্রভাতে একটা ঘাটে গিয়া লাগিল, ঘাটে কোন লোকজন ছিল না, সেটা একটা উদ্যান-বাটীর ঘাট। নৌকা লাগিলে রাজীবকে সেই লোকটী নৌকা হইতে নামিতে বলিল, —রাজীবের গা কাঁপিতেছিল, একে ভয়, এবং সমস্ত দিনের ক্রন্দন, তাহাতে আবার দুর্ভাবনায় রাত্রে নিদ্রা না হওয়ায় রাজীব বড়ই দুর্বলতা অনুভব করিতেছিল। সে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে নৌকা হইতে নামিল। লোকটী তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই উদ্যানের মধ্যে একটী গৃহে লইয়া গেল। সেই গৃহটী বেশ সাজান ছিল, রাজীব আর বসিতে পারিল না, সেইখানে ভূমিতলে শুইয়া পড়িল।

অনেক বেলা হইলে রাজীবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তাহাকে আহার করিতে ডাকা হইল। সে নদীতে গিয়া মুখ হাত ধুইল। স্নানাহারে তাহার ইচ্ছা ছিল না। শরীর অতিশয় দুর্বল বোধ হইতেছিল। রাজীব আহারে বসিল। কিন্তু আহার করিতে পারিল না। চক্ষের জল টপ টপ করিয়া আহার্য্য দ্রব্যের উপর পড়িতে লাগিল, লোকটী রাজীবকে অনেক বুঝাইল এবং ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিল, রাজীবও দেখিল যে তাহার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই নতুবা এতক্ষণ তাহাকে নদীগর্ভে মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে হইত, স্বচ্ছন্দে সকলে মিলিয়া তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিতে পারিত। অতএব তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য তাহাদের নয় সে বুঝিতে পারিল। তথাপি তাহার প্রাণের যাতনা কমিল না, মাতা ও ভগ্নীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

বাগানে আহারাদি সমাপনের পর সেই লোকটী একখানি গাড়ী আনাইয়া নিকটবর্ত্তী একটী রেলওয়ে ষ্টেসনে রাজীবকে লইয়া উপস্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেসনে রেলগাড়ী আসিল। রাজীব ও সেই লোকটী দুইজনে রেলে চড়িল। সেই লোকটী রাজীবকে গোল করিতে মানা করিয়াছিল। বলিয়াছিল "গোল করত তোমাকে আমি ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তোমার নিকট একটা পয়সাও নাই। যে টাকা পয়সা নৌকায় তোমাকে গুনিতে দিয়াছিলাম তাও আমি নিজে রাখিয়াছি। এক্ষনে গোলকরিলে তুমি পড়িয়া থাকিবে, তোমাকে তোমার দেশে লইয়া যাইবার কোন লোকও পাইবে না। সকলেই আপনার কাজে ব্যস্ত। আর গোল করিলে এখনি যাইয়া তোমার মাতাকে অতিথিশালা হইতে তাড়াইয়া দেওয়াইব বা হরিমোহন বাবুর ঘরে চুরি করিয়াছে বলিয়া পুলিশের হাতে দিব।" রাজীব ভয়ে কোনরূপ গোল করিল না। সময়ে রেলগাড়ী অন্য একটা ষ্টেসনে থামিল। রাজীব ও সেই লোকটী তথায় নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া একটা সহরের মধ্যে আসিল। এবং গাড়ীখানা একটা বড় বাড়ীর দরজায় লাগিল।

যখন গাড়ীখানা সেই বড় বাড়ীতে পৌঁছিল তখন সকাল বেলা আন্দাজ ৭টা বাজিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা দেউড়ীতে দাঁড়াইয়া চাকরদিগকে কি আদেশ করিতেছে। গাড়ী আসিলে, তিনি, দুইজন লোক তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া তাঁহারা কে—জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজীবের সঙ্গের লোক কথা না বলিয়া একখানি চিঠি তাহার হস্তে দিল। কর্ত্তা পত্র পাঠ করিয়া রাজীবের দিকে একবার তাকাইলেন ও বাড়ীর ম্যানেজারকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই ছোকরাকে

জমীদারী সেরেস্তায় একটা কাজ দিবে—এ জমীদারীর কাজ কতকটা শিখ। বাড়ীতে আহার করিবে, আর যেমন কাজ শিখিবে তেমন মাহিনার বন্দোবস্ত হইবে। এক্ষণে ইহাদের লইয়া গিয়া স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। ম্যানেজারবাবু, রাজীব ও সেই লোকটীকে লইয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। রাজীব বাড়ীর ভিতরে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইল। সে এত বড় বাড়ী কখন দেখে নাই: প্রথম, দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল গৃহ চতুর্দিকে সারি সারি আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে. বাড়ীর ভিতরটী বেশ সাজান, বাড়ীর ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে। বাড়ীটী সৌধ-ধবলিত দেয়ালের উপর নানা প্রকার কাজ করা, বাড়ীটীতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, রাজীব বুঝিতে পারিল। অনেক লোক জন খাটিতেছে, সকলেই ব্যস্ত ও সকলের মুখেই ব্যস্ত-ভাব। ম্যানেজারের কথা অনুসারে একটী লোক আসিয়া রাজীবকে একটী ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"আপনার কাপড় চোপড় এই ঘরে রাখুন—এই ঘর আপনার বাসা হইবে। রাজীব কাপড়-চোপড়ের কথায় সেই লোকটার দিকে তাকাইল। সেইসঙ্গে দেখিল তাহার সঙ্গের লোকটী আর সেখানে নাই। রাজীবের চক্ষে জল আসিল। লোকটী যদিও পরম শত্রু বলিয়া রাজীবের জ্ঞান হইয়াছিল, তথাপি এই অপরিচিত স্থানে সেই একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি থাকায় তাহার একটু ভরসা ছিল। তাহার অদর্শনে রাজীবের কষ্ট হইতে লাগিল। সে বাড়ীর লোকটীকে বলিল—আমার কাপড়-চোপড় কিছুই নাই।' কেবল পরণে কাপড় আর গায়ে এই জামা তখন সেই লোকটী ম্যনেজারকে সেই কথা বলিল—ম্যানেজারবাবু রাজীবের কাপড়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এদিকে রাজীব আপনার থাকিবার ঘরটীর ভিতর গিয়া দেখিল, ঘরটী বেশ

পরিষ্কার, এক ধারে মেঝেতে একটী বিছানা আছে, একখানা মাদুর তার ধারে বিস্তৃত রহিয়াছে, একটা গাড়ু, একটা ঘটী, একটা জলের কলসী এক ধারে রহিয়াছে রাজীব বুঝিল, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে আনে নাই। কষ্ট দিবার জন্যই আনিয়াছে। কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে আনিবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। সে কতদূরে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল না। জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করিতে বুঝিল যে, সহরের নাম সুবর্ণপুর, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। চিত্রগ্রামের নাম কেহই সেখানে শুনে নাই।

পাছে রাজীব পত্রদ্বারা নিজ-অবস্থা মাতাকে অবগত করে, সেইজন্য হরিমোহনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গোবর্দ্ধন চিত্রগ্রাম ও রামনগরের পোষ্টমাষ্টারদের সহিত এই বন্দোবস্ত করিল—যে ত্রিপুর-সুন্দরীর নামের পত্র চিত্রগ্রামে আসিলে গোবর্দ্ধনের নিকট পাঠাইয়া দেন, আর রামনগরে আসিলে হরিমোহনবাবুর হস্তে পত্র দেন। এইরূপ যথাসাধ্য আট-ঘাট বাঁধিয়া গোবর্দ্ধন নিশ্চিন্ত-মনে বৈষয়িক কার্য্য-কলাপ সম্পন্ন করিতে লাগিল। হরিমোহনবাবুও গোবর্দ্ধনকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিয়াছে মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল।

এদিকে সর্ব্বেশ্বরবাবু ত্রিপুরাসুন্দরীর অন্বেষণে অলস নহেন। কিন্তু কেহই ত্রিপুরাসুন্দরীর সংবাদ আনিয়া দিতে পারিল না। সর্ব্বেশ্বরবাবু কতবার গোবর্দ্ধনকে ত্রিপুরাসুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন "এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই" বলিয়া সব সময়েই উত্তর দিত। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরবাবুর মনে একটা এই সন্দেহ জাগরূক ছিল যে, গোবর্দ্ধন ত্রিপুরাসুন্দরীর সংবাদ জানে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ বলে না। তিনি কতবার সর্ব্বমঙ্গলার

সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন; সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বেশ্বরবাবুর সন্দেহ সম্বন্ধে কোন কারণ নাই—বলিতেন। একদিন সর্ব্বেশ্বরবাবু সর্ব্বমঙ্গলাকে বলিলেন, "তুমি যাই মনে কর, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে দেওয়ানজী ত্রিপুরার কথা সব জানে। ত্রিপুরা বা রাজীবের কথা পাড়িলে দেওয়ানজীর মুখ প্রায় শুকাইয়া যায় কেন? কথার উত্তর দিতে গেলে যেন বাধ বাধ ঠেকে—ইহার কারণ কি?"

সর্ব্বমঙ্গলা—"হইতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরার সংবাদ জানিলে দেওয়ানজীর গোপনের কারণ?"

সর্ব্বেশ্বর—"সেটা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

সর্ব্বমঙ্গলা যাহাই বলুন কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইত না। তাঁহার মনে সন্দেহ দিন দিন দূরীভূত না হইয়া দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। তিনি আর একদিন গোবর্দ্ধনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "দেওয়ানজী ত্রিপুরার সংবাদ কিছু আছে?"

গোবর্দ্ধন—"আজ্ঞে না। আমি পূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই পাওয়া যায় নাই—তাঁহাদিগকে লোকে চিত্রানদীতে নৌকা চড়িতে দেখিয়াছিল। মহদিরাম নামে তাঁহারা একজন মাঝির বাড়ীতে একরাত্রি ছিলেন। বোধ হয় নৌকা-ডুবি হইয়া থাকিবে সেইজন্য কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না" সর্ব্বেশ্বরবাবু বলিলেন নৌকা-ডুবি হইলে কাহার কাহার নৌকা ডুবিয়াছে, সে বিষয় জানা যাইত। আমার প্রজাদের নৌকাতেই ত্রিপুরা পার হইবে—খবর রাখ দেখি, ত্রিপুরা চিত্রগ্রাম ত্যাগ করিবার পর কোন নৌকা ডুবিয়াছে কি না।

গোবর্দ্ধন—"যে আজ্ঞে।"

সর্ব্বেশ্বর—"নৌকা ডুবি হয় নাই। পার হইয়া থাকেন যদি নিশ্চ-

যই তাঁহারা রামনগরে আছেন। রামনগরের গলি-ঘুঁজি সব জায়-গায় অনুসন্ধান করুন। আমিও দেখিতেছি যদি কিছু ফল হয়।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে—এমন সময় সদর দেউড়ীতে একটা গোলযোগ শ্রুত হইল। দুই জনেই তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন—দেখিলেন একজন খঞ্জ দ্বারদেশে দ্বারবানদিগের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে। সে দেওয়ানজীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল "ওই আমার ভগিনীপতি" ভৈরবকে দ্বারদেশে দেখিয়াই গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া গেল। ভৈরব ত্রিপুরার সকল সংবাদ জানিত। এক্ষণে পাছে প্রকাশ করিয়া ফেলে এই ভয়ে গোবর্দ্ধনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সর্ব্বেশ্বরবাবু খোঁড়া ভৈরবের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার বেশ-বিন্যাসের সুশৃঙ্খলা, কেশ-বিন্যাসের সুচারু পারিপাট্য মুখ হইতে চুরুটের ধূম অনর্গল বাহির হইতেছে আর হস্তস্থিত ছড়ি হস্তে ঘন ঘন ঘূর্ণিত হইতেছে, সর্ব্বেশ্বরবাবু এই সমস্ত দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। লোকটী দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত আকার। বেশ-ভূষার পারিপাট্যের দ্বারা তাহাকে দ্বিগুণ কুৎসিত দেখাইতেছিল কথা কহিবার সময় তাহার দাঁতগুলি সমস্ত বাহির হইয়া পড়িতেছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখে অতি শুভ্র দন্ত-পংক্তির বিকাশ—কৃষ্ণবর্ণ বৃষ-পুঙ্গবের কৃষ্ণ ললাটে কপর্দ্দক-মালার শোভা বিস্তার করিতেছিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু হাস্য সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটি কে?"

দেওয়ানজী সর্ব্বেশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া দৌড়িয়া ভৈর-বের নিকটে গেলেন, এবং তাহাকে সেখান হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভগিনীপতি নিকটে আসিলে ভৈরব বলিল "আমি তোমার মনিবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ্ করিতে আসিয়াছি—তুমি

যেদিন সরস্বতীকে অতিথিশালায় পাঠাইয়াছিলে, সেদিন হইতে ত্রিপুরা—

ত্রিপুরার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র গোবর্দ্ধন ভৈরবকে যথাশক্তি সেখান হইতে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নানারূপ মিষ্ট কথা বলিয়া সেখান হইতে সরাইয়া রাস্তায় লইয়া গেল। সর্বেশ্বরবাবু ভৈরবের মুখে ত্রিপুরার নামটি গোলমালে শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দেওয়ানজীর ভাবগতিক দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এই লোকটাকে কেন দেওয়ানজী এতটা খোসামোদ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল, সর্বেশ্বরবাবু বুঝিতে না পারিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দেওয়ানজী ভৈরবকে আপন বাটীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। রাস্তায় ভৈরব ভগিনীপতির উপর মত্রা চটিয়া গরম হইয়াছিল, বলিতেছিল—"আমি সব একদিক হইতে খুন করিব, সরস্বতীকে আগে কাটিব, সেই বেটী ত্রিপুরাসুন্দরীকে কি বলিয়া আসিয়াছে, সেই অবধি ত্রিপুরাসুন্দরী আমার মুখ দেখেন না। মেয়েটি আমাকে কত ভালবাসিত, বাড়ীর ভিতর গেলে আমার দিকে কেমন তাকাইত, এখন সে আমায় দেখিলে পলাইয়া যায়। ত্রিপুরা তেমন আর যত্ন করেন না।" কথাটা এই যে, যখন হইতে সরস্বতীর মুখে ভৈরবের সহিত চারুবালার বিবাহের কথা ত্রিপুরাসুন্দরী শুনিয়াছিলেন, সেই অবধি ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবের মন হইতে মিথ্যা ধারণাটা দূর করিবার জন্য সযত্ন হইয়াছিলেন। রাজীবের অদর্শনে নিজের মনের কষ্ট ও অন্য অন্য নানা কারণে ভৈরবকে আর তিনি তত ডাকিতেন না। চারুবালাও সেই অবধি ভৈরবকে দেখিলে লজ্জা পাইত, কাজেই উহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইত। ভৈরব যখন দেখিল যে উহাদের ভাবান্তর হইয়াছে, তখন

সরস্বতী সব দোষের গুরু ভাবিয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী ভগিনীপতি সরস্বতীকে উৎসাহ দিয়াছেন মনে করিয়া ভৈরব চিত্রগ্রামে সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে ভগিনীপতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে নালিশ করা হইল না দেখিয়া সে বড়ই ক্ষুব্ধ হইল এবং দেওয়ানজীর উপর মনের ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। সে বলিল—"আমি মরিব, তোমরা কেন আমার শত্রুতা করিতেছ।"

দেওয়ানজী ভৈরবকে কি বলিয়া বুঝাইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আপন বাটীতে তাহার ভগিনীর নিকট আনিলেন। ভৈরব কৌশল্যাকে দেখিয়া আরো জ্বলিয়া উঠিল। নিজের ভগিনী সকলের চেয়ে আপনার লোক—আমার সুখে বাধা দিতেছে, এই ভাবিয়া ভৈরব কৌশল্যার উপর সর্ব্বাপেক্ষা চটিয়া উঠিল। তার মনে যা আসিল তাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

কৌশল্যা ভৈরব বিয়ে-পাগলা হইয়াছে মনে করিয়া সকল কথা সহ্য করিল। পরে যখন ভৈরব একটু ঠাণ্ডা হইল, তখন তাহাকে সকল বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কৌশল্যা বলিল "ভৈরব, ত্রিপুরাসুন্দরী তোমার সঙ্গে কখনই চারুবালার বিবাহ দিবেন না। তোমার এরূপ ধারণা কেন হইল যে তোমার সঙ্গে চারুবালার বিবাহ হইবে।"

ভৈরব বলিল,—"তোমার বুদ্ধি থাকলে ত তুমি বুঝিবে; আমার বোকা ভগিনীপতির বুদ্ধি থাকিলেত সে বুঝিবে। আমি না বুঝিয়াই কি একটা কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছি? তুমি কি আমাকে বোকা—না পাগল বলিতে চাও।"

কৌশল্যা মনে মনে বুঝিল, ভৈরবকে বুঝান দায় হইবে তখন সে শপথ করিতে লাগিল যে তাহারা ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা দেয়নি। ভৈরব তখন বলিল "তবে সরস্বতী যত নষ্টের

গোড়া, তাকে আমি জুতা-পেটা করিব, তবে ছাড়িব।” সরস্বতী সেখানে ছিল না। ভৈরব সরস্বতীর উদ্দেশে বাপান্ত চৌদ্দপুরুষান্ত করিল। তখন কৌশল্যা ও দেওয়ানজী তাহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং এই বিবাহ যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তখন ভৈরবের সেই মুখে হাসি দেখা দিল। দন্ত-পংক্তি বিকসিত হইল এবং পাঠশালের ক্রীড়া কাষ্ঠফলকের উপর খড়ি দিয়া বালকদিগের বর্ণমালা লিখিবার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বলিল “দিদি, সাধে কি রাগ হয়। কত কষ্টে তোমার মত একটা সুন্দরী মিলিয়াছিল, বল দেখি তাহাতে যদি বাধা পড়ে তাহা হইলে রাগ হয় কি না?”

কৌশল্যা কপট ক্রোধ দেখাইয়া বলিল “ছিঃ দিদির মত সুন্দরী এখা কি বল্‌তে হয়? ও কথা আর বোল না।” মনে মনে নিজে মহা সুন্দরী জ্ঞানে আনন্দে গলিয়া গেল

ভৈরব বলিল “যে আছে, মনের কথা বলিলেই লোকের কাছে পাগল হইতে হয়। চিরকালের পণ যে তোমার মত সুন্দরী না হলে বিবাহ করিব না।” তখন দেওয়ানজী ঠাট্টা করিয়া বলিল “কেন তোমার দিদিকে বিবাহ করিলেই ত ভাল হইত।”

ভৈরব বলিল—“আমি ঠাট্টা বুঝি হে দেওয়ানজী, তোমাদের ঘরে বুঝি এরূপ পদ্ধতি আছে?” ভৈরব এই কথা বলিয়া হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিল, মনে করিল জবাবটা খুব ক[illegible] হইয়াছে। দেওয়ানজী যখন দেখিল ভৈরব প্রকৃতিস্থ [illegible] তাহাকে বলিল “তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া [illegible] যাইও না বা সর্ব্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করিও না।”

ভৈরবের মনটা তখন একটু খুসী হইয়াছিল, সে দেওয়ানজী

অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। সময়ে ভৈরব ভগিনী ও ভগিনীপতির নিকট বিদায় লইয়া রাম নগরে চলিয়া গেল।

রাজীব জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করে আর দিন কাটায়, দুঃখে কষ্টে কোনরূপে দিন কাটে। রাজীবের এখনও মাহিনার বন্দোবস্ত হয় নাই, সে দিনের বেলায় কাজকর্ম্মে একরূপ ব্যস্ত থাকে, রাতে মাত্র ভগিনীকে মনে করিয়া কাঁদে। এইরূপে কতক দিন কাটিয়া গেল। শোক-দুঃখ কাহারও চিরকালের জন্য একভাবে থাকে না, শোক-দুঃখের বেগ কালে শিথিল হইয়া আইসে। রাজীবেরও সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছিল। রাজীবের শরীর কিন্তু বড়ই শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সে এক দিন পোষ্ট আফিসে আসিয়া পোষ্ট মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, যদুবাবু (যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষ্টমাষ্টারের নাম) আপনি বলিতে পারেন যে চিত্রগ্রামে চিঠি দিতে হইলে কোন্ ডাকঘরের ঠিকানায় দিতে হয়? যদুবাবু বলিলেন "চিত্রগ্রাম কোন্ জিলায়?"

রাজীব। তা ত আমি বলিতে পারি না।"

যদু। তবে আমিও বলিতে পারিলাম না।

রাজীব। "রামনগরে চিঠি দিতে হইলে রামনগরের ঠিকানায় দিলেই বোধ হয় চলে। কেন না রামনগর একটা বড় সহর। তবে রামনগরে অনেক গলি ঘুঁজি আছে। গলির নাম না জানিলে কি রামনগরের যে কোন জায়গায় চিঠি পৌছিতে পারে?

যদু। তাও কি হয়?

রাজীব বড়ই দুঃখিত হইল। তাহার চক্ষু দিয়ে জল পড়িতে লাগিল। তখন রাজীব আনুপূর্ব্বিক আপনাদের অবস্থার কথা পোষ্ট-মাষ্টারকে বলিল। পোষ্টমাষ্টার রাজীবের কথায় বড়ই

দুঃখিত হইলেন। বলিলেন এ সব কথা কি তোমার মনিববাবুকে জানাইব ?”

রাজীব। “যদি তাহা হইতে আর কোন বিপদ হয়। না তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। আপনি পারেন যদি আমাকে দেশে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।”

যদু। আপনাদের দেশের ঠিকানাটা যে বুঝিতে পারিলাম না। কোন জিলায় ? চিত্রগ্রাম রামনগর সহরের নাম শুনিয়াছি. আপনি বোধ হয় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক আপনার যাহাতে উপকার হয়, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনাকে দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি যে আপনি একটা ভালঘরের ছেলে।”

রাজীব বলিল, “আমার হাতে এমন একটী পয়সা নেই যে আমি এক পয়সার কোন জিনিস কিনি। চিঠি দিতে হইলে আপনার কাছে টিকিট ভিক্ষা করিতে হইত।”

যদু—“কেন ? আপনি মাহিনা পান না।”

রাজীব—মনিব মহাশয় বলেন যে তিনি একবারে ৬ মাসের মাহিনা আমাকে দিবেন। এখন কেবল দুইবেলা খাইতে দেন। আর যখন কাপড় চোপড় যাহা আবশ্যক হইবে তাহা দিবেন।”

যদু। “আপনি কি তামাক খান ? তাহা হইলে তামাক সাজিতে বলি।”

রাজীব। “না মহাশয়, মা বলিয়াছিলেন যে, তামাক ধরিতে ধরিতে লোকে মদ ধরে।

যদু। “কথাটা সেটা ঠিক না হউক, কোন নেশার বাধ্য হওয়া ভাল নয়।”

যদুনাবু। রাজীবের সচ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজীব ক্রমশঃ পোষ্ট-মাষ্টারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজীবের কথায় বার্তায় পোষ্ট মাষ্টার বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি রাজীবকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিতেন, রাজীব তাহাতে নিজের মনোমত দুই একটা জিনিষ কিনিত।

রাজীব এইরূপে ৩।৪ মাস বিদেশে কাটাইল। ক্রমে ক্রমে পোষ্ট মাষ্টার বাবু ভিন্ন ২।৪ জন অন্য লোকের সঙ্গে রাজীবের আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। তাহার সমিতের জমিদারী সেরেস্তায় তাহার সমবয়স্ক ছিল, তদ্ভিন্ন বাহিরের দুই চারিজন সমবয়স্ক ব্যক্তিরও সহিত আলাপ পরিচয় হইল। ক্রমে তাহাদের সহিত প্রণয় জন্মিল। রাজীব সময় পাইলেই তাহাদের দলে মিশে, তাস খেলে, তামাক খাইতে বসিলে ইতস্ততঃ করে। একদিন রাজীবের সমবয়স্ক সুরেনের বাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজীবের নিমন্ত্রণ হয়। আরো দুই একজন রাজীবের আলাপী লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বাড়ীতে রাত্রে যাত্রা হইবে। রাত্রিতে সুরেন রাজীবকে ছাড়িয়া দিল না। একটি বৈঠকখানায় বসিয়া পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে হাসি, গল্প, তাস চলিতে লাগিল। রাজীব অনেক পীড়াপীড়িতে সেই দিন তামাক খাইল। রাজীব তখন দেশে ফিরিবার সম্বন্ধে একরূপ আশা শূন্য হইয়াছিল। সে কাজেই ঐসব সমবয়স্কদের সহিত বাস করিতে হইবে ভাবিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টায় থাকিত। তাহারাও রাজীবকে কখন কখন কিছু কিছু দিয়া সাহায্য করিত।

ঐ সকল সমবয়স্ক বাবুদিগের মধ্যে শঙ্কর নামে একটী যুবক ছিল। সে গাঁজা, চরস, সিদ্ধি সব নেশায় পরিপক্ক ছিল। তাহা অনেকেই জানিত.

অনেকেই জানিত না। রাজীব জানিত না, সে একদিন শঙ্করকে তামাক দিবে বলিয়া চরস সাজিয়া দিয়াছিল, শঙ্করের তাহাতে বড়ই নেশা হইয়াছিল। আর কখন সে তামাক পর্য্যন্ত খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু সংসর্গের এমনই গুণ যে যে রাজীব পূর্ব্বে পাছে তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া যায় বলিয়া তামাক খাইতে ভয় পাইত, এই দুই মাসের মধ্যে তামাকে তাহার বেশ অভ্যাস হইল। মনিবের বাড়ীতে প্রথমে গোপনে গোপনে তামাক খাইত। পরে প্রকাশ্য ভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের হাত হইতে হুঁকা লইতে লজ্জিত হইত না। কিছুদিন পরে রাজীব ও শঙ্করের মধ্যে একটা বড়ই মাখা-মাখি গোছের হইয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে রাজীব আর ততটা ঘনিষ্ঠতা রাখে না। শঙ্কর সময় অসময়ে রাজীবের সঙ্গে দেখা করে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর প্রায়ই রাজীবের কাছে শুইতে আসে। শঙ্করের বাটীতেও রাজীবের গতিবিধি বড় ঘন ঘন হইয়া উঠিল। শঙ্করকে না দেখিলে রাজীব থাকিতে পারে না রাজীবকে না দেখিলে শঙ্করের বড়ই কষ্ট হয়।

শঙ্কর জাতিতে ব্রাহ্মণ। শঙ্করের পরিবার মধ্যে মাতা ও একটী বাল-বিধবা ভগিনী ছিল। মাতার হাতে বেশ দশটাকা নগদ ছিল। শঙ্করের সেই টাকার সুদে সংসার একরূপ স্বচ্ছন্দে চলিত। শঙ্করের পিতা তেজারতী কারবারে দশটাকা বেশ রাখিয়া গিয়া ছিলেন। শঙ্করের মাতা টাকা কড়ি খরচের বিষয়ে একটু বুঝিয়া চলিতেন লোকে সেই জন্য বলিত তাঁহার হাতদিয়া জল গলে না। টাকা কড়ি ধার চাহিলে টাকা যে কোথা হইতে বাহির হইত কেহ জানিতে পারিত না। লোককে শঙ্করের মাতা বলিতেন যে, তিনি অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে, পাছে কেহ সুদ ছাড়িবার জন্যে অনুরোধ করে

সেই জন্য লোকের কাছে ঐরূপ একটা অছিলা করিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ লোকে জানিত যে টাকাটা শঙ্করের মাতা নিজের বাক্স সিন্দুকের নিকট হইতেই ধার করিয়া আনিতেন। সে যাহা হউক শঙ্করের মাতার হাতে দশ টাকা ছিল। শঙ্করের কোনরূপ গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ছিল না। শঙ্কর রাজীবকে কখন কখন কিছু কিছু দিত। রাজীব সেইজন্য শঙ্করের বড়ই বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে শঙ্করের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিবার জন্য রাজীবকে শঙ্করের মন যোগাইতে হইত। কাজেই তামাক.গাঁজা.চরস সকল প্রকার নেশা-তেই রাজীবের কিছু কিছু অভ্যাস হইল। শঙ্কর নেশার সামগ্রী নিজের পয়সায় কিনিয়া রাজীবকে তাহার ভাগ দিত। রাজী মনিবের বাড়ীতেও গোপনে গোপনে কখন কখন গাঁজা চরস খাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যদুবাবু রাজীবের সচ্চরিত্রতার জন্য রাজীবকে প্রশংসা করিতেন। একদিন সুরেন পোষ্ট-আফিসে আসি-য়াছে, যদুবাবু সুরেনকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "সুরেনবাবু, রাজীবের সংবাদ কি? সে এখানে আছে না আর কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে?

সুরেন বলিল "কেন? সেত এখানেই আছে।"

যদুবাবু—"আমার কাছে সে আর এখন আসে না কেন?"

সুরেন। "সে আমাদের কাছেও এখন আসিতে চায় না।"

যদুবাবু। "সে বুঝি এখন একলাই থাকে?"

সুরেন। "না শঙ্করের সঙ্গে তার এখন বড়ই মাখামাখি ভাব হইয়াছে। সেইখানেই যাতায়াত করে। শঙ্করও রাজীবকে না দেখিলে থাকিতে পারে না।"

যদুবাবু শঙ্করের চরিত্রের বিষয় জানিতেন বলিলেন "রাজীব বা এইবারে মাটী হয়।"

সুরেন। "সে বিলক্ষণ মাটী হইয়াছে.চব্বিশ ঘণ্টা তামাক, গাঁজা, চরস চলিতেছে।" সুরেন অনেকটা বাড়াইয়া বলিল।

যদুবাবু। "বল কি? তাহাকে যে তামাক খাইতে বলিলে সে বলিত যে তাহার মাতা তাহাকে তামাক খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সে আরো বলিত যে তামাক খাইতে খাইতেই লোকে মদ ধরে।"

সুরেন। "মদ ধরিবার আর বেশী দেরি নাই, পয়সা হইলেই মদ ধরিবে।"

যদুবাবু সুরেনের কথায় বড়ই দুঃখিত হইলেন। রাজীবের চরিত্র এইরূপে নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া, তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন. বলিলেন, "ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে এখানে অভিভাবক কেহই নাই। দেখিতেছি রাজীবের ভবিষ্যৎ বড়ই শোচনীয়।"

সুরেন, যদুবাবুর কথায় দুঃখিত হইল, বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন রাজীব না শেষে চোর হইয়া দাঁড়ায়।"

যদু। "আশ্চর্য্য কি?" এইরূপে দুইজনে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে রাজীব পোষ্টাফিসের সম্মুখের রাস্তা দিয়া শঙ্করের বাড়ীতে যাইতেছিল। তাহার হাতে একটা হুঁকা, সে প্রকাশ্য ভাবে হুঁকা টানিতে টানিতে পোষ্টাফিসের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সুরেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাজীব যাইতেছে দেখাইল।

পোষ্ট মাষ্টার রাজীবের চাল চলনে বড়ই বিস্মিত হইলেন। মানুষ যে এত শীঘ্র এতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না।

শঙ্করের ভগিনীর নাম নীরদা। বয়স ১৫।১৬ বৎসর পূর্ণ-যৌবনা। দেখিতে মুখখানি মন্দ নহে, গঠনও বেশ, সে বাল-বিধবা, বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হইয়া মাতার নিকট আসিয়াছে। মাতার সেবায় লাগিতে পারে, তাই মাতাও তাহাকে শ্বশুরবাটীতে পাঠাতে চাহেন না। নীরদা মুখরার অগ্রগণ্যা, ব্যাপিকা ও নির্লজ্জার একশেষ। তাহার মাতাও তাহাকে বাল-বিধবা বলিয়া আদর দিতেন। বড় একটা শাসন করিতেন না। মাতার প্রশ্রয় পাইয়া নীরদা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না; সে শঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখী ঝগড়া করিত, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও চুলোচুলি করিত। এদিকে নীরদা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল; রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে দুই চারিখানি পাঁচালি ছড়ার বইও নীরদার বাক্সের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। গানের উপর নীরদার ঝোঁক ছিল। নীরদার গলাটীও বেশ মিষ্ট। নীরদা অনেক গানই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গান করিতে ভালবাসিত। কাজ কর্ম্মে নীরদার তত মন ছিল না। যে কাজ করিতে যাইত, সেই কাজই মাটী করিত। রাঁধিতে গেলে—হাঁড়ি ভাঙ্গিত, ভাত ধরাইয়া ফেলিত, জল আনিতে গেলে কলসী ভাঙ্গিত। অর্থাৎ সে ধীরে ধীরে কোন কাজ করিতে পারিত না। নীরদার সব তাড়াতাড়ি—হাঁটিবার সময় চরণ বিন্যাসের শব্দ দূর হইতে শোনা যাইত—এত জোরে নীরদা মাটীতে পা ফেলিত। আস্তে আস্তে হাঁটিতে পারিত না, একস্থানে স্থির থাকিতে নীরদার বড় কষ্ট হইত। বাড়ীর ভিতর এদিক ওদিক সেদিক ঘুরাইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত। কাহার সঙ্গে মিশিত না। যতটা পারিত একলা থাকিত। নীরদার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর উদ্গমের অবসর পায় নাই—স্বামীর মৃত্যু বাল্য কালেই হইয়াছিল—স্বামীর ভালবাসা কাহাকে বলে সে জানিত না, কাজেই প্রেমের

আস্বাদনে নীরদার হৃদয় বঞ্চিত ছিল—সে পুরুষমানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিত না।—কেহ তাহাকে ঠাট্টা করিবেন বা অনুরাগের কথা জানাইবেন, এত সাহস কাহারও হইত না।

সংসারে একাকী আসিবে, একাকী যাইবে,—বিধাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নীরদা ধরাধামে পদার্পণ করিয়াছিল, নীরদার একটী আদরের বিড়াল ছিল—সেইটা কোলে পিটে করিয়া লইয়া সে বেড়াইত। সেটাকে পুষিতে ভালবাসিত, সেটা কোথাও একদণ্ডের জন্য যাইলে নীরদার চক্ষে জল আসিত। নীরদার মাতা নীরদার স্বভাব-চরিত্রে নিশ্চিন্ত ছিলেন। নীরদা মুখরা হউক, নিলজ্জ হউক, কুলে কখনও কালি দিবে না। ইহা নীরদার মাতা বেশ বুঝিয়াছিলেন। রাজীব শঙ্করের নিকট আসিত, নীরদা রাজীবকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিত না। ইদানীং তাহার সম্মুখে বাহির হইত, তাহার সহিত কথা কহিত। শঙ্কর বা শঙ্করের মাতা তাহাতে বিরক্ত হইতেন না, তাঁহারা নীরদাকে বেশ চিনিতেন, কাজেই রাজীবের সহিত কথাবর্ত্তা কহিতে তাঁহাদের আশঙ্কার বিষয় কিছুই ছিল না। নীরদা প্রায়ই কাজ কর্ম্মের সময় গুণ-গুণ করিয়া গান করিত, গুণ গুণ করিতে করিতে কাজ করিত। কখন কখন মাতাকে শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইত। গান শুনিতে শুনিতে মাতার চক্ষে জল আসিত—রামায়ণ মহাভারত মাতার নিকট পড়িত, নীরদা এইরূপে দিন কাটাইত। একদিন রাজীব বাহির হইতে ডাকিল, "শঙ্কর বাড়ীতে আছ?" শঙ্কর বাড়ীতে ছিলনা, নীরদা বলিল, "দাদা বাড়ীতে নাই।" রাজীব চলিয়া যায়, এমন সময় নীরদার মাতা রাজীবকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এসনা রাজীব, বাড়ীর ভিতর এস, একটু রোস, শঙ্কর এখনি আসিবে।" রাজীব বাড়ীর ভিতর আসিল। আসিয়া

দেখে. নারদার হাতে একখানা বই রহিয়াছে। নীরদা বলিল, "বল দেখি রাজীব দাদা, আমার হাতে এখানা কি বই ?"

নারদা রাজীবকে দাদা সম্বোধনে ডাকিত।

রাজীব বলিল "আমি কি জানি! কি বই তুমি বল না!"

নীরদা। আচ্ছা, রামত নারায়ণ ছিলেন, মারীচ তাঁহাকে তখন কি রকমে প্রবঞ্চনা করলে।"

রাজীব। 'আমি অত জানি না, নীরদার এই বয়সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে দেখছি, রামায়ণ মহাভারত পড়া, রামচন্দ্র নারায়ণ, মারীচ কেমন করে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করলে। এই সবের মীমাংসা নিয়েই নীরদা আছে, আমার অতদুর জ্ঞান জন্মায়নি।"

এমন সময়ে নারদার মাতা কোন কার্য্যোপলক্ষে সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। রাজাব ও নীরদা দুইজনে কথা কহিতে লাগিল।

এইরূপে নারদা রাজীবকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে রাজীব তাহার যথাসম্ভব উত্তর দিতেছে। এমন সময়ে রাজীব শঙ্করের গলার শব্দ শুনিতে পাইল। শঙ্কর বাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া রাজীব উঠিয়া গিয়া বৈঠকখানায় গেল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল "রাজীব কতক্ষণ আসিয়াছ ?"

রাজীব—"প্রায় এক ঘণ্টা।"

শঙ্কর—"এতক্ষণ কি করিতেছিলে ?

রাজীব—"তোমার মা আর নীরদা দু'জনের সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলাম।"

শঙ্কর—"নীরদা শাস্ত্রের কথা কয়নি ?

রাজীব কোন উত্তর দিল না, সে কি ভাবিতেছিল

শঙ্করের কথা রাজীবের কর্ণে গেল না. সে কি ভাবিতেছিল কি
বলেছিল ?—এতদিন ত সে শঙ্করের বাটীতে আসে শঙ্করের সহিত
তাহার প্রণয় বড় গাঢ় রকমের ছিল। কই শঙ্কর কথা জিজ্ঞাসা
করিতেছে আর সে কথা রাজীবের কাণে যাইতেছে না—এমনটী ত
কখন হয় নাই, আজ রাজীবের মনের গতি এমন হইল কেন ?—
রাজীবের হৃদয়ে যেন একটা কিসের গোল বাধিয়াছে সে আপনার
মনের ভাব আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না।

শঙ্কর—"রাজীব। মনে মনে কি ভাবিতেছ ?

রাজীব থতমত খাইয়া বলিল "কই না।"

শঙ্কর—"বুঝেছি অনেকক্ষণ মৌতাত হয়নি।"

রাজীব হাসিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—গাঁজা না চরস ?

রাজীব—"আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না।"

শঙ্কর—"টানিলেই ভাল লাগিবে।"

পরে দুইজনে দুই এক ছিলিম চরস চড়াইল—ছিলিম কত তামাক
খাইল। দুইজনের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। এখন রাজীব বাসায়
যাইবার জন্য উঠিল—শঙ্কর বাড়ীর ভিতর গেল—রাজীবের নেশা
হইয়াছে. সে চরস মুকল ধরিয়াছে, নেশায় তাহার মাথাটা কেমন করি-
তেছে. রাস্তাটা আর সোজা বলিয়া বোধ হইতেছিল না, বড়ই উঁচু নীচু
হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এই অবস্থায় সে মনিবের বাসাতে গেল আপ
নার শয়ন গৃহে গিয়া সে দ্বার বন্ধ করিয়া নেশার ঝোঁকে চুপ করিয়া
পড়িয়া রহিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জমীদারী সেরেস্তার কাজ না করিয়া রাজীব
শঙ্করের বাড়ীতে গেল। তখন জোর হইয়াছে। শঙ্করের স্ত্রী

নীরদা রাজীবকে দেখিয়া বলিল "রাজীবদাদা, এত সকালে ?" নীরদা তখন আপনাদের ফুলবাগানে ফুল তুলিতেছিল। ফুলবাগানটী সদরে বাগানটী ছোট কিন্তু তাহাতে প্রায় সকল রকম ফুলগাছই কম-বেশী আছে। জাতী, যুথি, মল্লিকা, পাশাপাশি বাল্য-সখীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দীর্ঘাঙ্গী রজনী-গন্ধা আপন পুষ্পের সুবাসে যেন আপনিই বিভোর হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রস্ফুটিত সাদা সাদা ফুলগুলি দেখিলে বোধ হইতেছে যেন রজনীগন্ধা শুভ্র দন্ত বিকাশ-পূর্ব্বক অপর পুষ্প তরুগণকে দেখিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিতেছে। সেদিন রজনীগন্ধা ভিখারিণীবেশে মাটীর সহিত মিশাইয়াছিল। সকল তরুলতার পদতলে পড়িয়া আপন দুঃখের কথা জানাইতেছিল। তরুলতাগণ দুঃখ-পরবশ হইয়া তাহাকে মেঘের নিকট এক পসলা বৃষ্টি মাগিতে শিখাইল। বৃষ্টির পসলা পাইয়া আর রজনীগন্ধার অহঙ্কার ধরে না, সেই গর্ব্বে মাথা তুলিয়া পুষ্পরূপ দন্ত-বিকাশ দ্বারা সকলকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। রজনীগন্ধে ! তোমার দোষ নাই, এখন এটা একটা সংসারের পাকা নিয়মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত শত লোক ঐরূপে সংসারে আপনার দুঃখ জানাইয়া দুঃখ মোচনের উপায় শিক্ষা করিয়া যে দয়া করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির উপায় শিখাইয়া দেয়, কালবশে তাহারই মস্তকে চরণ স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, পূর্ব্বের অবস্থা ভুলিয়া যায়, অতি দর্পে মস্তক উন্নত করিয়া পূর্ব্ববন্ধুকে অশ্রদ্ধা করে। যাহা হইতে উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে শিখিল তাহাকেই হেয়জ্ঞান করে এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিতেও ছাড়ে না। রজনীগন্ধে ! তোমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। ক'দিন তুমি তোমার এই ব্যঙ্গ প্রপূরিত হাস্য-বিকাশে জগতকে উপহাস করিতে সক্ষম হইবে ? আবার

তোমাকে ঐ মস্তক অবনত করিয়া মাটীর সহিত মিশাইতে হইবে।

সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকে ঢাকিয়া গোলাপ-বৃক্ষ আপন ফুলের রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে বর্ম্ম-পরিহিত যোদ্ধ-পুরুষ আরক্ত-নয়নে কানন-ভূমির রক্ষা সম্পাদন করিতেছে।

এইরূপে নানাবিধ পুষ্প কানন-ভূমির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সম্পাদনে তৎপর রহিয়াছে। নীরদা গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল,আর নির্দ্দয় হস্তে পুষ্পতরু হইতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিতেছিল। এমন সময় রাজীব সেই পুষ্পোদ্যানের সন্নিকটে নীরদার পুষ্প-চয়ন দেখিতে দাঁড়াইল।

নীরদা বলিল "রাজীবদাদা এত সকালে?"

রাজীব -"আসিতে নাই?"

নীরদা—"হাজারবার আসিবে—দাদা, বেঁচে থাক, তুমি জন্ম জন্ম আস।"

রাজীব—"নীরদা! শঙ্কর কোথায়?"

নীরদা—"বোধ হয় শুয়ে আছে।"

রাজীব—"নীরদা—এতদিন আমি তোমাদের বাড়ীতে আসিতেছি কিন্তু তোমার গান একদিনও ভাল করে শুন্‌তে পেলাম না।"

নীরদা—"এই কথা– একদিন গান করবো শুন—তার জন্য আর দুঃখ কেন?

রাজীব—"দুঃখ তার জন্যে বটে—তবে আরও কত দুঃখ "

নীরদা—"তা—রাজীবদাদা সে কথা ঠিক। তোমার মতন দুঃখী খুবই কম আছে, তোমরা কি ছিলে আর কি হয়েছ? তোমার মার কোন খবর পাও নাই?"

রাজীব শঙ্করের মাতার নিকট আপনাদের সব কথা বলিয়াছিল। নীরদা সেইজন্য রাজীবের দুঃখের সকল কথাই জানিত।

রাজীব—"তবু তুমি আমাদের দুঃখে কষ্ট পাইতেছ—নীরদা—এ সংসারে আমাদের দুঃখের কথা কেউ কাণেই করিতে চায় না।"

নীরদা—"সে কথাটা ঠিক—কে কার জন্য মরে বল।"

রাজীব নীরদার মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীরদা—"রাজীবদাদা, আজ তোমায় অমন ভাব দেখছি কেন? তুমি যেন কি ভাবিতেছ আর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি দেখিতেছ।"

রাজীব থতমত খাইল, বলিল—"না তা কিছু নয় তোমার মুখখানি বেশ সুন্দর—নারদা।"

নীরদা মনে মনে একটু চটিল। সেবারে রাজীবদাদার মান রাখিয়া কিছু বলিল না।

রাজীব—"চুপ করে রইলে যে? নীরদা—তোমার মুখের দিকে তাকাইলে কি দোষ আছে?"

নীরদা—"দোষ?—তুমি শত জন্ম চেয়ে থাক না, আমার তাতে গেল এল কি?"

রাজীব—"আর যদি আমি তোমাকে ভালবাসি?"

নীরদা—"আমি তোমার ছোট বোন ভালত বাস্‌তেই হয়। তবে, তুমি এখানে কদিনই বা আছ, একখানি চিঠির ওয়াস্তা, চিঠি আসিবে আর তুমি চলে যাবে।

রাজীব আপনার মনের ভাব নীরদাকে জানাইবার চেষ্টা করিতেছিল। নিরদা সেধার দিয়াই যাইতেছিল না। পাঠকগণকে বলিতে হইবে না যে রাজীব নীরদাতে মজিয়াছে। কিন্তু সেত বাল-বিধবা—

রাজীব। "নীরদা—সত্য সত্যই আমি যদি চলে যাই তাহা হইলে কি তোমার দুঃখ হবে ?"

নীরদা। "একটা পাখী উড়ে গেলে তার জন্য লোকের দুঃখ হয়, আর তুমি রাজীবদাদা এতদিন আমাদের বাড়ীতে আসিতেছ, দাদার সঙ্গে তোমার কত ভাব—তোমার জন্য দুঃখ হতেই পারে, আর তুমিও এখনই ত চলে যাচ্ছ না ?" নীরদা রাজীবের সঙ্গে কথা কহিতেছিল আর পুষ্প তুলিয়া সাজির ভিতর রাখিতেছিল।

রাজীব। "রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, তোমার সঙ্গে আর কথা কহা ভাল দেখাইতেছে না। তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।"

নীরদা। ভাই বোনে কথা কইছি, তাতে ভাল দেখাবে না কেন ? যে ভাল দেখিবে না, সে চক্ষু বুঁজিয়া যাইবে।

নীরদার কথায় রাজীবের একটু আনন্দ হইল, তাহার বোধ হইল নীরদার মন তাহার উপর পড়িয়াছে, তাই সে তাহাকে যাইতে মানা করিতেছে রাজীব সাহস পাইয়া বলিল,—"নীরদা,—তোমাকে একটী কথা বলিব—যদি তুমি যদি কাহাকেও না বল।"

নীরদা বলিল—"আমি বুঝিয়াছি।"

রাজীব ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বুঝিয়াছ নীরদা ?"

নীরদা। "তোমার টাকার বুঝি দরকার হইয়াছে—আমার কাছে তাই ধার চাইছ ? তা ভাই—তুমি ত জান আমার হাতে টাকাকড়ি কিছু থাকে না।"

রাজীব বলিল, "সে কথা নয়।"

নীরদা। "তবে তুমি এমন কি কথা বলিবে যে কাহাকেও আমার তাহা বলা উচিত নয় ?" নীরদা এই কথাগুলি বলিবার সময় কতকটা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল।

মনে পাপ ছিল বলিয়া পাপী রাজীব বলিল—"চুপ—চুপ অত চেঁচাইওনা, লোকে শুনিবে!"

নীরদা। "কথাটা কি তাই শুনিবে—তুমি আমাকে একটা কথা বলিতে চাহিতেছ, যা আমি কাহাকেও বলিব না—সে কথাটা যদি কেউ শোনে, তবে কি তোমার আর আমার মাথাটা কেটে ফেলবে?"

রাজীব বড়ই বিপাকে পড়িল, সে আপনার মনের ভাব নীরদাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিল; সে যে নীরদাকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছে তাহা বলিবার জন্য কতরূপ পন্থা অবলম্বন করিল, কিন্তু সকলই তাহার ব্যর্থ হইল। অত বাঁকা কথা নীরদার হৃদয়ঙ্গম হইল না।

রাজীব—আজ এই পর্য্যন্ত থাক, একেবারে আর বেশী বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়, মনে করিয়া শঙ্করের নিকটে গেল। নীরদা ফুল লইয়া গুণ্ গুণ্ শব্দে গান করিতে করিতে বাটী প্রবেশ করিল। নীরদা গাহিতেছিল—

রাগিনী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ভালবাস যদি শ্যাম।

চরণতলে পড়ে রব, জপিব তোমার নাম॥

তুমি বিনা রাধিকার কেহ আর নাই,

তোমার কারণে শ্যাম পাগলিনী রাই,

রাধিকার প্রাণ মন তুমি ঘনশ্যাম॥

নীরদার মা বলিল—"নীরদা—তোর সময় অসময় নাই? তোর গান এখন কে শুন্‌ছে?"

নীরদা। "আমি কি কারুকে শুনাবার জন্য গান করি, আমার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই গান করি।"

মাতা। "তা যা, ফুলের সাজি ঠাকুর ঘরে রেখে গান করতে হয় গান কর—কাজ করতে হয় কাজ কর।"

নীরদা ফুলের সাজী রেখে মাতাকে বলিল—"মা, এইবারে তুমি আমার গান শোন।"

মাতা। "আমার গান শোনবার সময় নেই, যা বাইরে তোর দাদা আছে, গান শোনে যদি শোনাগে।"

নীরদা দৌড়িয়া বাহিরে এল, দাদাকে গান শোনাবে বলে, হাসতে হাসতে বাইরে এসেই দেখে, রাজীব তখনও যায় নাই শঙ্কর গাঁজা সেজেছে, দুইজনে টান্‌ছে, গাঁজার গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে। নীরদা নাকে কাপড় দিয়ে বলিল—"দাদা, গন্ধ ছাড়লো, আর থাকে না। আমি তোমায় গান শোনাব বলে এলাম, আর তোমরা গাঁজা খাইতেছ।"

শঙ্কর। "যা—যা, বাড়ীর ভিতর যা।"

নীরদা। রাজীব দাদা—একটা ঠাকুরুণ বিষয় শুন্‌বে?

রাজীব তাই চায়—নীরদা যতক্ষণ চক্ষের সমক্ষে থাকে, ততক্ষণই ভাল।

রাজীব বলিল—"তোমার ইচ্ছা।" রাজীব শঙ্করের ভয়ে ঐরূপ ভাবে বলিল। তখন নীরদা শঙ্করের দিকে তাকাইল। শঙ্কর ভগিনীর উপর বড় একটা আঁটাআঁটি করিত না। কতকটা মাতার ভয়ে আর কতকটা নীরদার বৈধব্য অবস্থার জন্য শঙ্কর নীরদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিত না এবং যখন নীরদা বুঝিল শঙ্করের আপত্য নাই, তখন সে একটা শ্যামা বিষয়ের গান মনে করিতে লাগিল, এমন সময় জমীদারের বাড়ী হইতে একজন লোক আসিয়া বলিল,—"রাজীববাবু এখানে আছেন?"

রাজীব তাড়াতাড়ি গাঁজার হুঁকা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল— "হাঁ আছি—কেন ?"

"ম্যানেজার বাবু ডাকিতেছেন।" রাজীব—"যাইতেছি।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি শঙ্করের বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

৬

রাজীব ক্রমে ক্রমে বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল, কাজে একেবারেই মন দিত না। বাড়ীর কর্ত্তা একজন হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি গোবর্দ্ধনের উপরোধে রাজীবকে বাটীতে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রাজীবের স্বভাব চরিত্র মন্দ হইয়া যাইতেছে—তাঁহার কাণে উঠিয়াছিল। তিনি কোনও সময়ে গাঁজার গন্ধ পাইয়াছিলেন। ম্যানেজারবাবুর সহিত অনেকবার রাজীবের কথা লইয়া বকাবকি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ম্যানেজারবাবুকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। রাজীবকে কার্য্যে অমনোযোগী দেখিয়াও ম্যানেজার বাবু রাজীবকে কেন বিশেষরূপে শাসন করেন নাই, সেই কথা লইয়া ম্যানেজারবাবুকে বাড়ীর কর্ত্তা অনেক কথা শুনাইয়াছিলেন। ম্যানেজারবাবু কর্ত্তার নিকট রাজীবকে আর ওরূপভাবে কাজে অমনোযোগী হইতে দিবেন না বলিলেন, আর মনে মনে বলিলেন এইবার কোনদিন কাজে তাচ্ছিল্য করিতে দেখিলেই রাজীবকে একেবারেই কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে বলিবেন।

রাজীব প্রাতঃকালেই শঙ্করের বাড়ীতে গিয়াছিল, তাহার কাজ কে করিবে? পড়িয়া রহিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু রাজীবকে ডাকিয়া অনেক তিরস্কার করিয়া রাজীবকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এবং কর্ত্তার নিকট হইতে গোটাকতক টাকা রাজীবকে দিয়া তাহাকে বলিলেন— "রাজীব, তুমি এই বারটা টাকা নাও—তোমার জন্য আর আমি কত

সহ্য করিব —এই টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া দেশে চলিয়া যাও," রাজী-বের মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল সে যদিও আপনার দেশে যাইতে পাইল বটে তথাপি সে কোথায় যাইবে? কোথায় দেশ? কোন্ ষ্টেশনে যাইবে? কোথায় যাইলে দেশের ঠিকানা পাইবে? এই সমস্ত রাজীব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাবিয়া লইল এবং তাহার ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল. সে বলিল "ম্যানেজার বাবু আমি দেশ কোথায় জানিনা।"

ম্যানেজার বাবু—"দেশে' না যাইতে পার অন্য জায়গায় গিয়া কর্ম্ম কাজ দেখ"—ম্যানেজার বাবু রাজীবের কোন কথাই শুনিলেন না. রাজীব কাপড় চোপড় লইয়া ম্যানেজার বাবু ও আপনার কর্ম্মস্থলের পরিচিত বন্ধু বান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একবার পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর কাছে যাইল. পোষ্ট-মাষ্টার যদু বাবু রাজীবকে অনেক দিন দেখেন নাই। নানা কষ্ট নানা অত্যাচারে রাজীবের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাজীবকে দেখিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবুর মনে বড় কষ্ট হইল। রাজীব জানিত পোষ্ট মাষ্টার বাবু তাঁহাকে স্নেহ করেন, সেইজন্য তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"মাষ্টার মহাশয়, আমাকে ম্যানেজার বাবু কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন—নমস্কার, আমি চলিলাম।

যদুবাবু। "রাজীব তুমি কোথায় যাইবে?" রাজীব বলিল "একবার শঙ্করের সহিত দেখা করিতে যাইব মনে করিতেছি"—কিন্তু পরক্ষণে কি ভাবিয়া রেলওয়ের ষ্টেসনের দিকে চলিয়া গেল এবং যে স্থান হইতে সে পূর্ব্বে রেলে চড়িয়াছিল সেই স্থানের টিকিট ক্রয় করিবে মনস্থ করিল—

শঙ্করের ভগিনীর মুখ খানি কিন্তু রাজীবকে এত কষ্টের ভিতরও বড় কষ্ট দিতেছিল। কন্দর্প! তুমি ধন্য, দীনহীন, মলিন, দরিদ্র,

পর্ণ কুটীর বা বৃক্ষতলস্থায়ী হতভাগ্যের উপর তোমার যেরূপ আধিপত্য, পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-অলঙ্কার-সুসজ্জিত সুধা-ধবলিত বিশাল অট্টালিকাবাসী বহু ঐশ্বর্য্যশালী ভাগ্যবান নরপতিগণও সেইরূপ তোমার শাসনাধীন। তুমি হতভাগ্য, গৃহচ্যুত, কর্ম্মচ্যুত, অন্ন-বস্ত্র-হীন রাজীবের উপরও তোমার প্রভাবের মহিমা বিস্তার করিয়াছ, সেই জন্য রাজীব একবার শঙ্করের ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সচেষ্ট—কন্দর্প, তোমার মহিমা ধন্য।

রেলওয়ে ষ্টেসনে টিকিট ক্রয় না করিয়া রাজীব বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। এবং এখনও রেলগাড়ীর আসিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া একবার শঙ্করের বাড়ীতে যাইবে কিনা তাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া শঙ্করের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিল। রাজীবের বয়স এক্ষণে প্রায় ২১ বৎসর। এই বয়সেই সংসর্গ দোষে রাজীবের চরিত্র সর্ব্বতোভাবে কলুষিত হইতে বসিয়াছে। সুরাপান ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার নেশাই রাজীবের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। চরিত্র কলুষিত, চিত্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমূহ পরিবর্জ্জিত, হৃদয়—নীচ প্রবৃত্তি-মার্গে পরিচালিত, মস্তিষ্ক—মাদক-বিকৃত, দেহ—শীর্ণ, মুখ অন্যায় অত্যাচারে কালিমাজড়িত। রাজীব—এইরূপ অবস্থায় এক্ষণে উপনীত। সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য, লাম্পট্য-দোষ সহজেই রাজীবের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সে যতক্ষণ শঙ্করের গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিল, ততক্ষণই সে নীরদার বিষয় ভাবিতেছিল। নীরদা কি প্রকারে তাহার হস্তগত হইবে—সেই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে শঙ্করের বাটীর রাস্তায় না গিয়া অন্য রাস্তায় গিয়া পড়িল, এবং দেশ অপরিচিত থাকায় এদিক ওদিক ঘুরিতে

ঘুরিতে দুই প্রহর বেলা হইয়া দাঁড়াইল। তখন পর্য্যন্ত রাজীবের আহার হয় নাই। সে একটা দোকানে প্রবেশ করিল এবং তথায় বসিয়া জলযোগ করিতেছে এমন সময় সেই দোকানের সম্মুখে এক দ্বিতল গৃহের গবাক্ষের দিকে তাহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিল সেই বাটীর গবাক্ষ পথে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে দেখিল যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। নয়নে নয়ন সংলগ্ন হইলে সুন্দরী তাহাকে কি সঙ্কেত করিয়া সেই বাতায়ন হইতে সরিয়া গেল, রাজীব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সেই সুন্দরী পুনরায় সেই বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় রাজীবকে সঙ্কেত করিয়া সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইল। রাজীব দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল—"এবাটিটি কাহার?"

দোকানদার—"এই বাটী পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ গৌরহরি বলিয়া এক সুবর্ণ বণিকের কিছু টাকা ধার করেন আর সেই টাকার সুদ তস্য সুদ তস্য সুদ—এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সুদে আসলে টাকাটা বিস্তর হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় ব্রাহ্মণ পাগলের মত হইয়া যান। ব্রাহ্মণ যখন পুত্র শোকে জর্জ্জরিত সেই সময়ে গৌরহরি আপন টাকা আদায়ের জন্য ব্রাহ্মণকে বড়ই পেড়াপীড়ী করিতে থাকে। সকলেই তাহাকে ব্রাহ্মণের সেই কষ্টের সময়ে টাকা চাহিতে নিষেধ করে—গৌরহরি কাহার কথা না শুনিয়া ব্রাহ্মণের নামে নালিশ করে এবং কিছু দিন পরে ডিক্রীজারী করিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার বাসচ্যুত করে। ব্রাহ্মণেরও মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হয় নাই—তথাপি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহাকে আপনার

বাটী ছাড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে হইতেছে, তখন তিনি সুবর্ণ বণিকের টাকা শোধ করিবেন বলিয়া কিছুদিনের অবসর প্রার্থনা করিলেন. অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু গৌরহরি কিছুতে সম্মত হইল না। তখন সেই ব্রাহ্মণ সুবর্ণ-বণিকের দুটা পা জড়াইয়া ধরিলেন ব্রাহ্মণের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি গৌরহরিকে নিয়ে অনেক কান্নাকাটি করিতে লাগিল, গৌরহরি কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না—সজোরে ব্রাহ্মণের হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল। এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলাকে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে বলিল। তাহারা সরিয়া গেল না দেখিয়া সে একটা ছেলের গালে এমন এক চড় মারিল যে ছেলেটী সেইখানে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। এই কঠিন ব্যবহারে সকলের রাগের সীমা রহিল না—তাহারা সকলে মিলিয়া সুবর্ণ বণিককে রীতিমত প্রহার করিতে লাগিল, গৌরহরি গাধার ন্যায় চেঁচাইতে লাগিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণের যেন কতকটা জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় ব্রাহ্মণ সকলকে গৌরহরিকে মারিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন "ও পাপীকে স্পর্শ করিয়া কেন আপনারা আপনাদের দেহ অপবিত্র করেন? আপনারা আমার দুঃখে যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন তাহাতেই আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণোচিত উদারতা দেখাইয়া সুবর্ণ বণিক গৌরহরিকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন নতুবা প্রহারে তখনি গৌরহরির মৃত্যু হইত। ব্রাহ্মণ রোরুদ্যমানা সহধর্ম্মিণীর হস্ত ধরিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। সুবর্ণ বণিক প্রহারের কষ্ট তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গিয়া বাটী দখল করিল। সেই অবধি সুবর্ণ বণিক গৌরহরি এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকে। অল্পদিন হইল তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার এক বিধবা কন্যা একণে বাটীতে আছে। গৌরহরির স্ত্রী পূর্ব্বেই মরিয়া

[illegible]ছিল। গৌরহরি তাহার এক মাত্র পুত্র সুধীরকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়। সুধীর একদিন প্রয়োজন বশতঃ পিতার মুদ্রা [illegible] গুটিকতক টাকা লইয়া খরচ করিয়াছিল—পিতা যখন শুনিল [illegible] সেই মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে, তখন পিতা পুত্রে ঘোর গণ্ডগোল [illegible] গেল। পরে পুত্র পিতার প্রতি একটা জুতা নিক্ষেপ করিলে [illegible] পুত্রকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়। পুত্র সেই অবধি বাটীতে [illegible] আসে নাই। তাহার ভগিনী সুকেশী একলা বাড়ীতে থাকে [illegible] পিতার সমস্ত ধনের অধিকারিণী হইয়া মনের সুখে বাস করি-[illegible]ছে। কিন্তু তাহার জ্বালায় রাস্তা দিয়া লোক চলিতে পারে না। [illegible] লোকের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে সঙ্কুচিত হয় না। একজন দাসী ভিন্ন বাটীতে আর কোন লোক নাই। সে দাসীর [illegible] বাটীতে উপপতি আনয়ন করিয়া কাম-প্রবৃত্ত চরিতার্থ [illegible], আপনাকে দেখিয়া সে কতবার জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল, কত [illegible] করিল তাহা আপনি দেখিয়াছেন আমিও দেখিয়াছি। আপ-[illegible] বিদেশী দেখিতেছি—আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম। এই বাটীতে দুই একটা খুন পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—উপপতিদিগের মধ্যে [illegible] হইয়া মারপিট খুনখারাপী পর্য্যন্ত হইতে বাকি নাই। উহার একজন উপপতি এখনও জেলে রহিয়াছে"।

রাজীব সুবর্ণ বণিক দুহিতার রূপে মোহিত হইয়াছিল। সুকেশীর প্রেম লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু ঐ বাটীতে খুন-খারাপ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহার হৃদয়ের আগ্রহ কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিল। তখন সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী কোন দিকে বলিতে পারেন?"—

দোকানদার বলিল—"যাহার [illegible]র সম্মুখে বেশ একটা ফুলের বাগান আছে?"

রাজীব—"হঁ।"

তখন দোকানদার রাজীবকে শঙ্করের বাটি যাইবার পথ বলিয়া দিল।

শঙ্করের বাটীর ভিতর নীরদা গান করিতেছে মাতা আর দুই পাঁচ জন স্ত্রীলোক নীরদার গান শুনিতেছে নীরদা তাহার মাতার নিকট ঠাকুরদের গানই প্রায়। গায় আজও শ্যামা বিষয়ক গান করিতেছিল—সে গাহিতেছিল—

রাগিনী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

"মা তোর চরণতলে—কেন গো পড়িয়ে শঙ্কর,
তোর চরণ কি গো কল্পতরু তাই সে মাগে বর?
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল—
পায় কি শ্যামা যে তোর পড়ে চরণতল?
নহিলে কেন মৃত্যুঞ্জয়—শবরূপে পড়িয়ে রয়,
তোর চরণ—পাবার কারণ
যেন পাগল মত বিশ্বেশ্বর?

নীরদার গান শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিল, তখন পাড়ার একজন যুবতী একটি বিদ্যাসুন্দরের গান শুনিতে চাহিল।

নীরদা বলিল—"আপদ্ আরকি। বিদ্যাসুন্দরের গান কি ঠাকুর ঠাকুরাণীর গান হইতে ভাল? তবে যদি নিতান্ত শুনবে ত শোন সকলে হাসিতে লাগিল—নীরদা হাসিতে হাসিতে একটি গান মনে করিতে লাগিল কিছু পরে গাহিল—

কি বলিলি নাতিনী তুই রূপে মজেছিস্।
ওলো তুই রূপে মজেছিস্ তুই রূপে মজেছিস্।
নাগরের রূপ দেখে তুই প্রাণের ভিতর আগুন জ্বেলেছিস—
ওলো তুই আগুন জ্বেলেছিস ॥
দিন রাতে তোর নাইক সুখ,
ঝরছে নয়ন ফাট্‌ছে বুক,
নাতিনী লো তোর ফাটছে বুক।
নাগর এনে দিতে হবে, তাই আমার পায়ে ধর্‌তেছিস ॥
আমার তুই পায়ে ধর্‌তেছিস ॥
মনের ভিতর প্রেমের বিষ কেন পুষেছিস।
তুই কেন পুষেছিস প্রেমের বিষ তুই কেন পুষেছিস্ ॥
(আচ্ছা) আনব নাগর রূপের সাগর,
আমাকে তুই কি মনে করেছিস ?
নাতিনী লো তুই কি মনে করেছিস ॥
আমি সাগর ছেঁচে মাণিক আনব, তুই কেন ভয় পেতেছিস ?
তুই কেন ভয় পেতেছিস ॥

তখন সকলে বাহবা দিতে থাকিল, বাড়ীর ভিতর একটা গোল-মাল চলিতেছে এমন সময় রাজীব ডাকিল "শঙ্কর বাড়ী আছ।

নীরদা চীৎকার করিয়া উঠিল—"বলিল কেগ,"—বালিকার যেমন স্বভাব। কাহাকে গ্রাহ্য করিতে চায় না। সকলের আগেই সে বলিয়া উঠিল,—"কে গা"

রাজীব—"আমি রাজীব"

তখন নীরদা মাকে বলিল 'রাজীব দাদা এসেছে" নীরদার মাতা বলিল—'রাজীবকে বাটীর ভিতর আনগে যা"

তখন নীরদা এক দৌড়ে বাহিরে গেল, তাহার মাথায় কখনই কাপড় থাকিত না, দৌড়িবার জন্য বক্ষস্থল হইতে বসন সরিয়া পড়িয়াছিল—এই অবস্থায় নীরদা রাজীবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রাজীব নীরদার প্রাতঃকালের গানগুলি শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে নীরদা তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঐ গান গাহিয়াছিল, তাহাতে নীরদার প্রেম লাভের আশা রাজীবের প্রাণকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে নীরদাকে ঐ রূপ বেশে আসিতে দেখিয়া রাজীবের প্রাণ একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। সে নীরদাকে আপনার বক্ষে ধরিবে এইরূপ মনোমধ্যে করিতেছে এমন সময়ে নীরদার মাতা সেই খানে আসিলেন এবং রাজীবের শুষ্ক মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজীব তোমার মুখ এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন ?"

রাজীব বলিল—"বলিতেছি, শঙ্কর কোথায় ?" "শঙ্কর বেড়াইতে গিয়াছে, এখনি আসিবে।"

রাজীব বাড়ীর ভিতর আসিল। পাড়ার মেয়েরা বেলা গিয়াছে, যাই বলিয়া একে একে সকলে চলিয়া গেল। নীরদার মাতা রাজীবকে বসিবার জায়গা দিয়া রাজীবকে পুনর্ব্বার তাহার মুখ শুকাইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে আদ্যোপান্ত সেইদিন যাহা যাহা ঘটিয়াছে বিবৃত করিয়া বলিল "আমি বাড়ী যাইতেছিলাম কিন্তু বাড়ী যাইতে হইলে কোথাকার টিকিট কিনিতে হয় তাহা জানি না। ষ্টেশনে গিয়াছিলাম—গাড়ী আসিবার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্করের সহিত একবার শেষ দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। পথ ভুলিয়া অন্য দিকে চলিয়া যাই। সমস্ত দিন আহার হয় নাই। কিছু জলযোগ করিয়াছি। পথ মা[illegible] এখানে আসিতে বেলা গেল। আমি আজই যাইব, শঙ্কর আসিলে হয়।

নীরদা বলিল—"সন্ধ্যা হইয়াছে আজ আর যাইবার প্রয়োজন নাই। আজ রাত্রে এখানে থাক" এমন সময়ে শঙ্কর আসিল। শঙ্করের অতিশয় জ্বর হইয়াছে মুখ চোক জ্বরে লাল হইয়াছে দেখিয়া শঙ্করের মাতা বড়ই ভীতা হইলেন বলিলেন "শঙ্কর একি ? কখন জ্বর হইল ?" শঙ্কর কোন কথা না কহিয়া গৃহাভ্যন্তরে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং জ্বরের যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। শঙ্করের এরূপ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া শঙ্করের মাতা শঙ্করের নিকটে গিয়া বসিলেন এবং রাজীবের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য নীরদাকে উপদেশ দিলেন। নীরদা ও রাজীবের মাতা ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, রাত্রে কিছুই আহার করেন না; শঙ্করের অসুখ হইয়াছে কাজেই কেবল রাজীবের জন্য পাক করিতে হইবে, এইজন্য নীরদা রাজীবকে বলিল "রাজীব দাদা, রাত্রে কিন্তু বাজার হইতে জলখাবার আনাইয়া দিব তাই খাইও আর তোমার একজনের জন্য পাক করিতে পারিব না।" নীরদা কাজ করিতে বড়ই ভয় পাইত।

রাজীব আর কি বলিবে তাহাতেই সম্মত হইল। নীরদা বাঁচিয়া গেল। সে তখন পা মেলিয়া রাজীবের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নীরদা নির্লজ্জার অগ্রগণ্যা ছিল, সে যখন রাজীবের সঙ্গে কথা কহিতে ছিল, রাজীবের চক্ষু একবার নীরদার অর্দ্ধোন্মুক্ত পীনস্তনের উপর পতিত হওয়ায়, নীরদা বক্ষঃস্থলের কাপড় সামলাইয়া কথা কহিতে লাগিল; কিন্তু রাজীবের শিরায় শিরায় অতি দ্রুতবেগে শোণিত ছুটিতে ছিল। সে নীরদাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ভয়ে অতি কষ্টে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি সম্বরণ করিতেছিল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত হইল। নীরদা রাজীবকে দিয়াই জলখাবার

আনাইয়া রাজীবকে খাওয়াইল। পরে রাজীব শঙ্করকে একবার দেখিতে গেল। এতক্ষণ নীরদার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় সে শঙ্করের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার ভয় হইল। দেখিল শঙ্কর জ্বরের প্রকোপে অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মাতা ব্যাকুল মনে শঙ্করকে বাতাস করিতেছেন। রাজীব শঙ্করকে দুই একবার ডাকিল, উত্তর পাইল না, রাজীব তখন রাজীবের মাতার নিকট বসিল এবং অতি মৃদুস্বরে দুইজনে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

রাজীব বলিল "শঙ্করের কাছে আপনাকে সমস্ত রাত্রই থাকিতে হইবে দেখিতেছি। উহাকে ফেলিয়া আপনি যাইবেন না।"

মাতা—"না আমি আজ রাত্রে শঙ্করের নিকটই থাকিব, তুমি বৈঠকখানা ঘরে শোওগে" নীরদা যেঘরে শুইত রাজীব তাহা জানিত নীরদার মাতার কথায় রাজীব বুঝিল যে, আজ রাত্রে নীরদাকে একাকী তাহার ঘরে শুইতে হইবে। রাজীব নীরদার মাতার নিকট বিদায় লইয়া বৈঠকখানায় গেল, তথায় আপনার কাপড়ের পুঁটুলি রাখিল। এবং কতক্ষণ কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে নীরদার ঘরে প্রবেশ করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রহিল।

নীরদা শঙ্করের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে ঘরে আসিয়া একখানা বই লইয়া প্রদীপের কাছে বসিল। তৎপরে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। সে আবার উঠিয়া আসিয়া একটা কাপড় সেলাই করিতে লাগিল; পরে তাহাও ভাল লাগিল না পুনরায় কেতাব লইয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল কিছু পরে পরিধানের কাপড় ছাড়িয়া একখানা ছোট রাত্রিবাস পরিয়া বিছানায় যাইয়া বসিল। অনতিদীর্ঘ রাত্রিবাস পরিধান

[illegible] নীরদার বক্ষঃস্থল অনাবৃত হইয়া পড়িল। বস্ত্রাঞ্চল দৈর্ঘ থাকায় কটিদেশ ছাড়াইয়া উঠে, পীন পয়োধর যুগল আবরণ করিতে সমর্থ হইল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি নীরদার আদরের বিড়াল ছিল। তখন নীরদা আপনার আদরের বিড়াল লইয়া কখন বক্ষে ধারণ, কখন বা তাহার মুখ চুম্বন, কখন বা গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিল। আবার তাহাকে কখন বা নানারূপ ভঙ্গীতে নাচাইতেছিল। রাজীব গোপনে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছিল। এদিকে শঙ্করের [illegible] নাসিকাধ্বনি নীরদার ঘর হইতে শোনা যাইতেছিল।

শঙ্কর অচৈতন্য, নিদ্রায় পড়িয়া আছে। রাজীব তাহা জানিত, সুবিধা পাইয়া রাজীব ধীরে ধীরে আপন স্থান হইতে বাহির হইল এবং নীরদার পশ্চাদ্দেশে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। নীরদা সম্মুখের দেওয়ালে মানুষের ছায়া পড়িয়াছে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে মুখ ফিরা-ইয়া দেখিল রাজীব। রাজীবকে দেখিয়া নীরদার ততটা ভয় হইল না। কিন্তু অঙ্গে বস্ত্র না থাকায় স্ত্রী-সুলভ লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। যতদূর ব্যাপিকা বা নিলজ্জা হউক না কেন স্ত্রীজাতি পর-পুরুষ সম্মুখে অনাবৃত দেহে থাকিলে লজ্জা না আসিয়া থাকিতে পারে না। তখন নীরদা তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া রাজীবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। এবং অতি তীব্রস্বরে রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিল। "রাজীব দাদা! তোমার এ ব্যবহারটা কি রকম? তুমি এতরাত্রে আমার ঘরে কেন? দরজা বন্ধ রহিয়াছে, আমার আসিবার পূর্ব্ব হই-তেই তুমি ঘরে আসিয়া লুকাইয়া রহিয়াছিলে আমাকে কি বাজারের বেশ্যা মনে করিয়াছ? আমি তোমার সম্মুখে বাহির হই, তোমাকে ভাইয়ের ন্যায় দেখি, তোমার কিন্তু আমার ঘরে এই রকমে লুকাইয়া থাকিতে লজ্জাবোধ হইল না।"

নীরদা যখন এইরূপে ক্রোধ-বিস্ফারিত-নয়নে তীব্র বাক্যে রাজীবকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, রাজীবের আর তখন মুখে কথা সরিল না, সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, নির্লজ্জা মুখরা ব্যাপিকা নীরদাকে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি বুঝিতে পারিয়া তাহার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে মনে মনে করিতে লাগিল। সে দেখিল নীরদার সেই চঞ্চল ভাব আর নাই, তাহার স্থানে গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার ক্রোধ-জনিত অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরণ সন্দর্শন করিয়া, রাজীবের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভয় বিস্ময় জড়িত কিরূপ এক ভাবের উদয় হইল। এবং বালিকার শ্লেষ-বাক্যে লজ্জায় রাজীব অধোবদনে রহিল।

নীরদা বলিতে লাগিল—"তোমাকে আমরা দাদার বন্ধু বলিয়া গৃহে স্থান দিয়াছিলাম, তাহার কি এই পুরস্কার? তুমি আমার পর-কাল নষ্টের চেষ্টায় গৃহমধ্যে লুকাইয়াছিলে? তোমাকে আমি আর কি বলিব। তুমি বাঙ্গালীর মেয়ের মনের ভাব কি জাননা? তুমি কি জাননা যে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে সতীত্ব ছাড়া আর কিছুই জানে না। সতীত্বের বিনিময়ে বহুমূল্য নিজের জীবন হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাকি তুমি জাননা? তুমি আমার উপর জোর প্রকাশ করিতে আসিলেই আমি মরিতাম। যতক্ষণ এ শরীরে সামান্য মাত্র বল থাকিত, ততক্ষণ তুমি আমার সতীত্ব কখনই নষ্ট করিতে পারিতে না। তোমার জোরে না পারিতাম আমি তোমার সম্মুখে যখন নিজের প্রাণ বাহির করিতাম তখন বুঝিতে নির্লজ্জ ভাবিয়া যাহাকে অসতী মনে করিয়াছিলে, সেই নির্লজ্জ নীরদা সতীর অগগণ্যা, সে কখন মৃত-পতির প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু ধ্যান করে নাই মৃত-পতির ক্রোড় পাইবে বলিয়া সে দিবানিশি ব্যাকুল-মনে শেষের

সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছে, রাজীবদাদা, তুমি যে আমার বড় ভাই, তোমার যে আমি কনিষ্ঠ সহোদরা, তুমি জ্যেষ্ঠ সহোদর হইয়া সহোদরার সতীত্ব নাশ করিতে সংকল্প করিয়াছিলে? তুমি কি জাননা দেবতা সতার পরম সহায়। অধোবদনে রহিলে যে?

রাজীব। "নীরদা, আমার অপরাধ হইয়াছে আর লাঞ্ছনার প্রয়োজন নাই। নীরদা বল আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছ? তুমি মার্জ্জনা না করিলে আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ বাহির করিব, তুমি আমাকে মাপ কর।"

নীরদা। "রাজীবদাদা, তোমাকে আমি বড় ভাইয়ের মত জ্ঞান করিতাম। তোমাকে মাপ করিলাম এ কথা মুখ হইতে বাহির করিতে পারিব না। তুমি যাও, না হলে মা হয়ত জানিতে পারিবেন। দাদা পরে জানিলে তোমার উপর মহাক্রোধ করিবেন। তুমি চুপি চুপি বৈঠকখানায় যাইয়া শোও। প্রাতঃকালে যাহা ইচ্ছা করিও, আমি কিন্তু তোমার মুখ আর দেখিব না।"

রাজীবের লজ্জা, ঘৃণার আর শেষ রহিল না। রাজীব ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিয়া বৈঠকখানায় গেল এবং জীবনের অতীত ও বর্ত্তমান ভাবিতে ভাবিতে রাজীবের হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল। ভবিষ্যৎ ভাবিতে রাজীবের সাহস হইতেছিল না। সে অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, এইরূপে প্রভাত হইল। রাজীব কতক্ষণ পরে শঙ্করের মাতার নিকট বিদায় লইল। শঙ্করের তখন জ্ঞান হইয়াছে, রাজীব শঙ্করকে দুই এক কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং যে স্থান হইতে পূর্ব্বে রেলে চড়িয়াছিল, সেইখানের টিকিট ক্রয় করিবার মনস্থ করিল। রাজীব আসিবার সময় মনোযোগের

সহিত সেই ষ্টেশনের নামটী দেখিয়া লইয়াছিল. এক্ষণে সেইখানে যাইবার টিকিট ক্রয় করিবে মনস্থ করিতেছিল। ইচ্ছা—সেই ষ্টেশনে নামিবে। পরে বাগান-বাটীর ভিতর দিয়া চিত্রা-নদীর ধারে আসিয়া বসিয়া থাকিবে। নৌকার সুযোগ হইলেই সেই নৌকায় চড়িয়া রাম-নগরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিবে। রাজীব আসিতে আসিতে ভুলক্রমে ষ্টেশনে যাইবার রাস্তায় না যাইয়া অন্য রাস্তা ধরিয়াছিল এবং যাইতে যাইতে পূর্ব্বদিন যে ময়রার দোকানে জলযোগ করিয়াছিল, দেখিল সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পুনরায় সে সেই ময়রার দোকানে চলিল. সুন্দরী সেই সময়ে সেখানে ছিল না। রাজীব কি ভাবিয়া সেই দোকানে গিয়া বসিল। বসিয়া থাকবার কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সুবর্ণ-প্রতিমা—সেই [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল। রাজীব মুখ তুলিয়া তাহার দেখিল, যেন নব কলেবরে কনক-চম্পক দাম-রাশীকৃত অব[illegible] রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! আজানুলম্বিত কেশরাশি নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে কুঞ্চিত-কেশদাম [illegible] না স্কন্ধদেশ অতিক্রম করিয়া স্তন যুগলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। রাজীব দেখিল. দেখিয়া তাহার মন কন্দর্পশরে জর্জ্জরীভূত হইল। যুবতীও রাজীবের রূপে মুগ্ধ হইয়াছে বুঝা যাইতেছিল। সে কিছুক্ষণ পরে দাসী পাঠাইয়া দিল। দাসী দোকানে আসিয়া কিছু কিনিবার জন্য এদিক ওদিক করিয়া রাজীবকে বাটীতে যাইতে সঙ্কেত করিল। দোকানে তখন একটী অল্পবয়স্ক বালক দোকান আগলাইতেছিল। রাজীব তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এবং রাস্তায় কোন লোকজন যাইতেছে না সন্দর্শন করিয়া ত্বরিতগতিতে সেই রমণীর বাটীতে প্রবেশ করিল।

রমণী অতি যত্নে রাজীবের হাত ধরিয়া একটী কক্ষে লইয়া গেল।

এবং রাজীবের কাপড়-চোপড় দাসীকে রাখিতে দিল। রাজীব যে কিছু টাকা কর্ম্মস্থল হইতে পাইয়াছিল, তাহা নিজের কাছেই রাখিয়া দিল। রাজীব মুখ-হাত ধুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বেলা বাড়িলে রমণী বাটীর ভিতরেই রাজীবের স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিল; রাজীব স্নান করিল। রমণীও কিছুপরে স্নান করিয়া রাজীবের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। রাজীব জাতিতে কায়স্থ সে সুবর্ণ-বণিকের বাটীতে খাইবে না স্থির করিল, অথচ রমণী পাছে অসন্তুষ্ট হয়, সেইজন্য মুখে কিছু বলিতে পারিতেছিল না—রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা ?"

রাজীব—"কায়স্থ।"

রমণী—তবে কি আপনি আমার বাটীতে অন্য কিছু আহার করিবেন না ?, যদি অন্ন আহারে বাধা থাকে ত দোকান হইতে জল খাবার আনাইয়া দিই।

রাজীব ইহাতে সম্মত হইল। এবং তৃপ্তি-সহকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া, রাজীব সেই গৃহস্থিত শয্যায় শুইয়া পড়িল। বলিল, "কাল রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই, আমি একটু শুইয়া থাকি।"

রমণী—"বেশ আপনি নিদ্রা যান আমি নিজের আহারাদির বন্দোবস্ত করিগে—আমি আসিবার পূর্ব্বে আপনি চলিয়া যাইবেন না।" রাজীবকে ও কথা বলার আবশ্যক ছিল না, সে সাগ্রহে সম্মতি প্রদান করিল।

রমণী কিছুক্ষণ জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। রাজীবের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন প্রায় বেলা ২টা হইবে। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল রমণী শয্যায় বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে, রমণীর হস্ত হইতে ব্যজন লইয়া রাজীব রমণীকে ব্যজন করিবে এমন সময়

রমণী একটু সরিয়া বসিল—ধন্য স্ত্রীলোক, ধন্য তোমার চাতুরীজাল! সরিয়া বসিলে রাজীব কিছু অপ্রতিভ হইল। তখন রমণী হাসিতে হাসিতে রাজীবকে কপট ভালবাসা দেখাইতে লাগিল। সংসার-ব্যবহারানভিজ্ঞ রাজীব, রমণীর কপট-প্রণয়ে গলিয়া গেল। তখন দুইজনে দুইজনকে কত আদরের কথা বলিল, যেন দুইজনের কত দিনের প্রণয়। রাক্ষসী রাজীবকে রূপে মুগ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে রাজীব রমণীর সুধামাখা কথায় একেবারে গলিয়া গেল।

তখন রমণী একটা আল্‌মারী খুলিয়া মদের বোতল বাহির করিয়া মদ ঢালিতে লাগিল। এবং এক কাচপাত্রে সুরা জল-মিশ্রিত করিয়া রাজীবের মুখে ধরিল। রাজীবের এই প্রথম মদ্য পান—মদ্যের গন্ধে রাজীব নাক সিঁটকাইল। মুখ ফিরাইল। রমণী কিন্তু ছাড়ে কই? রাজীবের পার্শে বসিয়া রাজীবের কর্ণে সুধামাখা প্রণয় গীতি শুনাইতে শুনাইতে মায়াবিনী সুরাপাত্র রাজীবের মুখের নিকট ধরিল, বলিল, “লক্ষ্মী আমার, ঢক্‌ করে খেয়ে ফেল, পরে আমোদের শেষ থাকিবে না, দেখবে তখন কত আমোদ এই দেখ আমি খাইতেছি”—এই বলিয়া সুকেশী সেই কাচপাত্র বিম্বাধরে ধরিল এবং সহজে তাহা হইতে কতকটা মদ খাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“তুমি পুরুষমানুষ, আমি মেয়েমানুষ, আমি যাহা সহজে খাইতে পারিলাম, তুমি পুরুষমানুষ হইয়া তাহাতে ভয় পাইতেছ, মদ না খাইলে আনন্দই হইবে না”—নির্ব্বোধ রাজীব আর থাকিতে পারিল না, সমস্ত সুরা ক্রমে ক্রমে

গলাধঃকরণ করিল। রমণী পুনরায় বোতল হইতে সুরা পাত্রে ঢালিয়া অম্লানবদনে তীব্র সুরা গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। রাজীবকে অধিক দিল না। রাজীবের মুখখানি তখন সুকেশীর বড় ভাল লাগিতে লাগিল; সে পদ্মপলাশ-নেত্র বিস্ফারিত করিয়া রাজীবের সুন্দর বদনখানি দেখিতে লাগিল। রাজীব এমন সুন্দরী খুব কম দেখিয়াছিল—সুরা তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করায় দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল—সুকৃষ্ণ ভ্রমরপংক্তি স্থল-কমলকে বেষ্টন করিলে যেমন সুন্দর দেখায়, সুকেশীর আলুলায়িত কেশগুচ্ছ গণ্ডদেশে পতিত হওয়ায় সুকেশীর বদনমণ্ডল সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাজীব সতৃষ্ণনয়নে সেই মুখখানি দেখিতে দেখিতে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছিল। তখন রমণী রাজীবকে বলিল—"তোমার নাম"—এতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিচয় লইবার সুবিধা হয় নাই—"রাজীব"

সুকেশী—"তোমরা?"

রাজীব—"কায়স্থ"

সুকেশী—"বাড়ী?"

রাজীব—"চিত্রগ্রাম।"

সুকেশী—"সে কোথায়?"

রাজীব—"অনেক দূর।"

সুকেশী—"তবে তুমি বিদেশী?"

রাজীব—"হাঁ।"

সুকেশী—"বিদেশী হও, আর স্বদেশী হও, তোমার মুখখানি বড় আমার ভাল লেগেছে—তোমার বিবাহ হয়েছে ভাই?"

রাজীব—"না।"

সুকেশী—"তুমি কাপড়-চোপড় লইয়া কোথায় যাইতেছিলে ?"

রাজীব—"দেশে।"

সুকেশী—"আজই ?"

রাজীব—"আজই।"

সুকেশী—"তোমাকে আমি দেশে যাইতে দিব না।"

রাজীব—"দেশে আমার মা ও ভগিনী আছে, নতুবা আমারও যাইবার আবশ্যক ছিল না।"

সুকেশী—"আমার ঢের টাকা আছে, তোমাদের প্রতিপালন করিব। এখানে তাঁহাদের আনিয়া প্রতিপালন করিব।"

অপরিপক্ক-বুদ্ধি রাজীব সুরাপানোন্মত্ত। কুচরিত্রা সুকেশীর কথা সত্য বলিয়া মনে করিতেছিল। তখন সে সুকেশীর আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করিতে করিতে সুকেশীর কথার উত্তর প্রদান করিবে, এমন সময়ে দ্রুত-পদ-শব্দ দুইজনের কর্ণগোচর হইল—দুইজনে সাবধানে বসিয়া কে আসিতেছে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দাসী ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকেশীর কাণে কাণে কি বলিল—সুকেশীর মুখ ভয়ে শুকাইল; [illegible] মস্তিষ্ক কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—সে দাসীকে বলিল—"কেন, সে যে আজ তিন দিন আসিবে না বলিয়া গিয়াছে, শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়াছিল, এখনি আসিল ?" "হাঁ, এখনি আসিল, আমি তাহাকে স্তোক দিয়া নীচে রাখিয়া আসিয়াছি। বলিয়াছি, তুমি বাড়ীতে নাই এখনি আসিবে।" এমন সময়ে একজন লোক টলিতে টলিতে উপরে উঠিতেছে দেখা গেল—তখন সুকেশী মহাব্যস্ত হইয়া যে ঘরে বসিয়াছিল সেই ঘরের দরজায় বাহির হইতে শিকল উঠাইয়া দিয়া সেই লোকটীর নিকটে আসিল। লোকটীর নাম অনুকূলবাবু—সেইখানেই বাটী,

জাতিতে কলু—তৈল বিক্রয় করিয়া অনেক পয়সা করিয়াছিল। অনুকূলবাবু সুরাদেবীর প্রিয় শিষ্য—সে মদ খাইলে তাহার জ্ঞানগোচর থাকে না।—উপপতিগণের মধ্যে সুকেশীর নিকট অনুকূলবাবুর বড় মান কেননা অনুকূলবাবুর পয়সা অনেক। আজ সংসারে প্রায় সর্ব্বত্র যাহা ঘটিতে দেখা যায় সুকেশীর নিকট তাহাই ঘটিয়াছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অনুকূলবাবু মদ খাইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন আর বলিতেছেন "হাঁউ মাঁউ খাঁউ পুরুষের গন্ধ পাঁউ ঘরে কে বাবা বল?" সুকশী অনুকূলবাবুকে জানাইয়াছিল সে অন্য উপপতির আর মুখ দেখে না। আর মনে মনে সুকেশী অনুকূলবাবুকে কিছু ভালও বাসিত। অনুকূলবাবু, সুকেশীর টাকা-কড়ি থাকিলেও প্রায়ই নানারূপ ভাল ভাল জিনিসপত্র আনিয়া সুকেশীকে দিত ও সময়ে সময়ে টাকা-কড়িও দিয়া থাকিত। এক্ষণে অনুকূলবাবু নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পুরুষের গলার আওয়াজ পাইয়াছিল। রাজীব সেই নুতন মদ খাইয়াছে সে গলার আওয়াজ সামলাইতে পারিতেছিল না। তখন মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অনুকূল হাতের ছড়ি উঠাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং সুকেশীকে বলিল "বাবা, পুরুষের গন্ধ পাইতেছি ঘরে কে আছে বল?" এই বলিয়া সুকেশীকে মারিতে গিয়া নিজে সবেগে মেজের উপর পড়িয়া গেল এবং ঘোর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দাসী মুখে জল দিতে লাগিল। এমন সময়ে সুকেশী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাজীবকে বাটী হইতে চলিয়া যাইতে বলিল—"রাজীববাবু তুমি ভাই শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও নতুবা একটা মহাপ্রলয় হইবে।"

রাজীবের চক্ষু কপালে উঠিল—দুই মিনিট পূর্ব্বে সুকেশী তাহাকে

তাহার মাতাকে ও ভগ্নীকে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এখনি আবার সুকেশী তাহাকে বাড়ীর হইতে বাহির করিয়া দিবার যত্ন করিতেছে। রাজীব সুকেশীর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি বলিতেছ আমাকে এখনি যাইতে বলিতেছ?"

সুকেশী—"হাঁ ভাই তুমি শীঘ্র শীঘ্র পালাও নতুবা আমার প্রাণও বাঁচিবে না -পরের জন্য আমি মরি কেন?" এই বলিয়া সুকেশী রাজীবের হাত ধরিয়া একেবারে তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। রাজীবের কাপড়-চোপড় সমস্ত পড়িয়া রহিল। রাজীব অল্পই মদ খাইয়াছিল যেটুকু নেশা হইয়াছিল কয় মিনিটের ঘটনায় তাহা ছুটিয়া যাইতে বসিয়াছিল

দোকানদার রাজীবকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল "মহাশয় ঐ বাটীতে যাইতে ছাড়েন নাই যে দেখিতেছি। আমি আপনাকে বিদেশী দেখিয়া সাবধান করিয়া দিলাম। সে যাহা হউক কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।"

রাজীব লজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে অনুকূলবাবু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সুকেশীর ঘর খুঁজিল কিন্তু কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। সুকেশীর মদের বোতলটী খালি করিতে করিতে সুকেশীর প্রতি অনুরাগ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। পুরুষ তুমি না আপনাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাক? তুমি বল আপনার বুদ্ধিবলে পঞ্চভূতকে করতলে আনিয়া জড়-জগতের উপর কর্তৃত্ব করিতেছ? তুমি উত্তাল-তরঙ্গময় বিশাল সাগরকে না খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছ? গগনস্পর্শী পর্ব্বত-শৃঙ্গে বাষ্পরথে অবলীলাক্রমে আরোহণ করিয়া আপনার বিশ্ব-বিজয়িনী

ইচ্ছার না পরিচয় দিয়া থাক ? সেই বিশ্ব বিজয়িনী বুদ্ধিবলে পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া তুমি না বৈদ্যুতিক-রথে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবার কল্পনা করিতেছ ? অধিক কথা কি, সমস্ত জড়-জগতকে তুচ্ছ করিয়া যোগবলে তুমি স্বয়ং ভগবানকে তাঁহার সিংহাসনচ্যুত করিতেও পশ্চাৎপদ হও না। কিন্তু হে পুরুষ-প্রবর, তোমার সেই বুদ্ধি সেই বিশ্ব-ব্যাপিনী বুদ্ধি রমণীর কুশাগ্র বুদ্ধির নিকট সর্ব্বদাই নতশিরে পরাজয় স্বীকার করিবে। তোমাকে রমণীর আধিপত্য মধ্যে চিরদিনই কর প্রদান করিয়া আসিতে হইবে।

রাজীব হতাশ-হৃদয়ে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তখনও তাহার নেশা একবারে ছুটে নাই, মুখে মদের গন্ধ রহিয়াছিল, কাজেই তাহাকে সতর্কে পথ দিয়া যাইতে হইতেছিল। ষ্টেশনে যাইতে যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ষ্টেশনে আসিয়া রাজীব শুনিল গাড়ী বাহির হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাকে সে রাত্রি ষ্টেশনে থাকিতে হইল। সে অনাহারে বিনা শয্যায় ষ্টেশনের একধারে পড়িয়া রহিল। সে আপনার অধঃপতনের বিষয় এক একবার ভাবিতেছিল। কিন্তু সকল নেশা অপেক্ষা যে মদের নেশা অধিক আনন্দ-প্রদায়িনী তাহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না।

ত্রিপুরাসুন্দরীর কষ্টের অবধি নাই তিনি একবারে শয্যাগতা হইয়া প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইয়াছেন।

কোন প্রকারে হরিমোহনবাবুর শিশু পুত্রকে লালনপালন করেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার বিশেষ ক্লেশকর হইয়া উঠিতে

লাগিল। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে হয়। চারুবালা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিল। ভৈরব মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যায়। হরিমোহনবাবু সকল দেখিয়া শুনিয়া একদিন প্রাতে ত্রিপুরাসুন্দরীকে বলিলেন "তোমাদের আর আমার রাখা হয় না। আমার যে কার্য্যের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম সেই কার্য্যই যদি তোমার দ্বারা না চলে তবে তোমাকে রাখিয়া ফল কি? তুমি অদ্যই এখান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইও আমি অন্য লোকের অনুসন্ধান করিয়াছি।"

রাজার চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধনের একদিকে মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী চারুবালাকে লইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছেন তাহা তাহার অসহ্য হইয়াছিল। সেইজন্য সে ত্রিপুরাসুন্দরীকে অধিকশালা হইতে এমন কি রামনগর হইতেই তাড়াইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু হরিমোহনবাবুর তাহাতে অতিশয় অসুবিধা হইবে। তজ্জন্য হরিমোহনবাবু ঐ বিষয় সম্বন্ধে সহসা গোবর্দ্ধনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। গোবর্দ্ধন এই জন্য একজন ব্রাহ্মণের কন্যার অনুসন্ধানে ছিল এবং নানা স্থান অনুসন্ধানের পর সেই স্ত্রীলোকটীকে হরিমোহনবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। এদিকে ত্রিপুরাসুন্দরীও দিন দিন বাতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। হরিমোহনবাবু ত্রিপুরাসুন্দরীকে বাটী হইতে তাড়াইবার সুযোগ পাইলেন এবং গোবর্দ্ধন তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে বুঝিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে বাটী হইতে বিদায় হইবার আদেশ দিতেছিলেন। ত্রিপুরা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলেন "আমার জন্য তত ভাবিনা কিন্তু ছেলেটী আমি না [illegible] পাইবে। এ আমাকে একরকম চিনিয়াছে, নূতন লোক আসিলে [illegible] আমি তাহাকে সাহায্য করিব।"

হরিমোহন তাহা শুনিলেন না। অগত্যা চারুকে সঙ্গে করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী হরিমোহনবাবুর বাসা ত্যাগ করিলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবেন? যাইবার স্থান কোথায়? এই সমগ্র জগতে ত্রিপুরার স্থান নাই। চক্ষে জল আসিল, চারু কাঁদিল। দুইজনে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপথে গিয়া পড়িলেন। ত্রিপুরা আর চলিতে পারিলেন না। রাজপথের এক পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন, চারু মাতার নিকট বসিল. ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী ক্ষুদিরাম মাঝির বাড়ী যাইবেন মনে মনে স্থির করিতেছিলেন। ক্ষুদিরাম মাঝি ত্রিপুরাকে মা সম্বোধন করিয়াছিল এবং আবশ্যক হইলে তাহাকে ডাকাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষুদিরাম মাঝির বাড়ী যাইতে হইলে বামনপাড়ের ঘাটে প্রথমে যাইতে হইবে। ত্রিপুরার অতদূর যাইবার ক্ষমতা নাই। গাড়ী পাল্কী ভাড়া দিবার পয়সা নাই। অগত্যা ত্রিপুরাকে সেই বৃক্ষতলেই বসিতে হইল। এমন সময় ভৈরব আসিয়া জুটিল। তাহাকে প্রাতঃকালে অতিথিশালার কোন কাজের জন্য অতিথিশালা হইতে অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। সে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে ত্রিপুরাসুন্দরী বা চারুবালা হরিমোহনবাবুর বাসায় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে হরিমোহনবাবু তাহাকে বাসা হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে হরিমোহনবাবুকে উদ্দেশে অনেক গালি দিল এবং অতিথিশালা হইতে সেও চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে মনে শাসাইল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে চলিয়া গেলে অতিথিশালায় আর কাজ চলিবে না। তাহার মত আর কাজের লোক জুটিবে না। কাজেই অতিথিশালা বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকমুখে যেদিকে ত্রিপুরাসুন্দরী গিয়াছেন জানিতে পারিল সেই দিকেই

দ্রুত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল এবং পথিপার্শে ত্রিপুরা ও চারুকে দেখিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। দেখিল বিস্তর লোকের ভিড় হইয়াছে নানা লোক নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে। কেহ বা কতক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে অন্যে আসিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইতেছে। এমন সময় ভৈরব আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া একবারে ত্রিপুরা ও চারুর নিকটে গেল। চারু ও ত্রিপুরাসুন্দরীর মুখ বিষণ্ণ, দুইজনের মুখে হতাশ্বাসের চিহ্ন প্রস্ফুট-অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল।

ত্রিপুরা ভৈরবকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যদিও তিনি ভৈরবের সহিত স্বর্ণ-প্রতিমা চারুকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহেন না তথাপি তিনি জানিতেন, জগতে ভৈরবই তাঁহাদের এই অসময়ের একমাত্র বন্ধু. সেইজন্য ত্রিপুরা ভৈরবকে দেখিয়া কাঁদিলেন। সংসারে কোন বন্ধু নাই, আশ্রয় নাই, কোথায় যাইবেন কি করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। চারুর কোথায় যাইলে দুটী অন্ন জুটিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ত্রিপুরা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার অবস্থা অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে ভাগ্যের নিম্নতম প্রদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহার মৃত্যু আত সন্নিকট, রঞ্জীব এ সংসারে নাই কিন্তু চারুর কি হইবে? এই ভাবনা ত্রিপুরার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতেছিল। ভৈরব বলিল ভয় কি? আমি এখনি আপনাদের আমার এক মাতুলের বন্ধুর বাড়াতে লইয়া যাইতেছি আমিও কাজ ছাড়িয়া দিব দেখি অতিথিশালা কেমন করিয়া চলে।"

ত্রিপুরা—"বাবা ভৈরব, তোমার সে মাতুলের বন্ধুর বাটী কত দূর?"

ভৈরব—"এই সহরের মধ্যে।"

ত্রিপুরা—"তোমার মাতুলের বন্ধুর নাম?"

ভৈরব—রত্নেশ্বরবাবু।

ত্রিপুরা ভৈরবকে বেশ চিনিতেন, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনার দৌড় বেশ জানিতেন, সেইজন্য তাহার কথামত কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না, এবং রত্নেশ্বরবাবুর সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রত্নেশ্বরবাবু কে?"

ভৈরব—রত্নেশ্বর বাবু আমার মাতুলের বন্ধু, তিনি এই সহরের উত্তরে একটী গলিতে থাকেন, সে গলির নাম আমি ভুলিয়া যাইতেছি, তবে স্মরণ এখনি হইবে। আমি তাঁহাকে নিজে দেখিয়াছি, তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছি।

ত্রিপুরা—তাঁহার বাড়ীতে কি তুমি কখন গিয়াছ?

ভৈরব—নাই যাইলাম? পরিচয় দিবামাত্র আমাদিগকে কত যত্ন করিবেন!

ত্রিপুরা—তোমাকে কি তিনি চেনেন?

ভৈরব—বোধ হয় না। একবার তাঁহার বাটীর দরজায় যাইলে দ্বারবানেরা আমাকে তাড়াইয়া দিতে আসে,—আমিও ভিতরে যাইব, তাহারাও যাইতে দিবে না—তখন গোলমাল শুনিয়া একটী বাবু বাটীর ভিতর হইতে সেখানে আসিলেন এবং গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বুঝিলাম যে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা রত্নেশ্বর বাবু। দ্বারবানেরা আমাকে দেখাইয়া বলিল—যে ইনি বাড়ীর ভিতর যাইবেন বলিয়া গোল করিতেছেন; কিন্তু পরিচয় দিতেছেন না। রত্নেশ্বর বাবু আমার দিকে তাকাইলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার মাতুলের নাম করিয়া বলিলাম তিনি আমার মাতুল। তখন রত্নেশ্বর বাবু আমাকে আর একদিন আসিতে

বলিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। তিনি সম্ভ বড়মানুষ, সেখানে গেলে রাজার হালে থাকিবেন।

ত্রিপুরা বুঝিলেন, যে রত্নেশ্বর বাবুর সহিত ভৈরবের আলাপ পরিচয় একেবারেই নাই। তাহাতে ভৈরবের সাহায্য গ্রহণ করিলে পরে বা ভৈরব চারুবালাকে বিবাহ করিবার জন্য জোর করে। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া ভৈরবকে বলিলেন "বাবা ভৈরব, তুমি অতিথিশালায় যাও, বেলা হইয়াছে, তুমি না থাকিলে অতিথিদিগের আহারের অসুবিধা হইবে। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আর কেন কষ্ট কর, আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

ভৈরব—'চারুবালা কোথায় থাকিবে? আমি সব ছাড়িতে পারি চারুকে ছাড়িতে পারিব না। ভগবান যাহা মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমি কেমন করিয়া ছাড়িব। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিব! এত দুঃখের মধ্যেও ত্রিপুরা ভৈরবের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু পাছে চারুর বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিলে ভৈরবের মনে কষ্ট হয়, এইজন্য বলিলেন "বাবা ভৈরব, বিবাহ প্রজাপতির নির্বন্ধ, ভবিতব্যতা থাকে ত আমরা যেখানেই থাকি না কেন তোমার সহিত চারুর বিবাহ হইবে। তুমি এখন যাও আমরা কোন দয়ালু ভদ্রলোকের আশ্রয় সন্ধান করি।"

ভৈরব কিছুতেই ত্রিপুরার সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না। সে কেবল মনে মনে করিতেছিল "যে দিদির মত পাত্রী জুটিয়াছে—যাহা এতদিন চাহিয়া আসিয়াছি—তাহা মিলিয়াছে, ইহাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। ত্রিপুরার সম্পূর্ণ ই মত আছে। তবে কে তাহার কাণ ভাঙ্গাইয়াছে তাই ত্রিপুরা আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন"।

ভৈরব বলিল—"আপনি যেখানে যাইবেন আমি সেইখানেই যাইব—আমার মত পাত্র হাতছাড়া করিবেন না। আমি আপনার নিকট হইতে বিবাহের খরচ কিছুই চাই না। এমন সুবিধা আপনার হইবে না।" যে সময় এই সমস্ত কথা হইতেছিল তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। লোকজন সকলেই নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গিয়াছে। চারু ক্ষুধার বড়ই কাতরা—ত্রিপুরার প্রাণটা কণ্ঠাগত হইয়াছে।

ভৈরব বার বার চারুকে সাহস দিতেছিল। বলিতেছিল "ভয় কি চারু? ভৈরব থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। কোন কষ্টই পাইতে হবে না।" এদিকে ত কষ্টের অবধি নাই, তাহাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর ভৈরবকে লইয়া এক নূতন বিপদ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি ভৈরবকে কি প্রকারে বিদায় করিবেন এক একবার তাহাই ভাবিতেছিলেন। চারু-বালা ভৈরবের ভয়ে জড়সড় হইতেছিল। ভৈরব মনে করিতেছিল যে স্বামী সমক্ষে চারুবালার লজ্জা হইতেছে। চারুবালা ভৈরবের দিকে যখনই তাকাইত তখনই তাহার মনে কেমন একটা আতঙ্ক হইত। এক্ষণে ভৈরব তাহাকে বিবাহ করিবে শুনিয়া ভয়ে তাহার বুক ধড়াস ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে ভৈরবের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া মাতার কোলের নিকট গিয়া বসিল।

ত্রিপুরা অন্য স্থানে কোথায় যাইবেন? বেলা দুইপ্রহর অতীত হইল। নিজের শারীরিক মানসিক কষ্টের অবধি নাই। চারুর মুখ ক্ষুধা তৃষ্ণায় আরো শুকাইতেছে। এই সব দেখিয়া তাঁহার সংজ্ঞা রহিত হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু সংসার দারুণ স্থান—মনুষ্য বিচিত্র জীব—কেহই ত্রিপুরার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; অধিকন্তু কেহ কেহ অভদ্রোচিত নানারূপ বিদ্রূপ বাক্য বলিয়া যেন কতই পুরুষত্ব দেখাইল—ভাবিয়া হো! হো! করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ত্রিপুরাসুন্দরী লজ্জায় ঘৃণায় মৃতকল্প। পূর্ব্বস্মৃতির দারুণ যাতনায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। চারু কাঁদিতে লাগিল। এদিকে সূর্য্যদেব গগন মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী কনকাসনে বসিয়া ধরিত্রীদেবীর উপর রোষ কষায়িত লোচনে সুতীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষীগণ ভয়ে স্তব্ধভাব ধারণ করিয়া নিজস্থানে লুকায়িত হইতে ব্যস্ত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী চারুবালাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"চারু আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে—বোধ হইতেছে আমি অধিক ক্ষণ আর বাঁচিব না। যদি মরি তুমি সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ীতে যাইও, তিনি তোমায় ফেলিতে পারিবেন না। একমুটা অন্ন দিবেনই দিবেন।"

ত্রিপুরাসুন্দরী আর বলিতে পারিলেন না। চারুর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া সেই বৃক্ষতলে—সেই রাজপথে ধূলিশয্যায় কুমুদনাথের প্রাণাধিকা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বামীর পরোপকারের ফল ইহকালেই ভোগ করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া সংক্রামক রোগ-জনিত সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কুমুদনাথ ও ত্রিপুরাসুন্দরী প্রাণপণে গোবর্দ্ধনের, ও গোবর্দ্ধনের মাতার প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, এই তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন। ত্রিপুরাসুন্দরী অজ্ঞান হইয়াছেন। পরোপকার মহাব্রত। কিন্তু সংসার এমনই স্থান যে তুমি যাহার উপকার করিবে তাহার হস্তেই প্রায় তোমাকে লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে এইরূপই ঘটিতে দেখা যায়। ধর্ম্ম-লোপ হইলে যেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা, জগতে তাহাই ঘটিতেছে। যতদিন মনুষ্য-সমাজ কাম পাপীগণের অত্যাচারে ধ্বংসের পথে আনীত হইতে থাকে কুমুদনাথ ও সর্ব্বেশ্বর বাবুর ন্যায় মহাপুরুষগণ সকল বাধা বিপত্তিকে

অগ্রাহ্য করিয়া জগতের সর্ব্বজীবের মঙ্গল কামনায় ইহজীবনকে ব্রতী করায়—পাপের প্রবল স্রোত, ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য, সেই মনুষ্য সমাজে ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিতে আজিও সমর্থ হয় নাই। আমরা বলিয়াছি—ত্রিপুরা ধূলিশয্যায় রাজপথে অজ্ঞান হইয়াছেন। চারুবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। লোকজন বিস্তর জড় হইয়াছে—সহরে লোকের ভাবনা নাই। ত্রিপুরাসুন্দরীর শুশ্রূষায় কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতেছে না। এমন সময়ে সেইখানে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল, লোকজনের ভিড় হওয়ায় গাড়ী চলিতে পারিতেছিল না। একটী ভদ্রলোক সেই গাড়ীর মধ্যে ছিলেন, তিনি ভিড়ের কারণ জানিবার জন্য সেইখানে নামিলেন। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, নয়নে জল আসিল। দেখিলেন একজন দুঃখিনী রমণী ধূলিশয্যায় শায়িতা, সংজ্ঞা বিরহিতা। নিজেই তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইবেন—এমন সময়ে সেই রমণীর মুখের উপর তাঁহার চক্ষু পতিত হইলে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি? এযে ত্রিপুরাসুন্দরী!" কুমুদনাথের অভাগিনী পত্নী তখনও সংজ্ঞা বিরহিতা। সে কথা তাঁহার কর্ণে গেলনা। অতিব্যস্তে সেই ভদ্রলোক স্বয়ং জল আনিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর মুখে দিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ত্রিপুরার জ্ঞান হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—কে একজন অতি কারুণ্য পূর্ণ মধুরস্বরে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। চারুকে আশ্বাস বাক্যে আপ্যায়িত করিতেছেন। ইনি কে? ত্রিপুরাসুন্দরী প্রথমে সেই পরদুঃখকাতর মহাপুরুষকে দেবতা মনে করিলেন। আপনার স্বামী যে একজন ঐরূপ দয়াবান মহাপুরুষ ছিলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী সংসারের নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতা মনে করিয়া কর-

যোড়ে মৃত্যুভিক্ষা করিতে যাইবেন এমন সময়ে সেই পুরুষের মুখের দিকে ত্রিপুরার চক্ষু পড়িল তিনি একবারে আনন্দে পুলকিত হইলেন দেখিলেন—সম্মুখে সর্ব্বেশ্বর বাবু। সর্ব্বেশ্বর বাবুর স্বর চিনিতেন, সেই স্বর কাহার তাহা বুঝিতে আর ত্রিপুরার বিলম্ব হইলনা। সেই স্বর কত দীন দুঃখী দরিদ্রের, কত বিপন্নজনের দগ্ধ হৃদয়ে ভূয়োঃভূয়ঃ অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে; সেই স্বর আজ ত্রিপুরার হৃদয়ে আশার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া ত্রিপুরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিল। ত্রিপুরা চিনিলেন, সর্ব্বেশ্বর বাবু—তাঁহার স্বামীর পরমবন্ধু; সর্ব্বেশ্বর বাবু—তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ত্রিপুরাসুন্দরী সহজেই পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বেশ্বরবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই সমস্ত যাতনা ক্লেশ লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিতে হইত না; কিন্তু যে সর্ব্বেশ্বর বাবু এককালে ত্রিপুরার স্বামীর পরম বন্ধু ছিলেন, দুইজনে দুইজনকে সমকক্ষ ভাবিয়া সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়া আসিতে ছিলেন, এক্ষণে কালের বিচিত্র ক্রীড়াবশে, সেই কুমুদনাথের স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে সর্ব্বেশ্বরের গলগ্রহ হইতে হইবে, সর্ব্বেশ্বরবাবু আর তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিবেন বা সম্মান প্রদর্শন করিবেন ত্রিপুরা তাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন—দূরস্থানে থাকিয়া দুঃখ কষ্ট সহ্য করাও ভাল তথাপি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের গলগ্রহ, তাঁহাদের অনাদরের পাত্র হইয়া থাকা উচিত নহে। ত্রিপুরার হৃদয়ে মান ইজ্জতের ভয় বড়ই প্রগাঢ় ছিল, তৎসঙ্গে পাছে রাজীব পুনরায় কোন বিপদে পতিত হয়, সেই জন্য ত্রিপুরা-সুন্দরী প্রথমে সর্ব্বেশ্বর বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চান নাই। কিন্তু এক্ষণে ততদূর মানের ভয় করিলে চলে না। ত্রিপুরাসুন্দরী অন্তঃ-পুরে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় সংসারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ

অনভিজ্ঞা ছিলেন। হৃদয়হীন মনুষ্য-সমাজে যে দিন দিন কিরূপ মর্ম্মভেদী দৃশ্য সংঘটিত হইতেছে তাহা ত্রিপুরা জানিতেন না মনে করিয়াছিলেন হয়ত সংসারের সকলেই কুমুদনাথের ন্যায় মহানুভব, দয়ার অবতার। তিনি নিজ প্রিয় পতির দেব চরিত্র পূর্ব্বে নিজ-চক্ষে দিন দিন দেখিতে পাইতেন ; সেইজন্য তাঁহার ঐরূপ ধারণা হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি ? এক্ষণে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বেশ্বরবাবুর সদয় ব্যবহারে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার সেই অর্দ্ধমৃত দেহে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেইখানে উঠিয়া বসিলেন, চারু ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইল। সর্ব্বেশ্বরবাবু দুগ্ধ আনিয়া চারুকে খাওয়াইলেন, স্নান ও ইষ্ট পূজাদি সমাপন না করিয়া কিছু আহার করা বাঙ্গালীর আচারবিরুদ্ধ মনে করিয়া সর্ব্বেশ্বরবাবু ত্রিপুরাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না সকলে গাড়ীতে উঠিলেন এবং যে কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বেশ্বরবাবু সহরে যাইতেছিলেন তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে লইয়া রামনগরের ঘাটের দিকে চলিলেন। ভগবানের রাজ্যে সর্ব্বেশ্বরবাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক না থাকিলে বোধ হয় এতদিনে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইত।

সর্ব্বেশ্বরবাবু এতদিন ত্রিপুরাসুন্দরীকে খুঁজিতেছিলেন, এক্ষণে পথিপার্শ্বে কুড়াইয়া পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি গাড়ীতে যাইবার সময় রাজীবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিপুরা রাজীবের নাম শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন, চারুবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আজ অনেকদিন হইল, দাদা নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবুর মুখ ম্লান ও বিষণ্ণ হইল। ত্রিপুরার মুখে সব শুনিতে পাইবেন বলিয়া, তখন আর কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন না, গাড়ী সময়ে রামনগরের ঘাটে আসিল। সকলে নৌকা-যোগে চিত্রানদী পার হইয়া চিত্রগ্রামের ঘাটে আসিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী পরপারে আসিলে চারুকে দিয়া সর্ব্বেশ্বরবাবুকে বলাইলেন যে ক্ষুদিরাম মাঝিকে একবার ডাকা হউক—ক্ষুদিরাম সর্ব্বেশ্বরবাবুর প্রজা, তাহাকে ডাকিলেই সে আসিল। এবং ত্রিপুরাসুন্দরীকে মাতৃ-সম্বোধন করিল। তাহা শুনিয়া সর্ব্বেশ্বরবাবু বড়ই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে একদিন ত্রিপুরাকে পর্ণ-কুটীরে ক্ষুদিরাম আপন আশ্রয় দিয়া ত্রিপুরার বিশেষ উপকার করিয়াছিল, তখন সর্ব্বেশ্বরবাবু ক্ষুদিরামের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার খাজনা চিরকালের জন্য মকুব করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন ক্ষুদিরামের আনন্দের সীমা রহিল না, সে ত্রিপুরার পদযুগল মস্তকে লইয়া বলিল "মা, আমি আপনার ছেলে, কিন্তু এ হতভাগ্য আপনার এখন কোন উপকারে লাগিল না, যদি কিছু আজ্ঞা করেন, দাস সে কার্য্য করিতে প্রস্তুত।" তখন ত্রিপুরা রাজীবের নিরুদ্দেশ হইবার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া তাহাকে রাজীবের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন, পরে বলিলেন "রাজীব চিত্রানদীতে মুখ হাত ধুইতে আসিয়াছিল, সে কোথায় গেল, তাহার কি হইল, তাহা তুমি কি অন্য কোন মাঝি কেহ জানে কি না? তোমরা সর্ব্বদাই ঘাটে ঘাটে থাক, সেখানে কোন ঘটনা হইলে তোমাদেরই শুনিবার সম্ভাবনা।"

সর্ব্বেশ্বরবাবু রাজীবের নিরুদ্দেশ হইবার কথা শুনিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং তিনিও ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তোমরা এ ঘটনার কিছুই জান না? একজন কেহ ডুবিয়া গেলে অবশ্যই একটা গোলযোগ হইত। তখন অনেক লোক ঘাটে ছিল, তাহাতে দিনের বেলা, রাজীবের জলে ডুবিবার তত সম্ভাবনা নাই,

তবে ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে দেখিতেছি. রাজীবের কেহ পেছনে লাগিয়াছে, তাহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এই বলিয়া তিনি কতক্ষণ কি ভাবিলেন, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইতে যে এ সমস্ত ঘটিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না. গোবর্দ্ধন যে এতদূর নরকের কীট তাহা নিজের উদার স্বভাব-প্রযুক্ত সর্ব্বেশ্বরের বোধগম্য হইল না। তখন ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলিল "মা, যে রাত্রে আপনি আমার বাটীতে থাকেন, সেই রাত্রে ঝড় হওয়ায় আমার গোয়ালঘর পড়িয়া গেলে, গরু ও বাছুর পলাইয়া যায়। তৎ পরদিন আমি গরু ও বাছুর খুঁজিতে বাহির হইয়া আমার বাটীর নিকটে একটা বনের ভিতর যাই। সেইখানে গরু-বাছুর পাইয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিতেছি, এমন সময় গরুটা ভয় পাইয়া দৌড়িতে লাগিল, আমি দড়ি ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম, কিন্তু সে এত বেগে দৌড়িতে লাগিল যে আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইতে পারিলাম না, অগত্যা দড়ি ছাড়িয়া দিব মনে করিতেছি, এমন সময় গরুটা এমন দড়িতে টান দিল যে আমি সজোরে পড়িয়া গেলাম, পড়িয়া গিয়া আমার পায়ের একটা হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। সেই অবধি আমি শয্যাগত ছিলাম, আজ ৩।৪ দিন উঠিয়া বেড়াইতেছি, সেই জন্য নদীতে কি হইয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই। কেহ ডুবিয়া গেলে আমার কাণে আসিত। বোধ হয় কেহ তাহাকে নৌকা করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাহউক আমি ইহার সন্ধানে রহিলাম। ত্রিপুরা ও সর্ব্বেশ্বরবাবু ক্ষুদিরামের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে আবার রাজীবকে পাইবার আশার সঞ্চার হইল।

বহুদিনব্যাপী দুর্যোগের পর মেঘোন্মুক্ত আকাশ-মণ্ডলে প্রথম দুই

একটী নক্ষত্র দর্শন করিলে যেমন দর্শকের মনে আনন্দের ক্ষীণ রেখা পতিত হয়,সেইরূপ 'রাজীব জীবিত আছে ভাবিয়া ত্রিপুরা সুন্দরীর মনে আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। আবার রাজীবের মুখ দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া ত্রিপুরা কথঞ্চিৎ মনে মনে সুস্থ হইলেন। ক্ষুদিরামকে বিদায় দিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু গৃহাভিমুখে চলিলেন। ত্রিপুরা ও চারু একখানি শিবিকায় ও নিজে অন্য আর এক শিবিকায় উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। গৃহে আসিয়া অতি আদরের সহিত ত্রিপুরাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। চারু সঙ্গে চলিল, বাটীর মধ্যে গিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলাকে ডাকিলেন এবং যেরূপ ভাবে ত্রিপুরা ও তাঁহার কন্যাকে পথিপার্শ্বে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন সমস্ত কথা বলিলেন। আরও বলিলেন,—"যদি আর কিছুক্ষণ আমি না যাইতাম তাহা হইলে ত্রিপুরা সুন্দরী হয়ত মারা পড়িতেন; ঐ শরীরে পথিপার্শ্বে ধূলার উপর পড়িয়াছিলেন।" সর্ব্বমঙ্গলার হৃদয় বড়ই কাতর হইল। তিনি শুনিয়া অতি যত্নে ত্রিপুরাকে লইয়া গিয়া এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মনোরম শয্যায় শয়ন করাইলেন। তাহার সেবার জন্য দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ত্রিপুরার অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বমঙ্গলা কত কাঁদিলেন। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-দর্শন পাইলে গৃহস্থ যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি-জড়িত চিত্তে দেবীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়, সর্ব্বমঙ্গলারও সর্ব্বেশ্বর সেইরূপ পথের ভিখারিণী ত্রিপুরার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ভাল ভাল বৈদ্য আনাইবার আদেশ দিলেন, ভাল ভাল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ত্রিপুরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলার মনে আনন্দ ধরেনা, তাঁহারা এক জনের মনের ক্লেশ কতক পরিমাণে দূর করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহাদের সুখ। স্বর্গ-সুখ সেই

সুখের ছায়া মাত্র। চারু—প্রতিভার সহচরী হইল। দুই জনে এক বৃন্তস্থিত দুইটী প্রস্ফুটিতোন্মুখ কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিভা যেরূপ সুন্দরী চারুও সেইরূপ রূপবতী ছিল। দুইজনে পাশা-পাশি বসিলে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় গৃহস্থ-গৃহানীত যুগল দেবীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। ভৈরব দেখিলে, দিদির ন্যায় সুন্দরী জ্ঞানে উভয়কেই বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইত।

ত্রিপুরা সুন্দরী কিন্তু রাজীবের অদর্শন-জনিত মনকষ্টে রোগমুক্তা হইতে পারিলেন না। সমস্ত চিকিৎসাই বিফল হইতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু ত্রিপুরার নিকট রাজীবের নিরুদ্দেশ হইবার সকল কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে ভৈরবের মুখ হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনি-বার জন্য গোবর্দ্ধনের দ্বারায় তাহাকে ডাকাইলেন। রাজীব ভৈরবের সঙ্গে নদীতীরে আসিয়াছিল পরে কি ঘটিল তাহা ভৈরবের মুখ হইতে শুনিতে সর্ব্বেশ্বর ব্যগ্র হইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন রামনগরে লোক পাঠাইয়া সময়ে ভৈরবকে সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট আনয়ন করিল। গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারিল যে ভৈরব রাজীবের সংবাদ কিছুই জানে না, সেই জন্য অব্যাকুল চিত্তে ভৈরবকে সর্ব্বেশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত করা-ইল। ভৈরব সর্ব্বেশ্বর বাবুকে প্রণাম করিয়া—সর্ব্বেশ্বর বাবু কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে ডাকাইলে তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে সেই দিনই চারুর সঙ্গে তাহার বিবাহের সমস্ত কথা বার্ত্তা ধার্য্য হইবে। ভৈরবের মনে সেই জন্য আনন্দ ধরিতেছিল না; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট চুরুট সেবন করা ধৃষ্টতা বুঝিয়া চুরুটটী বাহিরে রাখিয়া আসিয়া-ছিল।

সর্ব্বেশ্বর বাবু কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভৈরব বাবু! রাজীবের সংবাদ কিছু জানেন?"

"আজ্ঞে আমি যাহা জানিতাম—সবই তাহার মাতাকে বলিয়াছিলাম। তাহা অপেক্ষা অধিক ত আমি জানি না।"

সর্ব্বেশ্বর—"সে যে তোমার সঙ্গে নদীতীরে আসিয়াছিল—তাহা ত্রিপুরা সুন্দরীর মুখে শুনিয়াছি তাহার পর তোমরা দুই জনে কেমন করিয়া ছাড়াছাড়ি হইলে?"

ভৈরব তখন আনুপূর্ব্বিক অতিথিশালা হইতে বাহির হইয়া চিত্রা নদীতীরে গমন ও তৎপরে রাজীবের অন্তর্দ্ধান ইত্যাদি যাহা যাহা সে জানিত সকলই সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট বলিল। সে যে দিদির মত এক সুন্দরী রমণীকে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছিল সে কথা সর্ব্বেশ্বরকে বলিল না। কিছুক্ষণ পরে ভৈরব বলিল, "রাজীবের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হইয়াছিল—তাহার কারণও ছিল.চারুবালার সহিত আমার বিবাহের সব স্থির হইয়াছে, কেবল দিন স্থির বাকী! এরূপ অবস্থায় রাজীবের সহিত আমার প্রণয় হইবারই কথা। সেই জন্যই আমি তাহাকে অতি যত্নে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতাম। এক সঙ্গে দুই জনে থাকিতাম, এক সঙ্গে নদীতীরে বেড়াইতে যাইতাম। অদৃষ্ট ক্রমে যে এরূপ ঘটিবে, আর সেই সঙ্গে আমার বিবাহের বিলম্ব হইয়া পড়িবে তাহা কে জানিত?"

সর্ব্বেশ্বর বাবু ভাবিলেন ত্রিপুরা সুন্দরীর কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে। ত্রিপুরার অবস্থা হীন হইয়া পড়ায় ভৈরবের ন্যায় একটা বনমানুষ ধরিয়া সেই কন্যার বিবাহ দিতে ত্রিপুরা সুন্দরী সম্মত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া ভৈরবের বিবাহের কথা বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু রাজীবের সন্ধান কিছুমাত্র না পাইয়া মনে মনে অতিশয় ব্যথিত

হইলেন। পরে সর্ব্বেশ্বর বাবু ভৈরবের সহিত চারুবালার বিবাহ সম্বন্ধে আরো দুই এক কথা জানিবার জন্য ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ত্রিপুরা সুন্দরীর কন্যা আপনি বিবাহ করিবেন বটে কিন্তু আপনার বিবাহ রাজীব না আসা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। আর আমি ত্রিপুরা সুন্দরীর মুখে অন্য পাত্রের অন্বেষণের কথা শুনিয়াছি।" সর্ব্বেশ্বর বাবু ভৈরবের বুদ্ধির মহিমা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। তাহা হইলে হয় ত তাহার নিকট তাহার বিবাহের কথা তুলিতেন না।

এক্ষণে ভৈরব যখন শুনিল যে চারুর অন্য পাত্রের অন্বেষণ হইতেছে তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বেশ্বর বাবুকে বলিল,—আমার ভগিনীপতি আপনার দেওয়ানজী তাহার ব্যবহারটা দেখিলেন যে ত্রিপুরা সুন্দরীর মন ভাঙ্গাইয়া আমার সহিত চারুবালার বিবাহ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। যা'ক সঠিক, এই বিবাহ যদি না হয় তবে আমি বিষ খাইব, জলে ডুবিয়া মরিব আগে দেওয়ানজীকে মারিব—তারপর মরিব এই বলিয়া সে ঘন ঘন হাতের ছড়ি নাড়িতে লাগিল।

সর্ব্বেশ্বর তখন বুঝিলেন যে ভৈরবের একটু ছিট্ আছে। তখন তিনি একটু হাস্য করিয়া ভৈরবকে বিদায় দিলেন। ভৈরব মনে মনে দেওয়ানজীর মস্তক চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রাজীবের চরিত্র [illegible] কি প্রকারে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল [illegible] সন্ধ্যাদি অনাদর, লাঞ্ছনা, অপমানে রাজীবের চিত্ত বৈকল্য [illegible]

ছিল। তাহার পূর্ব্বের সরলতা, সত্যে অনুরাগের স্থলে—মিথ্যা-কুটিলতা, চাতুরী আসিয়া জুটিয়াছিল। সকল সৎপ্রবৃত্তিই কুপ্রবৃত্তিকে স্থান দিয়া হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছিল। কুসংসর্গের নানারূপ কুফল রাজীবকে একটী মনুষ্যাকৃতিধারী পশুতে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। সে যে আর কখন দেশে আসিবে বা মাতাকে দেখিতে পাইবে সেরূপ আশা তাহার ছিল না। মানুষের আশা, ভরসা যখন সব চলিয়া যায় তখন মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না, তখন মনের ক্লেশ ঢাকিবার জন্য যাহাতে ক্ষণিক সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় মন সেই দিকেই ধাবিত হয়। রাজীবের তাহাই ঘটিয়াছিল। গাঁজা চরসের আস্বাদনের সঙ্গে সুকেশীর বাটীতে মদের আস্বাদন পাওয়ায় মদের দিকে তাহার ঝোঁক পড়িল।

বড় কষ্টে ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া প্রথমেই রাজীব একটা শুঁড়ির দোকানের অন্বেষণে বাহির হইল। শুঁড়ির দোকানে যাইয়া সামান্য মাত্র মদ কিনিয়া খাইল। টাকা কড়ি সঙ্গে থাকিলে হয়ত প্রাণ ভরিয়াই খাইত। অল্প নেশা হইবার পর ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল এবং রেলগাড়ীতে চাপিল। ঘটনাক্রমে রেলগাড়ীতে একটা লোকের সহিত রাজীবের আলাপ হইল। সে সর্ব্বেশ্বর বাবুর লোক। সর্ব্বেশ্বরবাবু চতুর্দ্দিকে বিস্তর লোক ত্রিপুরাসুন্দরীর অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন। এই লোকটী তাহাদের মধ্যে একজন। এই লোকটী রাজীবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বলিল বড়ই বিপদে পড়িয়াছি মহাশয়, আমাদের দেশের জমীদার একজন লোকের অন্বেষণে দশদিকে লোক পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহার ত কোনরূপ উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।

রাজীব আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল সে লোকটীর নাম?

লোক। রাজীব।

রাজীব। বাড়ী?

লোক। চিত্রগ্রাম।

রাজীব। আপনি কি তবে সর্ব্বেশ্বরবাবুর লোক?

লোক। আপনি কি সর্ব্বেশ্বরবাবুকে চেনেন?

রাজীব। আপনি বলুন না আপনার জমাদারের নাম কি?

লোক। আপনি যা বলিলেন তাহ—সর্ব্বেশ্বরবাবু।

রাজীব। তবে আমিও সেই রাজীব, আমার মা কোথায় আছেন জানেন?

লোকটীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইল। সে যাহার জন্য দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই রাজীব তাহার সন্নিধানে। রাজীবকে লইয়া যাইতে পারিলে বিস্তর পুরস্কার পাইবার কথা। লোকটী বড়ই আনন্দে বলিল "মহাশয়, আমার আজ বড়ই আনন্দের দিন, অনেক স্থান আপনার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি—অনেক লোককে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কোন ফলই হয় নাই, আপনার চেহারা দেখিয়া প্রথমেই আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে আপনি রাজীববাবু। যাহা হউক আপনি কোথাকার টিকিট লইয়াছেন?

রাজীব ষ্টেশনের নাম বলিল।

লোক। আমিও সেইখানের টিকিট লইয়াছি, চলুন সেইখানে নামিয়া সেইখানে চিত্রানদীতে নৌকা ভাড়া করিয়া দেশে যাইব।

রাজীবের বড়ই আনন্দ হইল সে তাহার মাতার বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

লোক। আপনার মাতার অন্বেষণেও লোক জন বাহির হইয়াছে। হয়ত এতদিন তাঁহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাজীব আর কিছু বলিল না। তাহার মাতা অতিথিশালায় দাসীবৃত্তি করিতেছে বলিতে সহজে সে ইচ্ছা করিল না। আবশ্যক হইলে পরে বলিবে মনে করিল।

দুইজনে নানা রূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিল। দুইজনে যথা সময়ে যে ষ্টেশনে নামিবার কথা তথায় নামিল। পরে পদব্রজে চিত্রা নদীর ঘাটে গিয়া নৌকার অনুসন্ধানে রহিল। কতক্ষণ পরে একজন মাঝি সেই ঘাটে নৌকা ধরিলে জনকতক লোক নামিয়া গেল। মাঝি কতকক্ষণ রাজীবের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল—কেও, দাদা ঠাকুর? আপনার জন্য আপনার মা, সর্ব্বেশ্বর বাবু বড়ই কাতর হইয়াছেন। চলুন, আমার নৌকায় উঠুন। আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? আমার নাম ক্ষুদিরাম – যে রাত্রে ঝড় হয় সেই রাত্রে—

রাজীব—হাঁ চিনিয়াছি। তোমার নাম কি বলিলে?

ক্ষুদিরাম—ক্ষুদিরাম মাঝি।

রাজীব—তুমি আমার মাকে দেখিয়াছ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ।

রাজীব—তিনি এখন কোথায়?

ক্ষুদিরাম—তিনি সর্ব্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে গিয়াছেন।”

রাজীব—“মা কেমন আছেন?”

ক্ষুদিরাম—তাঁহার শরীর বড়ই অপটু।

রাজীবের চক্ষে জল আসিল। রাজীব—আর চারু?

ক্ষুদীরাম—তিনি ভাল আছেন। তিনিও মার সঙ্গে চিত্রগ্রামে গিয়াছেন।

রাজীবের আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাজীব সেই লোকটীর সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া চিত্রানদীর দুই পার্শ্বের গ্রাম, মাঠ, গাছ-পালা দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। রাজীব অনাহারে আছে দেখিয়া লোকটী এক স্থানে নৌকা ধরিতে বলিয়া গ্রামের মধ্য হইতে দুধ কিনিয়া আনিতে চাহিল, কিন্তু বিলম্ব হইবে ভাবিয়া রাজীব তাহাতে সম্মত হইল না। কিছু জলযোগ করিয়াই থাকিল। নৌকা চলিতে লাগিল—নৌকা উজান বহিয়া যাইতে লাগিল। রাজীবের তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। রাজীব থাকিয়া থাকিয়া দাঁড়ীদিগকে গালি দিতেছিল—মাঝিকে কিছু বলিল না—সে তাহাদিগকে একরাত্রি জায়গা দিয়াছিল—বোধ হয়, রাজীবের তাহা মনে পড়িতেছিল। এখানে আমাদের বলা উচিত যে রাজীবের চরিত্র কলুষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও বড়ই রুক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাঁজায় রাজীবের মেজাজ রুক্ষ হইয়াছিল, সংসর্গ-দোষ রাজীবকে যতদূর পারে অসভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সে আর কাহাকেও সম্মানের সহিত কথা কহিতে পারিত না। জমীদারী-সেরেস্তায় যে সকল চরিত্রহীন লোক ছিল, তাহাদের সংসর্গে—রাজীব একটা নূতন জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—চাতুরী, মিথ্যা কথা, কপটতা, অসভ্যতা সমস্তই রাজীবের শোণিতে শোণিতে মিশ্রিত হইয়াছিল।

দাঁড়ীরা রাজীবের উপর মহা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, রাজীবও দাঁড়ীদের কথায় চটিয়া উঠিল—সেই নদীর উপরে একটা হাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হইল। রাজীবকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষুদীরাম দাঁড়ীদিগকে বকিতে লাগিল।

ক্ষুদী—"দাদা ঠাকুরের কথায় কি রাগ করিতে হয়? দাদা ঠাকুরের বয়সই বা কত?"

কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে হয় ত রাজীব মার খাইত, এখন সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীবের আশ্রয়দাতা—সুতরাং সকলেই রাজীবের পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে ক্রমাগত নৌকা চলিতে চলিতে ২।৩ দিনে নৌকা চিত্রাগ্রামের ঘাটে লাগিল। রাজীব ও সেই লোকটি দুই জনে তীরে নামিল, ক্ষুদীরাম নৌকা ভাড়া লইতে স্বীকৃত হইল না—দাঁড়ীরা তখনও রাজীবের উপরে চটিয়া রহিয়াছিল—ক্ষুদীরামের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল, ইচ্ছা দু চার ঘা দেয়, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছিল না। সংসারের গতিকই এইরূপ—ধনবানের আশ্রয়ে অনেক আপদ বিপদ কাটিয়া যায়। রাজীবের পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। রাজীবও সর্ব্বেশ্বরবাবুর আশ্রয়ের সাহসে অত মেজাজ গরম করিতেছিল। নতুবা মেজাজ যতই রুক্ষ হউক না, সে নদীর উপরে দাঁড়ীদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে সাহস করিত না। সে যাহা হউক, রাজীব নিরাপদে সে দিন সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাটীতে পৌঁছিল। সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাণে সে কথা গেল না। সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীবকে সঙ্গে করিয়া ত্রিপুরার নিকট লইয়া গেলেন।

ত্রিপুরা অনেক দিন রাজীবকে দেখেন নাই। রাজীবকে যে আর তিনি দেখিতে পাইবেন, এ বিষয়ে তাঁহার আশা-ভরসা বড় ছিল না। এখন রাজীবকে পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরীর উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিল। তিনি রাজীবকে ক্রোড়ের নিকট বসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শুইয়া রহিলেন। রাজীব মাতাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু কতকটা তাচ্ছল্যভাবে মাতার সহিত কথা কহিতে লাগিল। মাতা, পুত্রের আকার প্রকারে বড় আশ্বস্তা হইলেন না। সন্দেহ হইতে লাগিল যে রাজীবের চরিত্রদোষ

হইয়াছে। নতুবা সেই রাজীব এখনও তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল না কেন? ত্রিপুরার অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে রাজীবের নিকট হইতে কেমন করিয়া রাজীব নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যদি রাজীবের চরিত্র বিদেশে থাকিয়া নষ্ট হইয়া থাকে—এখানে থাকিলে আবার শুধরাইয়া যাইবে, এইরূপে ত্রিপুরাসুন্দরী মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। রাজীব মাতাকে সকল কথা বলিয়া মাতার নিকট হইতে বাহিরে আসিল।

রাজীবের আগমনে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে একটা আনন্দের ঢেউ দেখা দিল—সর্ব্বেশ্বরবাবু রাজীবের আগমনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি রাজীবের আকৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া দারিদ্র্য এই পরিবর্ত্তনের মূল ভাবিলেন। তাঁহার সংসারে সুখে থাকিবে, তাহা হইলেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেহের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিবে—ভাবিয়া মনকে স্থির করিলেন। প্রতিভা বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল, এবং রাজীবের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিবেন, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজীবের প্রত্যাগমনের পর আর বিলম্ব না করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে—বহু ব্যয়ে ও মহা সমারোহে প্রতিভাসুন্দরীকে রাজীবের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু ও সর্ব্বমঙ্গলার আনন্দের সীমা রহিল না। পুণ্যশীলা ত্রিপুরাসুন্দরী ও পুণ্যশ্লোক কুমুদনাথের সৎকুলজাত পুত্র রাজীবকে কন্যা প্রদান করিয়া কন্যার পিতা মাতা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন।

প্রতিভাসুন্দরীও রূপবান পতি লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল।

আনন্দে ত্রিপুরাসুন্দরীর চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল—পথের ভিখারী হইয়া রাজমাতা হইলেন, ইহা অপেক্ষা ত্রিপুরাসুন্দরীর আর কি সুখের বিষয় হইতে পারে? চারুবালা দাদার বিবাহে সুখের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। আর রাজীব? সর্ব্বেশ্বর বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য রাজীবের করতলগত হইবে ভাবিয়া সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। আবার সুকেশীর বিদ্যুজ্জ্বালাবৎ তীব্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি রাজীবের হৃদয় অধিকার করিল—শারদ-জ্যোৎস্না-প্রতিম-লাবণ্যময়ী প্রতিভার রূপ সে হৃদয়ে কত দূর স্থান পাইতে পারে, তাহা দেখা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিভাসুন্দরী বড়ই রূপবতী ছিল—তৎসঙ্গে পিতামাতার সুশিক্ষার গুণে—প্রতিভার হৃদয়ে কোন প্রকার সদ্‌গুণের অভাব ছিল না। প্রতিভা পিতা মাতার ন্যায় কোমল-হৃদয়া ছিল। পরের দুঃখে তাহার চক্ষে জল আসিত। এত অল্প বয়সেই দাস-দাসীগণের সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিত। কেহ কখন প্রতিভার মুখে রূঢ় কথা শুনে নাই—কাজেই প্রতিভাকে সকলেই স্নেহের চক্ষে দেখিত। পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক, দাসদাসীগণও প্রতিভাকে ম্লানমুখে দেখিলে বিশেষ কষ্ট বোধ করিত। এত দূর ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলেও প্রতিভাসুন্দরীর হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। ত্রিপুরাসুন্দরী আসিলে পর প্রতিভা ত্রিপুরাসুন্দরীর ক্লেশের যাহাতে উপশম হয়, সর্ব্বদা সেই বিষয়ে যত্নবতী থাকিত। পরিচারিকাগণ ত্রিপুরার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা

থাকিলেও, প্রতিভা নিজে অনেক সময় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত। নানারূপ মিষ্ট কথায় ত্রিপুরাকে অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিত। অল্প দিনের মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রতিভার গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতিভা ত্রিপুরাসুন্দরীর পুত্র-বধূ হইবার পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছিল একণে বিবাহের পরে শ্বশ্রূদেবীর সেবায় তদধিক যত্ন করিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী প্রতিভার গুণে মোহিতা হইলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরা-সুন্দরীর এক কন্যা ছিল, একণে প্রতিভাকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরা-সুন্দরী নিজে দুই কন্যার জননী হইলেন এই জ্ঞানে পরম আনন্দিতা হইলেন। প্রতিভা চারুবালাকে ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিয়া আসিতে-ছিল একণে সেই যত্ন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। চারুবালা প্রতিভাকে বড়ই ভাল বাসিত, একণে সে ভালবাসা আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। প্রতিভাসুন্দরী স্বামীর সমস্ত সুখের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে লাগিল। রাজীব প্রতিভাকে পাইয়া কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিল তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। একদিন সে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে—সমস্ত দাসদাসী প্রজাবর্গ তাহার আয়ত্তা-ধীনে থাকিবে—এই সুখের স্বপ্ন তাহার হৃদয়কে বড়ই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। প্রতিভার বিষয় তাহার হৃদয়ে এখনও বড় স্থান পায় নাই। পরে পাইবে কি না তাহা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

দেওয়ানজী যখন দেখিল, রাজীবের সহিত প্রতিভার বিবাহ অনি-বার্য্য সেই বিবাহে আপত্তি উত্থাপনে কোন ফল নাই, তখন চতুর দেওয়ানজী নূতন ধরণের চাল চালিতে মনে করিল। রাজীব এখন তাহার প্রভু হইতে বসিয়াছেন। অন্ততঃ রাজীবকে সম্মান

প্রদর্শন না করিলে চলে না, এই সব ভাবিয়া তখন সে তাহার চির-বিদ্বেষ বুদ্ধিকে হৃদয়ের এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিলে এবং রাজীবের সহিত প্রতিভার বিবাহে সে যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, সেই ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিবাহ-রাত্রিতে দেওয়ানজী নিজে সমস্ত কাজ কর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। লোক জনকে আহ্বান, অভ্যর্থনার ভার অপরের উপর না দিয়া সমস্তই নিজে গ্রহণ করিল। লোকজন সকলে বড়ই আপ্যায়িত হইল সর্ব্বেশ্বর বাবু দেওয়ানজীর ব্যবহারে নিজেও আপ্যায়িত হইলেন এবং দেওয়ানজীকে সন্তোষজনক পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ক্রমশঃ দেওয়ানজী রাজীবকে হাতের ভিতর করিবার চেষ্টায় রহিল। রাজীবকে বড় আদর ও যত্ন করিতে লাগিল। ত্রিপুরসুন্দরীর মন যে যে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে, সেই সেই বিষয় সম্পাদনে সতত তৎপর রহিল। সে বুঝিয়াছিল যে, রাজীবের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, —রাজীব নেশার মর্ম্ম বুঝিয়াছে—অথচ রাজীবের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়। সহজেই রাজীবকে যে দিকে ইচ্ছা লওয়াইতে পারিবে। তিনি এই সব ভাবিয়া রাজীবকে নানারূপ চাটুবাক্যে ভুলাইতে লাগিল।

রাজীব—গোবর্দ্ধন ও তাহার অন্যান্য পারিষদবর্গের মন ভুলান কথায় আত্মহারা হইল। বিলাসীতার চূড়ান্ত চলিতে লাগিল। রাজীব শ্বশুরের নিকট হইতে মাসে মাসে যে টাকা আপনার খরচের জন্য পাইত, তাহাতে রাজীবের আর চলে না। টাকা কড়ি যাহাতে রাজীব ধার পায়, গোবর্দ্ধন তাহারও বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। চিত্রানদীর তীরে সর্ব্বেশ্বরের যে একটী বাটী ছিল। রাজীব সেই বাটীটি নিজের বৈঠকখানা করিয়া সেইখানে বন্ধুবান্ধব লইয়া

আমোদ প্রমোদে দিন রাত কাটাইতে লাগিল। ইদানীং প্রায় শ্বশুরের সহিত রাজীব দেখাই করিত না। গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করিলে গোবর্দ্ধন বলিত রাজীব বেশ কাজের লোক হইতেছে। জমীদারীর সকল বিষয় নিজের চক্ষে দেখিতেছে। সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীবকে না দেখিতে পাইয়া, কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলে, গোবর্দ্ধন বলিত যে রাজীব জমীদারীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নিজে জমীদারীর অবস্থা দর্শন করিতেছে। এই সকল শুনিয়া রাজীবের উপর সর্ব্বেশ্বর বাবুর সন্তোষের সীমা রহিল না। রাজীব যে একদিন জমীদারীর ভার নিজহস্তে লইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

একদিন সর্ব্বেশ্বর বাবু রাজীব ও দেওয়ানজীকে ডাকাইলেন। রাজীবের সমক্ষে দেওয়ানজীকে বলিলেন—"দেওয়ানজী! রাজীব এক্ষণে আমার জামাতা। আমি জামাতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমার জামাতা তোমার স্নেহের পাত্র। তুমি রাজীবকে জমীদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাজই শিখাইবে। যেন আমার অবিদ্যমানে রাজীব নিজহস্তে আমার এই বিপুল বিষয় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে কাহারও না মুখাপেক্ষা করিতে হয়। নিজে বিষয় কর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে, পাঁচজনে লুটিয়া খাইবে।

গোবর্দ্ধন—"আমি আপনার আদেশ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করিতেছি।"

দেওয়ানজীর মিথ্যা কথা শুনিয়া রাজীব হাসিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু দেওয়ানজীর ইঙ্গিতে সে হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর

ভাবে বসিয়া রহিল। সর্বেশ্বর বাবু তাহ দেখিতে পাইলেন না। এদিকে রাজীবকে সম্বোধন করিয়া সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন,—"বাবা রাজীব! প্রতিভাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হইয়াছি অন্যদিকে প্রতিভার জীবনের সমস্ত সুখ, ভবিষ্যতে তোমারই উপর নির্ভর করিবে ভাবিয়া কতকটা উদ্বিগ্নও হইয়াছি। আমার বিষয় সম্পত্তির উন্নতি অবনতি তোমারই যোগ্যতার অযোগ্যতার উপর ভবিষ্যতে নির্ভর করিবে। যখন তুমি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হইয়া আমার হস্ত হইতে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবে তখনই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া পরলোক চিন্তায় মনঃসংযোগ করিতে সক্ষম হইব। আর ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিব। আমার প্রতিভা আমার যেমন আদরের বস্তু আমার সম্পত্তিও তেমন মূল্যবান। এই দুটী বস্তুই তুমি অতি সাবধানে ও সযত্নে রাখিবে। কোনরূপ কোনটীর উপর ঔদাস্য ভাব দেখাইবে না। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

রাজীব শ্বশুর মহাশয়ের উপদেশ বাক্য দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করাইয়া বাম কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দিল। গোবর্দ্ধন রাজীবকে সযত্নে আপনার নিকট বসাইয়া সর্বেশ্বর বাবুর সমক্ষে নানারূপ বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিল।

বলিল—"রাজীব বাবু শ্বশুর মহাশয়ের কথা সব শুনিলে ত। এক্ষণে আমি তোমাকে জমীদারী কার্য্য সম্বন্ধের সমস্ত বিষয় ক্রমে ক্রমে শিখাইয়া দিব। তুমি মন দিয়া প্রতিদিন শিখিবে। হিসাব নিকাশ প্রত্যহ দেখা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে জমীদারী দেখিতে যাইতে হইবে। প্রজাদিগকে যতদূর পারিবে চিনিবার চেষ্টা করিবে।" এইরূপে

গোবর্দ্ধন রাজীবকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু সন্তুষ্ট মনে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন জামাতাকে যে একজন জমীদারী সংক্রান্ত সকল বিষয় কৃতবিদ্য করিয়া ছাড়িবে তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। এদিকে যেমন সর্ব্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন—রাজীব খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন বলিল "চুপ চুপ কর্ত্তা শুনিতে পাইবেন" রাজীব—"শ্বশুর মহাশয়ের আমার উপর রাগ করিবার কিছুই নাই তিনি আমাকে এই কঠিন জমীদারীর সংক্রান্ত কাজ শিখিতে বলেন। দেওয়ানজী—আমি ওসব শিখিব না; তুমি যতদিন আছ, জমীদারীর কাজ বেশ চলিয়া যাইবে।"

দেওয়ানজী। তুমি স্থির হও না, জমীদারীর কাজ আমি থাকিতে তোমায় কিছুই দেখিতে হইবে না।

রাজীব। "আমিও তাই চাই। আপনি আছেন নায়েব গোমস্তা সব আছে—তাহারাই সব দেখিবে, আপনি তাহাদের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ লইবেন তা সে সব অনেক দিনের কথা। শ্বশুর মহাশয় থাকিতে কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হইবে না।" এইরূপে দুইজনে নানারূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া রাজীব চিত্রানদী-তীরের বৈঠকখানায় চলিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। সর্ব্বেশ্বরবাবু আপন বাটির অনতিদূরে ত্রিপুরাসুন্দরীর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতিবেশী-বর্গে ত্রিপুরার বাটী পূর্ণ হইতে লাগিল, আবার দ্বারদেশে ভিখারীর চীৎকার শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল।

শীত ঋতুর অবসানে বৃক্ষ লতা মুঞ্জরিত হইতে আরম্ভ হইলে,

ফল পুষ্পে শাখা প্রশাখা পূর্ণ হইলে যেমন ভ্রমর মধু-মক্ষিকাগণ জুটিতে থাকে, চটুকের বেশে বৃক্ষ-লতাকে ঘিরিয়া গুণ গুণ স্বরে মধুর বাক্য শুনাইতে প্রবৃত্ত হয়, বিহঙ্গমগণ যেমন আবার শিশির সমাগমে বৃক্ষলতার অসময় বুঝিয়া প্রয়াণ করেছিল, বসন্তের আগমনে যেমন বৃক্ষ-লতার সুসময় বুঝিয়া দলে দলে আসিয়া বৃক্ষলতা সমীপে মধুর গানে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ দলে দলে প্রতিবেশী, অতিথি, যাচক, দীন দরিদ্র ত্রিপুরাসুন্দরীর বাস-ভবন পূর্ণ করিতে লাগিল, তাহারা কিছু দিন পূর্ব্বে ত্রিপুরাকে ভিখারিণী দেখিয়া কত ঘৃণা কত উপহাস করিয়াছিল। এতদিন ত্রিপুরা মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, তাহার কোন সংবাদ লয় নাই। ত্রিপুরার সম্পদে তাহারাই আজ দলে দলে আসিয়া ত্রিপুরার গুণগানে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিপুরা সকলই বুঝিতেন। বুঝিয়াও মনকষ্ট পাইবে এই ভয়ে কাহাকেও কোন কথা বলিতেন না; আবার সাধ্যমতে, দীন-দরিদ্রকে অন্নদানে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অতিথি-সেবা মহা-ধর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এতদিন দুরবস্থার পরিবর্ত্তনে সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ভাগ্য-চক্রের পুনরাবর্ত্তনে ত্রিপুরাসুন্দরী, পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতবতী হইলেন। কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী রোগমুক্তা হইতে পারিলেন না। তিনি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বেশ্বরবাবু ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রয়োজনানুসারে প্রচুর অর্থ ত্রিপুরাসুন্দরীর বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন চিত্রগ্রামের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় ধীরে ধীরে ত্রিপুরার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং লোক দ্বারা তাঁহার আগমন কথা ত্রিপুরাকে বলিয়া পাঠাইলেন, রাজার এই পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়িত, এবং কুমুদনাথের যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন এই পণ্ডিত মহাশয় কুমুদনাথের নিকট প্রায়ই আসিতেন। ত্রিপুরাসুন্দরী পণ্ডিত

মহাশয়ের নাম শুনিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন পণ্ডিত মহাশয় বাটীর ভিতর যাইলেন, বাটীতে ত্রিপুরা চারুবালাকে লইয়া থাকিতেন। দাস দাসী থাকিত। একজন পাচিকা পাকের জন্য ছিল। প্রতিভা মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিত। সে প্রায়ই পিত্রালয়েই বাস করিত। সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাটী ত্রিপুরার বাটীর অতি নিকটে থাকায় প্রতিভা পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিত এবং যখন যেস্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে থাকিলেও পিতা মাতার বা শ্বশ্রু দেবীর নয়নের অন্তরাল হইত না। পণ্ডিত মহাশয় ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকটে আসিয়া ত্রিপুরা-সুন্দরীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমার মৃত্যু হয় নাই আপনার শরীরের এই অবস্থা দর্শন করিতে হইল। আপনি পরম-পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় কুমুদনাথের সহধর্ম্মিণী, আপনি কার্ত্তিকেয়-সদৃশ রূপগুণ-সম্পন্ন রাজীবচন্দ্রের মাতা, সরস্বতী প্রতিম রূপগুণ-শালিনী চারুবালার মাতা, আপনি স্বয়ং ভগ-বতী মানবীরূপ ধারণ করিয়া ধরণী-পৃষ্ঠে অবতীর্ণা' ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে ত্রিপুরাসুন্দরীর গুণগানে ব্যস্ত রহিলেন। ত্রিপুরা আপনার গুণ গাঁথা শুনিতে ভাল বাসিতেন না, তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের আগ-মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার বাটীর সকলে কেমন আছেন [illegible] জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন পণ্ডিত মহাশয় বাটীর সকলের কুশল সংবাদ দিয়া তাঁহার আসিবার কারণ বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন "বলুন আপনি দয়া করিয়া যে এ বাটীতে আসিয়াছেন তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার প্রস্তাব অবশ্য নিশ্চয়ই শুনিতে হইবে।"

পণ্ডিত। "আপনি দেবী মানবীরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন।" এইরূপে পণ্ডিত মহাশয় গৌর চন্দ্রিকা ভাঁজিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরা। "পণ্ডিত মহাশয়, আমার নিকট আপনাকে বিশেষ কোনরূপ লজ্জিত হইতে হইবে না আপনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

পণ্ডিত। "আপনি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহৎলোকের গৃহিণী হইয়াছিলেন। রাজপুত্র, রাজ-কন্যা সদৃশ সন্তানদিগকে উদরে ধারণ করিয়াছেন, আপনার নিকট আমার কোন লজ্জা নাই, আমার প্রতিপালনের ভার আপনার।" এইরূপে আবার পণ্ডিত মহাশয় নানা কথায় ত্রিপুরার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী আপন প্রশংসাবাদে বড়ই লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়, আমার মত অভাগিনী আর কে আছে? আপনি এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

পণ্ডিত। "এরূপ বিনয় জগতে দুর্লভ, নতুবা ভগবান আপনাকে এরূপ ভাগ্যবতী কেন করিবেন? আপনি স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিনী, আপনার যশঃসৌরভেদিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত" এইরূপ আবার চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষে জল দেখা দিল।

ত্রিপুরা অগত্যা বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়, আমার শারীরিক অবস্থা বড় ভাল নয় তাহা ত আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন এখন আপনার মনোভাব ব্যক্ত করুন।

পণ্ডিত মহাশয় তখন বলিতে লাগিলেন যে "আপনার দেব-তুল্য মহানুভব স্বামী জীবিত থাকিতে তাঁহার নিকট হইতে আমি একবার কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, আমি সেই সময় কন্যাদায়গ্রস্ত হওয়ায় টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম।"

ত্রিপুরা। "আমি সে বিষয় কিছুই ত জানি না।"

পণ্ডিত। "হাঁ তা সত্য, কুমুদনাথ বাবুর দান অতি গোপনে সম্পা-

দিত হইত। যাচক ভিন্ন জগতে আর কেহই জানিতে পারিত না, এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম, তিনি আমাকে টাকা কর্জ্জ দেন কিন্তু আমি তাহা প্রতিশোধে অপারক হওয়ায় তিনি সেই টাকা সুদ সমেত রেহাই দেন, আহা তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, না জানি কোন উচ্চলোকে তিনি বাস করিতেছেন।"

প্রশংসাবাদ করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি পুনরায় সেইরূপ দায়গ্রস্ত এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি আমাকে সাহায্য করেন তবেই আবার এই দায় হইতে উদ্ধার হই।"

ত্রিপুরা। "আপনার কত টাকার আবশ্যক এবং আমাকে কি দিতে হইবে?"

পণ্ডিত। "আমার অন্ততঃ ৫০০ টাকার প্রয়োজন, আপনি যদি সমস্ত টাকা দেন বড় ভালই হয় নতুবা"—

ত্রিপুরা ভদ্রাসন বিক্রয় হইবার ক্লেশ অবগত ছিলেন তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে সমস্ত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ ধরে না তিনি কুমুদনাথের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ ত্রিপুরার পিতাও তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ সকলে যে দেব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলে স্বর্গবাস করিতেছেন, সেই সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে করিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তখন ত্রিপুরাসুন্দরী পণ্ডিতমহাশয়কে সপ্তাহ পরে আসিতে বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়, সহাস্য বদনে চলিয়া গেলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন এই পণ্ডিত মহাশয় রাজীব পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কুমুদনাথ রাজীব

উভয়েই যে বদমাস চোর এবং ত্রিপুরা যে চোরের মাতা সকলকে বলিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আজ দরকার পড়িয়াছে, সেই পণ্ডিত মহাশয় ত্রিপুরার চৌদ্দ পুরুষকে দেবতাদিগের সহিত তুলনা করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধন্য সংসার—ধন্য তোমার মহিমা—পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া যাইলে একে একে পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিতে লাগিল—ইহাঁরা কুমুদনাথের সম্পদের সময় কুমুদনাথের বাড়ী ছাড়িতে চাহিতেন না—এটা ওটা যাহা পাইতেন, হস্তগত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী যে কয়দিন নিজ গ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে ইহাদিগকে অনেকবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহারা কেহই আসিতে চাহেন নাই, বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই মাসহারা বন্দোবস্ত ছিল কুমুদনাথের মৃত্যুর পর মাসহারা দিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহারা সকলেই ত্রিপুরাসুন্দরীর উপর মহা চটিয়া যান। রাজীব চৌর্য্য-অপরাধে ধৃত হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন স্বামী, কেহবা আপন পুত্র, কেহবা গ্রামের অন্য লোক দ্বারা দারোগা মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়া পাঠান, যাহাতে রাজীবকে শীঘ্রই কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ত্রিপুরা গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে সকলেই আপদ বিদায় হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা দলে দলে আবার ত্রিপুরাসুন্দরীর বাটীতে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং সকলেই আপনাদের দুরবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্ব মাসহারার পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী হইতেছিলেন। সকলকেই ত্রিপুরাসুন্দরী যত্নে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। সকলে উপবেশন করিলে—প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে নানারূপ দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করিবার চেষ্টায় অবস্থান করিতে

লাগিলেন। ত্রিপুরা সাধ্যমত সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

পরে যোগীর স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর দিকে তাকাইয়া হাঁসিতে হাসিতে আপনার অবস্থার কথা পাড়িলেন। ইনি দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপে ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট উপকৃত, আবার ইনিই সর্ব্ব প্রথম পতিপুত্র না থাকায় আপনার দেবরকে দারোগা মহাশয়ের নিকট রাজাবের জেলের জন্য অনুরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন, আবার ইনিই প্রথম মাসহারার কথা উত্থাপন করেন। ইহার মত কৃতঘ্ন জীব জগতে আর ছিল কিনা সন্দেহ। ইনি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। বয়স ত্রিশ হইবে। গ্রামের সকল স্থানে ইহার গতিবিধি। ত্রিপুরার দুঃসময়ে ইনি গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া ত্রিপুরার নিন্দাবাদ করিতেন। রাজাব চুরীতে ধরা পড়িয়াছে শুনিবামাত্র ইনি আহারে বসিয়াছিলেন অর্দ্ধাশন করিয়া পাড়ায় বলিতে ছুটিলেন এবং রাজাব চুরী করিয়া জেলে যাইবে,হয়ত ত্রিপুরাও চারুবালাকে সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এইরূপ বলিয়া বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইনি আবার সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া ত্রিপুরাকে চাটুবাক্যে ছাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় স্তুতিবাদ শাস্ত্রে যোগীর স্ত্রীর টোলে অনেক বৎসর ধরিয়া পাঠ করিতে পারিতেন কিন্তু গুরুমাতার ন্যায়—শাস্ত্রে ততটা পারদর্শীতা লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

যোগীর স্ত্রী—"আচ্ছা চারুর মা! আবার কবে বাছা তুমি ভাল হয়ে নিজে সব দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইবে?"

ত্রিপুরা যোগীর স্ত্রীর উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না তাহার কারণ যোগীর স্ত্রী লোকাচার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহে বিশেষ অনুরাগ

বতী ছিলেন। ব্রাহ্মণের বিধবা যোগীর স্ত্রী পান খাইত। সে পান চিবাইতে চিবাইতে ত্রিপুরাসুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছিল। পাড়ওয়ালা কাপড় পরিত। হাতে পিতলের বালা, গলায় পিতলের হার, বেশবিন্যাসের বা কি পরিপাট্য। সর্ব্বদা ফিটফাট থাকিতে ভাল বাসিত ত্রিপুরাসুন্দরী সেটা ভাল বাসিত না। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবা—স্বামী-বিরহে মৃতপ্রায় থাকিবে—বেশ-ভুষা সমস্ত ত্যাগ করিবে—কেশ-বিন্যাস ভুলিয়া যাইবে—তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠ—সুচিক্কণ বস্ত্রপরিধান—স্বর্ণালঙ্কারের অভাবে এমন কি পিত্তলের অলঙ্কারেও দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ যত্ন—এই সমস্ত ত্রিপুরার চক্ষে শূলসম বিঁধিতেছিল—তিনি অথচ নিজের মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া যোগীর স্ত্রীর কথা মন দিয়া শুনিতেছিলেন। যোগীর স্ত্রীর কথায় ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "বিধাতার সকলই ইচ্ছা—তিনি যে দিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন, সেইদিনই আবার উঠিয়া বেড়াইব।"

যোগীর স্ত্রী– "বিধাতার অবিচার তোমার মত পুণ্যবতীকে তিনি এমন কষ্ট দিয়েছেন, আমি একবার বিধাতাকে দেখিতে পাই ত দু কথা শুনাইয়া দিই।

ত্রিপুরা। বিধাতার কি দোষ বাছা, যে তাঁহাকে কোন কথা বলিবে, তিনি কি কথা শুনাইবার কাজ করেন? আমাদের কর্ম্ম-দোষে আমরা কষ্ট পাই।

যোগীর স্ত্রী। সে কথা আমি মানি না, তাহা হইলে তোমার কখনই কষ্ট হইত না, তোমার মত ধর্ম্মে মতি লোক কজন আছে? কি কথাবার্ত্তা, কি দয়া, কি মাটির মানুষ, তুমি ত বাছা কখন কাহারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা কও নি।

ত্রিপুরা হাসিলেন। তিনি যোগীর স্ত্রীর তাঁহার প্রতি ব্যবহারের কথা সব জানিতেন। এখন আবার যোগীর স্ত্রীর সুর ফিরিয়াছে দেখিয়া একটু হাসিলেন। যোগীর স্ত্রী হাঁসির অর্থ বুঝিল কিন্তু বিশেষ নির্লজ্জ থাকায় উহা গ্রাহ্য না করিয়া একজন প্রতিবেশিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"হাঁ ভাই দামিনী, রাজীবের মার মত মানুষ কজন হয় ভাই? গরীব দুঃখী আমাদের মত উঁহার দয়াতেই বাঁচিয়া আছে তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা—কাশী ত্যাগ করিয়া চিত্রগ্রামে আসিয়াছেন।

ত্রিপুরা—"ছিঃ ওকথা বল্‌তে আছে? আমি কি একটা ছার—আমাকে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তুলনা করিতেছ।"

যোগীর স্ত্রী—"সে যাহা হউক আমার মাসহরাটা আবার দিতে হবে।"

ত্রিপুরা—"কয় টাকা?"

যোগীর স্ত্রী—"কতকাল দিয়ে এসেছ এখন কি ভুলে গেলে? আমি ৪৷৷০ পাইতাম।"

ত্রিপুরা—"আচ্ছা তুমি পাইবে।"

তখন রামীর মা, শ্যামার দিদি, রসিকের স্ত্রী, কামিনী, দামিনী, খুকিমণি, কাত্যায়নী, খুদি, বুধি, হরি সকলেই একটা মাসহারা পাইবার জন্য গোল বাধাইল। ত্রিপুরা সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলায় সকলেই স্থির হইল। পরে নিজ নিজ মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে আর সেই স্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া এক একজন চলিয়া গেল। এরূপ অছিলায় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় যাইতে যাইতে রামীর মা বলিল—"ত্রিপুরাসুন্দরী মাটির মানুষ—কোন অহঙ্কার নাই।"

যোগীর স্ত্রী—"তুই ত সব বুঝিস্,মাগী অহঙ্কারে মট মট করিতেছে। দুটাকা আমাদের দেবেন তা কথার ভঙ্গী দেখলি না? বলেন কিনা কটাকা করে আমাকে দিতেন ভুলে গেছেন, মাগীর কথায় সর্ব্বাঙ্গ জলে গেল।"

দামিনী—"ঠিক বলেছিস যোগীর মা; আমার সময়টা বড়ই খারাপ নইলে ও মাগীর হাত তোলাতে আমি কখনই সম্মত হতেম না। মাগীর যেমন মন তেমনি চিররোগ ধরেছে।"

এইরূপে ত্রিপুরা যে সকল রূপে পাপিষ্ঠার অগ্রগণ্যা—সেই সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে গ্রামের পুণ্যবতীগণ নিজ নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বগুণবান্ স্বামীর সর্ব্বগুণবতী শিষ্যা। তিনি সুযোগ অভাবে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে রাজীবের বিবাহের কল্যাণে যেমন প্রচুর ধন আগমন করিতে লাগিল, তিনিও সেইরূপে মুক্তহস্তে দান-দরিদ্র আতুর-দিগকে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। রোগীর রোগ মোচন, বিপন্নের বিপদ নিবারণ—বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থ দানে সুখী করিতে লাগিলেন। ঋণীর ঋণ মোচন তাঁহার জীবনের লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়া যেরূপে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। গৃহচ্যুত হইলে কতদূর বিপদাপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহার বিশেষরূপে বোধগম্য থাকায়, যে কোন ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী হইয়াছে, ভদ্রাসন বাটী ক্রোক হইয়া নিলাম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর সাহায্য প্রার্থনা করিত, তিনি তদ্দণ্ডে তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিতেন।

সকলে আশার অতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু ইহাতে বড়ই আনন্দিত, দুঃখীর দুঃখ-মোচনে তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন. ত্রিপুরাসুন্দরীকে সেইরূপ যথোচিত অর্থ-দ্বারায় আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর আনন্দের অবধি রহিল না। এই সময়ে তাঁহার স্বামীর বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছিল। রাজীবের বিবাহ হইয়াছে পরম রূপ-গুণ-সম্পন্না পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এদিকে রাশি রাশি অর্থের সমাগম হইতেছে অথচ কুমুদনাথ নাই—একের অভাবে সব শূন্য—সকল সুখেরই যেন অন্তঃসারশূন্য। ত্রিপুরাসুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর নানারূপ বিপদে ব্যতিব্যস্ত থাকায় স্বামী-বিরহযন্ত্রণা সম্যক অনুভূত করিতে পারেন নাই এক্ষণে অনেকরূপে উদ্বেগশূন্য হইয়া কুমুদনাথের বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার নবীভূত হইয়া আসিল। তিনি আর রোগোন্মুক্ত হইবেন এমন আশা রহিল না। এদিকে রাজীব যে দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল, তিনি তত্তটা জানিতে পারেন নাই। শয্যাগত থাকায় রোগের কঠিন যাতনায় রাজীবের চরিত্র যে দিন দিন কলুষিত হইতেছে. সে সংবাদ তিনি রাখিতে পারেন নাই। রাজীব প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিত তাঁহার নিকট আসিত না। তিনি মনে করিতেন—নব পরিণয়-সুখে রাজীব দিন কাটাইতেছে। রমণীকুলরাজ্ঞী ভার্য্যা লাভ করিয়া তাহারই প্রণয়-ছায়ায় রাজীব আপনার দুঃখ-তপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করিতেছে সেই ভাবিয়াই তিনি আশ্বস্তা থাকিতেন। এদিকে তিনি ভৈরবকে অতিথিশালা হইতে আনাইয়া সর্ব্বেশ্বরের জমীদারী মধ্যে একটা ভাল কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হরিমোহনের শিশুপুত্রের সর্ব্বদা সংবাদ রাখিতেন। ক্ষুদীরাম মাঝির মাসহরার বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। চারুবালার সহিত তাহার বিবাহ হইবে এই আনন্দে ভৈরব প্রায়ই ত্রিপুরাসুন্দরীকে দেখিতে আসিত কিন্তু রাজীবের আগমন দিন দিন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। রাজীবকে ডাকিয়া পাঠাইলেও রাজীব "আসিবার অবসর নাই" বলিয়া পাঠাইত। মাতা মনে করিতেন পুত্র বিশাল বিষয়-সম্পত্তির ভার স্কন্ধে লইবার জন্য জমীদারী-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষার কারণে ব্যস্ত আছে। নববধূ শ্বশ্রূদেবীর সেবায় সতত তৎপর থাকিত। এই সব কারণে রাজীবের-অদর্শন-ক্লেশ ত্রিপুরার মনকে ততটা ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারিত না। তিনি একরূপ নিশ্চিন্তই থাকিতেন। ধর্ম্ম-চর্য্যায় অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। একদিন তিনি প্রয়োজন বশতঃ রাজীবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হতভাগ্য অতুল ধনের অধিপতি হইবে এই ধারণায় গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। রাজীবের অদর্শন-জনিত মনোকষ্টে যে মাতা জটিল রোগে শয্যাশায়িনী হইয়াছেন, পাপিষ্ঠের তাহা মনোমধ্যে একবারও উদয় হইত না,আজ যে মাতা মনোকষ্টে অকালে জীবনের লীলা শেষ করিতে বসিয়াছেন, আর সেই বাৎসল্যময়ী মাতাকে রাজীব ভুলিতে বসিয়াছে। ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হইয়া সে অশ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাতার রোগের উপশমের জন্য তাহার কোন যত্নই ছিল না। মাতার মনঃ-সন্তোষের জন্য পাপীর কোন চেষ্টাই দেখা যাইত না।

কৌশল্যা বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছে। যে এতদিন অনেককে মজাইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিতেছিল সে আবার রাজীবকে মজাইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাহাকে ফাঁদে ফেলিতে গিয়া নিজে ফাঁদে

পড়িয়াছে। রাজীবের বিবাহের পর যখন কৌশল্যা জানিতে পারিল যে রাজীবই সর্ব্বেশ্বরবাবুর সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইবে। রাজীব একদিন সর্ব্বেশ্বরের জমীদারী-রূপ রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিয়া অতুল ধনের অধিপতি হইবে সেই সময় হইতেই রাজীবকে হস্তগত করিবার জন্য কৌশল্যা নানারূপ উপায় উদ্ভাবনা করিতে লাগিল. সে আবার দাসী সরস্বতীকে আপনার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখাইয়াছিল। সরস্বতী, কৌশল্যা যে দুশ্চারিনী অগ্রে হইতেও জানিয়াছিল। কৌশল্যাও সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল। সে সরস্বতীকে আপন গুপ্ত-প্রণয়ের সহকারিনী বলিয়া ভুলিয়াছিল। কিন্তু যোগেশ্বরের মৃত্যুর পর কৌশল্যার আর তত বাড়াবাড়ি ছিল না. সে কতকটা পাপের স্রোতের বেগ কমাইয়া আনিয়াছিল. কৌশল্যা একদিন সরস্বতীকে বলিল—"সরস্বতী, জমীদারের জামাইকে দেখিয়াছিস্?"

সরস্বতী—"হাঁ।"

কৌশল্যা—"কেমন দেখ্তে বল্ দেখি?"

সরস্বতী—"কেন—বেশ।"

কৌশল্যা—"বল—চাঁদের মতন। দিন রাত তোর দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা?"

সরস্বতী—"আমরা গরীবলোক আমাদের মুখ দেখ্লে কি হবে? আমাদের যে পেট আছে"

কৌশল্যা কোন কথা বলিল না সে একমনে কি ভাবিতে লাগিল। সরস্বতী অবাক্ হইয়া কৌশল্যার পানে চাহিয়া রহিল। পরে কৌশল্যাকে বলিল—"দিদিমণি কি ভাবিতেছ?" কৌশল্যার সে কথা কাণে গেল না। সে একেবারে রাজীবের রূপে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছিল। সে রাজীবকে প্রথম দেখিয়াই আপনার মাথা আপনি

খাইয়াছিল। বিবাহের পর গোবর্দ্ধন রাজীবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল জমীদারের নূতন জামাতা—দেওয়ানজীকে নানা-রূপে তাহাকে যত্ন দেখাইতেই হইবে, এইজন্য আদর পূর্ব্বক বাড়ীতে আনিয়া কৌশল্যাকে ডাকিয়া বলিল "জামাইবাবু এসেছেন ইহাঁকে যত্ন করিয়া আহারাদি করাও।"

কৌশল্যা রাজীবের সহিত কথা কহিতে সঙ্কুচিতা হইল না। রাজীবও কৌশল্যাকে বয়ো-জ্যেষ্ঠা দেখিয়া সম্মানের সহিত কথা কহিল এবং কৌশল্যা যে একেবারে তাহার সহিত কথা কহিল, তাহাতে কোনরূপ আশ্চর্য্য বোধ করিল না।

কৌশল্যা সেইদিনই মরিয়াছিল। একেবারেই রাজীবকে মনে মনে আত্মদান করিয়াছিল। এত দেখিয়াছি কই এমন রূপ ত কখনও কোন পুরুষে দেখি নাই। আহা, কি রূপ, কি হাসিমাখা মুখখানি কি পদ্মপলাশ-নিভ সুচারু নেত্রদ্বয় সুন্দর মুক্তা-পংক্তি-গঞ্জিত সুশুভ্র দশনাবলী, কি বিম্ব-নিন্দিত অধরোষ্ঠ, কি হৃদয়-মাতান কথাগুলি। রাজীবের সকলই কৌশল্যার চক্ষে সুন্দর বোধ হইতে লাগিল, সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহ রাজীবের নিমন্ত্রণ চলিতে লাগিল। প্রত্যহই রাজীবের রূপরাশি কৌশল্যা অতৃপ্ত-হৃদয়ে সতৃষ্ণ-লোচনে দেখিতে লাগিল। কৌশল্যা ধরা দিল। যে কৌশল্যা এতদিন পুরুষকে আপনার ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ নাচাইয়া, হাঁসাইয়া কাঁদাইয়া আসিতেছিল,আজ রাজীবের রূপে সেই কৌশল্যা মজিল। যে কৌশল্যা একদিন সগর্ব্বে রেবতীকে বলিয়াছিল— "রেবতী, পুরুষের রূপের ধার কৌশল্যা ধারে না" আজ সেই কৌশ-ল্যার সে গর্ব্ব আর নাই। দিন দিন রাজীব কৌশল্যার বাটীতে আসে লোকের তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। জামাতাকে

লইয়া বড় আদর করিতেছে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলা বড়ই আনন্দিত। এদিকে প্রভুর জামাতা, তাহাতে বয়সে ছোট, তাহাকে লইয়া কৌশল্যা আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে—ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? অনেকেই ইহা ভাবিয়া রাজীবের কৌশল্যার বাটীতে গমনাগমনে কোন দোষ দেখিতে পাইত না। গোবর্দ্ধনও ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল। জামাতাকে আদর করিলে সর্ব্বেশ্বরবাবু দেওয়ানজীর উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন নানাপ্রকারে পুরস্কৃত করিবেন এই ভাবিয়া দেওয়ানজী কৌশল্যার উপর রাজীব সম্বন্ধে সন্তুষ্টই ছিল কোনরূপ আপত্তি করিত না। রাজীবও, কৌশল্যা তাহাকে জামাতা-জ্ঞানে আদর করিতেছে ভাবিয়া আনন্দ-চিত্তে কৌশল্যার নিকট আগমন করিতে লাগিল। দুষ্টা সরস্বতী কিন্তু কৌশল্যার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। পাছে সর্ব্বেশ্বরবাবু জানিতে পারেন, কৌশল্যা তাহার হৃদয়ের কথা প্রথমে সরস্বতীর নিকটে গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে কিন্তু যখন হৃদয়ের জ্বালায় কৌশল্যা শত-বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তখন সে নিজের মনের ভাব সরস্বতীকে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। সরস্বতী বুঝিল পাথরে আঁক পড়িয়াছে—সূর্য্যাংশুপাতে তুষারের ন্যায় ধীরে ধীরে কৌশল্যার হৃদয় গলিতেছে—কৌশল্যা আপন পায়ে আপনি শৃঙ্খল পরিবার উপক্রম করিয়াছে। কৌশল্যা রাজীবের রূপে মজিয়াছে। ভগবানের রাজ্যে সকলই সম্ভবে।

কৌশল্যা বলিল—"সরস্বতী, এতদিনে পুরুষের মর্ম্ম বুঝিয়াছি, প্রেমের মূল্য বুঝিয়াছি, ভালবাসা কি তাহা জানিয়াছি। এতদিন পুরুষকে খেলার জিনিস ভাবিয়া কত উপেক্ষা অশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি, আজ সেই পুরুষকে অমূল্য পরশমণি-জ্ঞানে হৃদয়ে ধারণ করিব বলিয়া পাগল হইয়াছি, পুরুষ আজ আমার কণ্ঠে মুক্তার হার, প্রকোষ্ঠে

বজ্র-বলয়, মস্তকে বহুমূল্য মুকুট—সেই মুকুটের মধ্যগত অপূর্ব্ব অমূল্য মণি আর পুরুষকে উপেক্ষা করি আমার সাধ্য নাই। রাজীব আমাকে পাগল করিয়াছে আমি উন্মাদিনী।” কৌশল্যা পুরুষের জন্য আজ কাঁদিল সরস্বতী ঠিক বুঝিয়াছিল পাথরে জোঁক পড়িয়াছে। এদৃশ্য জগতে বিরল নহে। সরস্বতী রাজীবকে মিলাইয়া দিবে বলিয়া কৌশল্যার নিকট প্রতিশ্রুত হইল।

রাজীব আর এখন তেমন ঘন ঘন কৌশল্যার বাটীতে আসিতে পারে না, তাহার অবসর নাই। চিত্রানদী-তীরে “আরাম-ভবনে” বন্ধুবান্ধব লইয়া নৃত্যগীতে মদ্যপানে নানারূপ ভোগ-বাসনার তৃপ্তি-সাধনে—রাজীব বড়ই উন্মত্ত। কৌশল্যার বাটীতে আসিতে আর তত সময় পায় না। যদি বা আসে—অধিকক্ষণ থাকে না। কৌশল্যা আপনার রূপের গৌরব রাজীবের নিকট সাজিল না দেখিয়া মনে মনে ব্যথিত। কৌশল্যা রাজীবকে মনের কথা বুঝাইবার জন্য কত ঠাট্টা তামাসা করে, রাজীব মনে করে সে সর্ব্বেশ্বর বাবুর জামাতা ঠাট্টার সম্বন্ধ আছে তাই কৌশল্যা ঠাট্টা করিতেছে। সে কৌশল্যার মনের ভাব বুঝিতে না পারায় পাপীয়সী কৌশল্যা মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধা। তাহার মত রূপবতী রমণী আজ রাজীবের চরণতলে রূপ বিলাইতে চায়। রাজীব তাহা বুঝে না, তাহাতে ঘোর মর্ম্মাহত, সেই সঙ্গে পুরুষ হইয়া রমণীর মনের ভাব বুঝে না, না বুঝিয়া এতদূর অবহেলা করে, তাহাতে বড়ই বিরক্তা। সে আজ নিজের হৃদয়—যে হৃদয় পূর্ব্বে কাহারও নিকট সমর্পিত করে নাই—যে হৃদয় চিরদিনের জন্যই এইরূপই বদ্ধ থাকিবে কৌশল্যা মনে করিয়াছিল। মনে পড়িয়া পর্ব্বে মধ্যে [illegible] স্ফীত হইল, আজ সেই

হৃদয়ের চিরবদ্ধ দ্বার অতি যত্নে অতি আগ্রহে কৌশল্যা রাজীবের নিকট খুলিতে চাহিতেছে কিন্তু সে কেন তাহা বুঝিতেছে না তাহাতে সে মর্ম্ম-পীড়িতা। রাজীব চলিয়া গেলে সরস্বতী কৌশল্যার চক্ষে জল দেখিল। কৌশল্যা বলিল—"আমি ত বলিয়াছি আমি মরিয়াছি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি এখন উপায়? রাজীব ত আমার মনের ভাব বুঝিল না। আমার রূপে ধিক্, এ রূপে পুরুষ মজিল না। আমার হাব-ভাবে ধিক্ এ হাব-ভাবে পুরুষ পাগল ত হইল না। সরস্বতী, রাজীবকে কি পাইব? আমার সর্ব্বস্ব একদিকে রাজীবের ভালবাসা একদিকে।" সরস্বতী কৌশল্যাকে বুঝাইল এবং রাজীব কি প্রকারে কৌশল্যার প্রেম-জালে বদ্ধ হইবে তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল।

চিত্রানদী তীরে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাগানবাটী, সেই বাগানবাটী এক্ষণে রাজীবের "আরাম-ভবন" ভৈরব এই আরাম-ভবনে আইসে। সে রাজীবের আমোদ-প্রমোদের ধার দিয়া যায় না,—পাছে ত্রিপুরা-সুন্দরী জানিতে পারিলে ঠাকুর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধ করেন—ভৈরব জমাদারীর কাজ দেখে ত্রিপুরা সুন্দরীর সেবা-শুশ্রূষা করে—একরূপে একাকী দিন কাটাইয়া দেয়, ভগিনীর সহিত বড় সাক্ষাৎ করে না—রাজীব ইয়ারের চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মোসাহেবের দল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, বাগানবাটীতে মজলিস্ হয়।

রাজীব দিবারাত্রি আমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। নৃত্যগীতে অতি-মধুর বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে সুরা-দেবীর উপাসনায় নানারূপ ভোগ-বাসনার তৃপ্তি সাধনে, এই দিন পনের [illegible] রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতেছে। সর্ব্বেশ্বর বাবু যাহা রাখিয়া গেছেন তাহাতে কুলায় না।

চতুর্দ্দিক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া রাজীব আমোদ-প্রমোদের ব্যয়-সঙ্কুলান করিতেছে। দেওয়ানজী—রাজীব যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উৎসন্ন পথে পদার্পণ করে সেইজন্য রাজীবের অর্ধাগমের পথ সুগম করিয়া দিতেছিল। রাজীবের চরিত্র-বিষয় সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা কতক কতক শুনিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া অনেক বুঝিয়াছিলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেওয়ানজী সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট সব কথা গোপন করিয়া বলিল,—"রাজীব অনেক দিন বড় কষ্ট পাইয়াছে, তাই নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন ভয় নাই", সর্ব্বেশ্বরবাবু রাজীবের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য বার বার দেওয়ানজীকে বলেন। দেওয়ানজী—"যে আজ্ঞা" বলিয়া সারিয়া দেয় এবং রাজীবকে অধঃপাতে যাইবার পরামর্শ প্রত্যহ দেয়। অধঃপাতে যাইবার জন্য টাকা ধার করিতে পরামর্শ দেয়। মহাজন জুটাইয়া আনে। ঐ সকল বিষয়ে রীতিমত উৎসাহ দেয়। বলে—"এখন যৌবন, এ যৌবনে যদি একটু আমোদ-আহ্লাদ না করিবে, তবে কি বৃদ্ধ হইলে আমোদ করিবে? টাকার যতক্ষণ অভাব হইতেছে না ততক্ষণ আমোদ-আহ্লাদে আমি দোষ দেখিনা।" এইরূপ উৎসাহ-বাক্যে রাজীবকে উৎসাহিত করে। রাজীব এক চায়, আর পায়। দেওয়ানজীর কথায়, দেওয়ানজীর উৎসাহে, তাহার পরামর্শে দিনরাত্র এক প্রকার আমোদ-প্রমোদে, ইয়ারকিতে কাটাইয়া দেয়। স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে না, রাজীবকে কোন কথা বলিলে, সে রাগ করে, কেহই কোন কথা বলিতে চায় না। একদিন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, বাগান-বাড়ীতে খুব ধুমধাম চলিতেছে। মোসাহেবের দল জুটিয়াছে। রামনগর হইতে নর্ত্তকী ও সঙ্গীতপটু গায়িকাগণ আসিয়াছে, নাচ, গান, বাজনা রীতিমত চলিতেছে। বৈঠকখানা ঘরটী খুব

বড়, সুসজ্জিত, চারিদিকে রৌপ্যাধারে বাতি জ্বলিতেছে। পুষ্পাধারে রাশি রাশি ফুল গৃহের স্থানে স্থানে স্তূপীকৃতভাবে রাখা হইয়াছে, সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ। বাতায়ন-পথ দিয়া চিত্রার সলিলসিক্ত মৃদু-মধুর সমীরণ ধীরে ধীরে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সমীরণ হিল্লোলের সহিত মিশিয়া সুমধুর বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি দিগদিগন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আমোদ-মন্দিরের পাদমূলে চিত্রানদী—সেই ধ্বনিতে আপন কলনাদ মিশাইয়া সাগর পানে ছুটিয়াছে গায়িকা গাহিতেছে, নর্ত্তকী নাচিতেছে, নর্ত্তকী গাহিতে গাহিতে নাচিতেছে। কভু বা উভয়ে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতেছে।

রমণীগণের হাব-ভাবে রাজীবের হৃদয় মুগ্ধ। সুরাদেবী সেই সঙ্গে অল্পে অল্পে আপনার আধিপত্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত। রাজীব একদিন পথের ভিখারী—অতিথিশালার নগণ্য কর্ম্মচারী ভৈরবের মুখাপেক্ষী রাজীব সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছে। নর্ত্তকী নাচিতেছে, সেই সঙ্গেই গান ধরিয়াছে—

পিলু—খং।

তোমার চরণে নাথ সঁপিলাম জীবন-যৌবন।
নয়নের তারা তুমি, তোমা বিনা আঁধার ভুবন॥
চাতকী বাঁচিতে পারে, নাহি হেরে জলধরে,
চকোরী চাঁদের সুধা পারে দিতে বিসর্জ্জন॥
কমলিনী দিবাকরে, না হেরিলে প্রাণে মরে,
তবু সে বাঁচিতে পারে নাহি হেরে সে বদন॥
তোমার প্রণয়-ডোরে, বেঁধেছ এমনি করে,
ক্ষণেক না হেরে তোমা হারাই যে এ জীবন।

তুমি মোর কণ্ঠহার, তুমি জীবনের সার,
ফণিনী হারায়ে মণি বাঁচে বল কতক্ষণ॥

রাজীব। বেশ বাবা বেশ! আমি একটা গান করবো!
কত মজা শ্বশুর মশাই, তোমার মেয়ে বিয়ে করে।
অন্নবস্ত্র নাহি ছিল পড়েছিলাম পরের ঘরে॥
পয়সা কড়ি ছিল না হাতে, তরকারী না জুটিত ভাতে,
দিন রাত যে কতদিন কেটে গেছে অনাহারে॥
দেখতো না কেউ পোড়ার মুখ, দুঃখীর বল কোথায় সুখ,
অপমান ভাই পদে পদে শুধুই যে এক টাকার তরে॥
শ্বশুর মশাই বুদ্ধিমান, করলেন হেথা কন্যা দান,
এখন লুটবো মজা, কীর্ত্তির ধ্বজা,
উড়াব যে ভাই শ্বশুর ঘরে॥

তখন চতুর্দ্দিক হইতে বাহবা-ধ্বনি হইতে লাগিল। কেহ বা ইহার মধ্যে হরিবোলের ধ্বনি করিয়া, আপনাকে রসিক-চূড়ামণি মনে করিল। এইরূপে আরাম-মন্দিরে একটা গোলমাল হই চই শব্দ হইতেছিল। সকলেই রাজীবের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত, সকলেই সম্পাদনে উন্মত্ত রাজার একবার বাহিরে যাইতে চাহিল—একজন সুন্দরী নর্ত্তকী রাজীবের হাত ধরিয়া বসাইল। অন্য একজন রাজীবের কর্ণমূলে প্রণয়ের কথা বলিল, তাহার ফুল গোলাপ, এবং গণ্ডদেশ রাজীবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিল। সে সরিয়া পড়িল। তখন রাজীব হাসিতে হাসিতে তাহাকে ধরিতে ছুটিল। সেও একটা সোফার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। আর একজন নর্ত্তকী তাহাকে চোর ধরার মতন ধরিয়া রাজীবের কাছে আনিয়া দিল। রাজীবের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। আজ

মদের মাত্রা কিছু অধিক হইয়াছিল। রাজীব অপরের অজ্ঞাতসারে বৈঠকখানা হইতে সরিয়া পড়িয়া চিত্রানদী তীরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। সুরাপানে তাহার চলিবার শক্তি কমিয়া আসিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া চিত্রানদীর কলনাদ শুনিতেছিল এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"জামাই বাবু!"

রাজীব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে, একজন স্ত্রীলোক, প্রথমে চিনিতে পারিল না। স্ত্রীলোকটী বিশেষ সুন্দরী না হইলেও পূর্ণযৌবনা, সর্ব্বাবয়ব সুগঠনে সুগঠিত। রাজীব প্রথমে মনে করিল, কোন নর্ত্তকী বা গায়িকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। পরক্ষণে আগন্তুকের বেশ-ভূষা অন্যরূপ থাকায় রাজীব তাহাকে অন্য কেহ স্ত্রীলোক ভাবিয়া বিস্মিত হইল।

স্ত্রীলোকটী আবার ডাকিল,—"রাজীববাবু চিনিতে পারিলেন না?"

রাজীব কণ্ঠস্বরে স্ত্রীলোকটীকে চিনিল, বলিল—"সরস্বতী?"

সরস্বতী—"হাঁ।"

রাজীব—"এত রাত্রে?"

সরস্বতী—"কথা আছে, একবার আমাদের বাটীতে যাইতে হইবে।"

রাজীব—"এই মজলিস ফেলিয়া?

সরস্বতী—"হাঁ। যাইতে হইবে না হইলে একজন মরে—স্ত্রী-হত্যা হয়।"

রাজীব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, 'আমি এখন যাইতে পারিব না। ফেলিয়া যাইলে, বন্ধু-বান্ধবেরা, নর্ত্তকী গায়িকারা আমাকে কি বলিবে?"

সরস্বতী—"আপনি যদি অত দূরে না যাইতে পারেন, ঐ বকুল-

গাছতলায় একজন লোক আপনার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। সেই খানে একবার আসুন। সেত অধিক দূর নয়। এখনি ফিরিয়া আসিবেন।"

রাজীব—"লোকটা কে ?"

সরস্বতী—"দেখিলেই জানিতে পারিবেন।"

রাজীব অনিচ্ছার সহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে চলিল। এমন মজলিস্ ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে চাহিতেছিল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্য দিয়া রাজীব ও সরস্বতী নিস্তব্ধভাবে চলিতে লাগিল এবং যথাসময়ে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বৃক্ষতলে একটী পরম রূপবতী স্ত্রীলোককে দেখিয়া রাজীবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিছু বলিবার পুর্ব্বেই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি রমণীর দেহ-যষ্টি রাজীবের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইল।

বলিল—"রাজীব বাবু! আমাকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীলোকের এ ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমি আপনার রূপে পাগল। আমি উন্মত্তা, আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, সেই নিশিথ কালে ঘোর অন্ধকার মধ্যে বৃক্ষ-পাদমূলে ধুলি-আসনে আসীনা রমণী রাজীবের নিকট নিজের ধৃষ্টতার জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের তরঙ্গ-স্রোতে রমণী-হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাব ধরিয়াছে। যেখানে কাঠিন্য ছিল,সেখানে কোমলতা আসিয়াছে। যেস্থান গর্ব্বের আবাসভূমি ছিল, সেখানে এখন বিনয় আসিয়া জুটিয়াছে। রমণী রাজীবকে আরো কত কথা বলিল। রাজীব চিনিল কৌশল্যা, কৌশল্যা তাহার চরণ তলে জীবন যৌবন, সৌন্দর্য্য ভালবাসা, প্রেম সকলই বিলাইতে চাহিতেছে। পাপীষ্ঠ রাজীবের তাহাতে ক্ষতি কি ?

কৌশল্যা বলিল—"আমি তোমার ধন চাই না, ভালবাসা না দেও দিও না। তোমাকে আমি দেখিতে চাই—তোমাকে কয় দিন না দেখিয়া আমি পাগল হইবার যো হইয়াছি। হয় বল আমাকে দেখা দিবে, নতুবা আমি এখনি চিত্রানদীতে ঝাঁপ দিয়া সব যাতনার শেষ করিব।" কৌশল্যার এ কথাগুলি কৃত্রিম নহে। পূর্ব্বেই কপটতা প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল, চাতুরী আর সে হৃদয়ে নাই। এখন সকলই অকৃত্রিম অকপট সরল মধুর রাজীবের হৃদয় ভিজিয়া গেল। সে বলিল—"আমায় কোথায় যাইতে হইবে।"

কৌশল্যা—"আমার বাটীতে।"

রাজীব—"আজই এখনি।"

কৌশল্যা—"তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

রাজীব বলিল আমি কাল সন্ধ্যার পর নিশ্চিত যাইব। সরস্বতী তখন সেখান হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল। রাজীব কৌশল্যার হাত ধরিয়া তাহাকে আপন পদপ্রান্ত হইতে তুলিয়া আপন বক্ষে ধারণ করিল। কৌশল্যা রাজীবের বক্ষঃস্থলে মাথা দিয়া স্বর্গসুখ তুচ্ছজ্ঞান করিল।

রাজীবের সহিত কৌশল্যার বেশ দেখা শুনা চলিতে লাগিল। রাজীবের তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অনেক যত্নে অনেক যাতনা পাইয়া রাজীবকে কৌশল্যা হস্তগত করিয়াছে তজ্জন্য কৌশল্যার ক্ষতির সীমা নাই।

কৌশল্যা একদিকে হৃদয়হীন রাজীবের চরণে আপনার হৃদয় বলিদান দিয়াছে। তাহাকে এমন দুর্দমনীয় অর্থ-লালসাকে বিসর্জ্জন দিয়া রাজী-

বের মনস্তুষ্টির জন্য সেই অধর্ম্ম-প্রসূত বহু-যত্ন-সঞ্চিত হৃদয়ের শোণিত-তুল্য ধনরাশি রাজীবকে হাতে তুলিয়া দিতে হইতেছে। রাজীবের দিন দিন অর্থের প্রয়োজন অধিক হইতে অধিকতর হইয়া দাঁড়াইতেছিল। সে চতুর্দ্দিকে ঋণ করিয়াছে আর কেহ ঋণ দেয় না। কাজেই সে দেওয়ানজীর অর্থ-শোষণে কৃতযত্ন হইয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছে কৌশল্যার হস্তে দেওয়ানজীর সর্ব্বস্ব। রাজীব কৌশল্যার সর্ব্বস্ব। এক সর্ব্বস্বের বিনিময়ে অপর সর্ব্বস্ব জলের মত বাহির হইতে লাগিল। কৌশল্যা বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছে। "না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।"

টাকাকড়ি সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে তাহাতে কৌশল্যার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহা না হইলে রাজীবকে পাওয়া যায় না। তাহাতেও ক্লেশ অসহ্য। হৃদয়ের শোণিত অপেক্ষা প্রিয় ধনরাশি গৃহ হইতে বাহির হইতেছে তাহাতে কৌশল্যার হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছে। মর্ম্ম-গ্রন্থি শতধা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে কিন্তু চতুরার অগ্রগণ্যা কৌশল্যা সব চাতুরী হারাইয়া পাপ-প্রণয়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

কৌশল্যা সত্যই এখন উন্মাদিনী। এ দৃশ্য জগতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। রাজীব মধ্যে মধ্যে কৌশল্যার বাটীতে আসে। না আসিলে কৌশল্যা দেওয়ানজীকে ভুলাইয়া রাজীবের "আরাম-মন্দিরে" যায়। সময় বুঝিয়া সরস্বতী ও কৌশল্যার ধন-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এদিকে সরস্বতী না হইলে কৌশল্যা রাজীবকে পায় না, কাহার সঙ্গে "আরাম-মন্দিরে" যাইবে? আবার টাকাকড়ি মুক্তহস্তে না দান করিলে সরস্বতীর মন পাওয়া যায় না। দুইদিক হইতে কৌশল্যার টাকা বাহির হইতে লাগিল।

কোন দিক রাখিবে দিনরাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া অভাগিনী কৌশল্যা উন্মাদ-গ্রস্তা হইয়া উঠিল—কৌশল্যার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া গেল সে দেখিতে দেখিতে ঘোর পাগল হইয়া দাঁড়াইল।

কৌশল্যা কেন হঠাৎ পাগল হইল গোবর্দ্ধন তাহা বুঝিতে পারিল না—কৌশল্যার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইলে গোবর্দ্ধন কৌশল্যার নিকট হইতে বাক্স সিন্দুক আলমারির চাবি গ্রহণ করিয়া টাকা কড়ি অলঙ্কার যে লোহের আলমারীতে থাকিত তাহা খুলিল, খুলিয়া দেখিল আলমারী শূন্য, সিন্দুক খুলিল—সিন্দুক শূন্য, বাক্স খুলিল—বাক্স শূন্য, কপর্দ্দক হীন। দেওয়ানজী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। দুঃখীর সন্তান গোবর্দ্ধন কত কৌশলে কত অধর্ম্মোপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, সেই অর্থ এখন কোথায়? একটা পয়সাও বাটীতে নাই—এত টাকা এত অলঙ্কার কোথায় গেল? মুক্তার মালা, হীরক-খচিত-বলয়, রত্ন-মণ্ডিত অলঙ্কার রাশি কোথায় গেল? এ বিপুল ধন কিরূপে কোথায় গেল? দেওয়ানজী অন্ধকার দেখিল। দুশ্চরিত্রা রমণীর উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিলে যে ফল হইয়া থাকে—চতুরাগ্রগণ্য দেওয়ানজীর তাহাই হইয়াছে—দেওয়ানজীর সংসার আজ শ্মশান সদৃশ; ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া, পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা এবং সর্ব্বতোভাবে সঙ্কোচ বিহীন হইয়া স্ত্রী পুরুষে যে অতুল ঐশ্বর্য্য করতলগত করিয়াছিল, এক দিন যে অর্থের প্রভাবে দেওয়ানজী সর্ব্বেশ্বরের সমকক্ষ হবে ভাবিয়াছিল—সেই অর্থরাশি দেওয়ানজীর গৃহ হইতে কোথায় গেল? কৌশল্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফল নাই সে এক্ষণে পাগল। দেওয়ানজী বিষম ফাঁপরে পড়িল। দুশ্চরিত্রা ভার্য্যা যে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী সে গৃহে যে ঐরূপ সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে

তাহাতে বিচিত্র কি ? অধর্ম্ম সম্ভূত ঐশ্বর্য্য যে ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়ী গোবর্দ্ধনের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ স্থল।

কৌশল্যার ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। সকলেই কৌশল্যার উন্মাদাবস্থায় আনন্দিত, সকলেই বলিল—কৌশল্যা যদি পাগল না হইবে, তবে রাত দিন আর কেন হইতেছে ?

কিন্তু রাজীব মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ। এমন সুবর্ণ-ডিম্ব প্রসব-কারিণী বিহঙ্গী ডিম্ব প্রসব বন্ধ করিয়াছে রাজীব তাহাতে বড়ই সন্তপ্ত। গোবর্দ্ধন স্ত্রীকে রোগোন্মুক্ত করিতে বিশেষ যত্নবান। কৌশল্যাকে ভাল ভাল বৈদ্য দেখিতে লাগিল, অনেক দাস দাসী কৌশল্যার পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সর্ব্বেশ্বর বাবু—কৌশল্যা পাগল হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, তিনি প্রচুর অর্থ দানে গোবর্দ্ধনকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনের মন অর্থ লাভে সন্তুষ্ট হইয়াছিল কিনা অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহই জানিতে পারে নাই। কৌশল্যার রোগ কিন্তু উপশম হইতে দেখা গেল না।

একদিন গোবর্দ্ধন বৈদ্যকে সঙ্গে লইয়া কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিল। কৌশল্যার সেই নবনীত কোমল হস্তপদ যুগল কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নতুবা সে নিজের শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া রক্তপাত করে। সেই কমনীয় বরবপুঃ ছিন্ন, মলিন বস্ত্রে কথঞ্চিৎ আবৃত। মুখ কালিমা জড়িত, দেহ ধূলি ধূসরিত, সুদীর্ঘ সুচিক্কণ কুঞ্চিত কুন্তল রাশি বিন্যাসবিহীন আলুলায়িত—শরীর অনাহারে উপবাসে শীর্ণ জীর্ণ। কৌশল্যা কত কি বকিতেছে, কখন হাঁসিতেছে কখন কাঁদিতেছে কখন বা বলপ্রকাশে লৌহ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাইতেছে, প্রয়াস বিফল

হইতেছে দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছে—যে কৌশল্যা নিজের বুদ্ধি গরিমায় ভগবানকে পর্য্যন্ত নির্ব্বোধ মনে করিত, যে কৌশল্যা পুরুষগণকে আপনার ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় জ্ঞান করিত—সেই কৌশল্যা আজি বালিকার ন্যায় নিতান্তই নিঃসহায়া, অপরের আশ্রয়ীভুতা। গোবর্দ্ধন বৈদ্যকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই কৌশল্যা আরক্ত-নয়নে গোবর্দ্ধনের উপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিল "স্থির হও—বৈদ্য আসিয়াছেন"।

কৌশল্যা—"হাঁ পাজি নচ্ছার টাকাগুলো সব খেয়ে পালালি, এক বারও দেখা দিলিনি।" ইদানীং রাজীব কৌশল্যার টাকা কড়ি সব ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া কৌশল্যার সহিত এক প্রকার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কৌশল্যা নিজে গোপেশ্বরের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, কৌশল্যা রাজীবের হাতে ঠিক সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছিল। ঈশ্বরের রাজত্বে পাপের প্রতিফল এইরূপই দেখা যায়।

কৌশল্যা রাজীবের ব্যবহার সম্বন্ধে ঐরূপ প্রলাপ বকিতেছিল।

গোবর্দ্ধন সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল "টাকা গুলো কে খেয়েছে? টাকা গুলো কি হলো?"

কৌশল্যা—"এত করে টাকাগুলো রেখেছিলাম, পাজী বেটা সব খেলি, বেরো পাজী।"

গোবর্দ্ধন—"কে টাকা খেয়েছে, বল কে টাকা নিয়েছে।"

কৌশল্যা। "আমার সোণার চাঁদ এনে দে, আমার সোণার চাঁদকে কে ধরে রেখেছিস্?"

দেওয়ানজী কৌশল্যার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৈদ্য কৌশল্যার নাড়ী টিপিতে নিকটে গেলেন।

কৌশল্যা। "ছুঁসুনি বেটা অধর্ম্মে প্রাণ দিলেম, তবু মায়া দয়া হলো না? টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়লি? ছুঁবিতো কামড়ে ছিঁড়ে নেবো; পাজীর বেটা পাজী, নিয়ে আয় আমার সোণার চাঁদকে, নইলে লাথী মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব। আহা, টাকাগুলো, গহনাগুলো সব খেয়ে ফেল্লে; কাঁড়া কাঁড়া টাকা, কাঁড়া কাঁড়া গহনা হায়, হায়!" এই বলিয়া কৌশল্যা কাঁদিয়া উঠিল।

অনেক কৌশলে বৈদ্য নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, বলিলেন,—"সত্য সত্যই কি টাকা কড়ি কিছু নষ্ট হয়েছে?"

দেওয়ানজী। "টাকাকড়ি, গহনা কিছুই সিন্ধুকে নাই, আর কোথায়ও যদি থাকে," গোবৰ্দ্ধন বৃথা আশায় বুক বাঁধিতেছিল, টাকা কড়ি আছে মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছিল।

বৈদ্য। "আমার বোধ হয়, টাকা কড়ি সব খোয়া গিয়াছে।"

দেওয়ানজী। "ও কথা বলিবেন না, তাহা হইলে আমাকেও ক্ষেপিতে হইবে।"

বৈদ্য। "আমি যাহা বুঝিতেছি, তাহাই বলিতেছি, টাকাকড়ি হারাইবার দরুণ আপনার স্ত্রীর বুদ্ধিবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, সোণার চাঁদ কাহাকে বলিতেছে, ইহার ভিতর গূঢ় রহস্য আছে, সোণার চাঁদ, আর টাকাকড়ি—এই দুইটা লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।"

দেওয়ানজী। "আমার স্ত্রীর নিকট কেহ ফাঁকি দিয়া লইবে বলিয়া ত আমার বিশ্বাস হয় না। টাকা কড়ি বোধ হয় অন্যত্র কোথায় রাখিয়াছে, প্রকৃতিস্থ হইলে জানিতে পারা যাইবে।"

কৌশল্যা। "তোমার গুষ্টির মাথা হইবে", এই বলিয়া কৌশল্যা

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল,---আবার বলিল "আহা, মুখখানি চাঁদের মতন, কি হাসি, হায় হায়! টাকাগুলো সব খেলে, আর যে আমি হাসতে পারিনি।" এই বলিয়া কৌশল্যা কাঁদিল, আবার গোবর্দ্ধনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও পোড়ার-মুখো কাণা, দূর হ এখান হতে, "ধরেদে আমার সোণার চাঁদ, পেতেছি প্রেমের ফাঁদ।" কৌশল্যা কাঁদিল, হাসিল, লৌহ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, না পারিয়া দাঁত দিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, গোবর্দ্ধনের চক্ষে জল আসিল, কৌশল্যা তখন জোর করিয়া আবার শৃঙ্খল ছিঁড়িতে গেল পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল আবার হাসিল। বৈদ্য ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন স্ত্রীর নিকট অনেকক্ষণ রহিল। অনেক বুঝাইল, কৌশল্যা সকল কথাতেই, "সোণার চাঁদ আনিয়া দে,না হয় টাকাগুলো সব খেলে"এই উত্তর দিল, গোবর্দ্ধনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিকে অর্থ-রাশি কোথায় গেল, অন্যদিকে স্ত্রী পাগল হইল, দেওয়ানজী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কৌশল্যা আবার চেঁচাইতে লাগিল, গোবর্দ্ধনকে কামড়াইতে গেল, দাসীদিগকে গালি দিতে লাগিল, আবার হাসিল আবার কাঁদিল। কৌশল্যা কয় দিন পূর্ব্বে ধন-গর্ব্বে, রূপের অহঙ্কারে জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিল—আর আজ? হায় মনুষ্য! এই তোমার বীর্য্য, এই তোমার ক্ষমতা! তথাপি তুমি এত নির্ব্বোধ, বুঝিয়াও বুঝ না, দেখিয়াও দেখ না শিখিয়াও শিখিতে চাহ না। যদি সংসারের অলীক সুখের দিকে ধাবিত না হইয়া, একমাত্র ধর্ম্মই তোমার লক্ষ্য হয়, ঈশ্বরের চরণে মতি রাখিয়া, যদি আপনার কর্ত্তব্যে মন দাও, সকল বিপদ, সকল যন্ত্রণা, সকল ক্লেশ হইতে দূরে থাকিবে, সংসারে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবে।

গোবর্দ্ধন কৌশল্যাকে উন্মাদ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক যত্ন, অনেক ব্যয় করিল; কিন্তু তাহার সকল যত্ন, সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কৌশল্যার আরোগ্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ইহাতে গোবর্দ্ধনের অসুখের আর সীমা রহিল না। গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারিল যে তাহার জীবনে আর সুখের সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বেশ্বর চারিদিকে যেরূপ আঁটাআঁটি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে চাকরীস্থল হইতে প্রচুর ধনাগমের আর সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে, যাহা তাহার বেতন তাহার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। ধনবান হইয়া পরিণামে সুখে স্বচ্ছন্দে যে কাটাইবে সে আশা গোবর্দ্ধনের আর রহিল না এদিকে সংসারে স্ত্রী-পাগল, সকল কাজ-কর্ম্ম দাসী চাকরের উপর নির্ভর করিতে হয়। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সকল আপনাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়, গোবর্দ্ধন কৌশল্যার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজই করিত না, এক্ষণে কৌশল্যা পাগল হইয়া যাওয়ায় গোবর্দ্ধনের সকল বিষয়েই বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। সংসার বড়ই বিরক্তিকর হইয়া দাড়াইল। গৃহে সেবা-শুশ্রূষার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল, যদিও কৌশল্যা গোবর্দ্ধনকে ততদূর আদর যত্ন করিত না, তথাপি সম্ভবমত সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিত—এক্ষণে দাস দাসীর উপর সমস্তই নির্ভর করিতে হইতেছিল। কাজেই সকল বিষয়েরই বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন একদিন সরস্বতীকে ডাকাইল, বলিল,—"সরস্বতী কৌশল্যা পাগল হইল কেন? তুমি কি ইহার কারণ কিছুই বলিতে পার না? তোমার কি মনে হয়? তুমিত দেখিয়াছ, সে সর্ব্বদাই "সোণার চাঁদ কোথায়" আর "টাকা খেয়ে ফেলেছে" এই দুইটি কথা বার বার বলে. ইহার

কারণ কি? ইহার মধ্যে যদি কিছু গূঢ় রহস্য থাকে, তোমারই জানিবার সম্ভাবনা। তোমাকে কৌশল্যা বড় ভালবাসিত, দুই জনে তোমাদের বেশ প্রণয় ছিল. যদি জান ত বল, ইহার ভিতর কি ব্যাপার? আমি সিন্দুক, বাক্স, আলমারী সব খুঁজিয়াছি, টাকাকড়ি অলঙ্কার কিছুই নাই। কৌশল্যার হাতে আমি সব বিশ্বাস করিয়া দিতাম, সে সমস্ত কোথায় রাখিয়াছে, কি সমস্তই নষ্ট করিয়াছে, ইহা তোমার নিশ্চয়ই জানিবার কথা; যদি জানিয়া না বল, আমি তোমাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিব, আমি জানিতে চাই, টাকা কড়ি কি হইল,—"সোণার চাঁদ সোণার চাঁদ" এ কথাই বা কৌশল্যা কেন বলে?" সরস্বতী সমস্তই গোপন করিল, সে কিছুই জানে না—বলিল।

সরস্বতী। "আমি ইহার কিছুই জানি না, গিন্নী যে কেন পাগল হইলেন, তাহার আমি কি বলিব? টাকা কড়ির কথা আমি কিছুই জানি না, তাহাতে আমাকে যা শাস্তি দিতে হয় দিন, আমি এর কিছুই জানি না।"

দেওয়ানজী। "সরস্বতী, তোমার মুখের ভাবে বোধ হইতেছে তুমি ইহার সবই জান, বলিতে হয় বল, নতুবা আমি যে প্রকারে পারি ইহার তথ্য অবগত হইব।"

দেওয়ানজী যখন দেখিল সরস্বতী কিছুই বলে না, তখন সে পুলিশে খবর দিল। দারোগা বাবু কালব্যাজ না করিয়া, দেওয়ানজীর বাটিতে আসিলেন। দেওয়ানজী দারোগাবাবুকে সকল কথা বলিল এবং যাহাতে টাকা কড়ির কিনারা হয়, সেই জন্য বারংবার উপরোধ করিতে লাগিল। পরে বলিল, এই সরস্বতী আমার স্ত্রীর প্রিয় দাসী ছিল, উহাকে টাকা কড়ির কথা জিজ্ঞাসা করায় উহার মুখ শুকাইয়া গেল। উহার মুখ দেখিয়া আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছে, যে সরস্বতী

সব কথা জানে. আপনি একটু যত্ন করিলেই সব কথা প্রকাশ হইবে ' আমার স্ত্রী প্রলাপাবস্থায় কেবল এক দুইটী কথা বলে 'সোণার চাঁদকে এনে দাও." "সব টাকা গেলে" ইহা অর্থহীন ও সম্পূর্ণ পাগলামী হইতে পারে—কেননা অনেক সময় পাগলের মনে যাহা উদয় হয়, তাহারা তাহাই বকিতে থাকে—আবার পাগলেরা অনেক সময় প্রকৃত ঘটনা স্মরণ করিয়া অনেক কথা বলে যে বিষয়ের গাঢ় চিন্তায় তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়—পাগল হইবার পর তাহারা সেই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া থাকে—আমি মনে করি এই দুই প্রকার কথার মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে, দারোগা মহাশয়. আপনি যদি রহস্য ভেদ করিতে পারেন আপনাকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার দেব যদি আমার সেই বিপুল সঞ্চিত অর্থের পুনরুদ্ধার হয় তবে আপনাকে আর পরের চাকরী করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে না। আমি আপনাকে যথেষ্ট ধন পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিব "

দারোগা মহাশয় গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে কয়বার বেশ দশ টাকা লাভ করিয়াছিলেন এবং গোবর্দ্ধনের কথায় বিশ্বাস করিতেন। এই জন্য এবারেও পুরস্কারের লোভে বদ্ধ পরিকর হইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথমে সরস্বতীকে গ্রেপ্তার করিলেন, করিয়াই তাহাকে বাঁধিবার হুকুম দিলেন এবং গোবর্দ্ধনের বাটীর অন্যান্য ঘর দ্বার সিন্দুক বাক্স সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, পরে যে ঘরে সরস্বতী শয়ন করিত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সরস্বতীর ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। সরস্বতী নিজের সমস্ত টাকা কড়ি পূর্ব্বেই সরাইয়া রাখিয়াছিল, একণে টাকা কড়ি কিছুরই অনুসন্ধান হইল না দেখিয়া দারোগা মহাশয় সরস্বতীকে পীড়ন করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

এদিকে ত্রিপুরাসুন্দরীর শারীরিক অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া আসিতেছিল। তিনি এক্ষণে আর রাজীবকে একবারে দেখিতে পান না, রাজীবকে ডাকাইলেও সে আসে না। সর্বেশ্বর ও সর্বমঙ্গলা রাজীবের চরিত্রে অতিশয় ভীত ও ক্ষুণ্ণ। প্রতিভার ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া মহা উদ্বিগ্ন। তাঁহাদের এখন পরিতাপের সীমা নাই। অন্য কোন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলে হয়ত প্রতিভা সুখী হইত—এই ভাবিয়া দুইজনে বড়ই অনুতপ্ত। আবার রাজীব শীঘ্রই শুধরাইবে এই মনে করিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইতেন। ত্রিপুরা সকল কথাই সর্বেশ্বর, সর্বমঙ্গলার মুখে শুনিয়া অধিকতর কাতর হইলেন। তিনি একদিন সর্বেশ্বর বাবুকে বলিলেন, "আমার মত অভাগিনী আর নাই—মনে করিয়াছিলাম রাজীবকে পাইয়া সুখী হইব কিন্তু আমার সে ভরসা আর নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না, আমার শেষ উপরোধ রাজীবকে শুধরাইবার চেষ্টা করিবেন, আর চারুবালার একটা ভাল জায়গায় বিবাহ দিবেন। চারুর বয়স অনেক হইল আর বিবাহ না দেওয়া উচিত হয় না।" সর্বেশ্বর বাবু ঐ দুই বিষয়েই প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং অতিশীঘ্র একটী সৎপাত্রের সহিত চারুবালার বিবাহ দিলেন। পাত্রের নাম কুলদাচরণ ঘোষ, বামাচরণবাবুর পুত্র, চিত্রগ্রামের ১০।১২ ক্রোশ দূরে বেত্রগ্রাম নামে এক স্থান, তাহার জমীদার বামাচরণ ঘোষ। বেত্রগ্রাম বেত্রবতী নদীর তীরে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। বেত্রগ্রামের জমীদার বামাচরণ বাবু সর্বেশ্বর বাবুর বিশেষ বন্ধু এবং সম্পর্কীয় লোক। বামাচরণ বাবু সর্বেশ্বর বাবুর ন্যায় অতদূর ধনবান জমীদার না হইলেও তাঁহার জমীদারীর আয় কম ছিল না বামাচরণ বাবু একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন—তাঁহার ভয়ে তাঁহার জমীদারীর

মধ্যে বাঘে গরুতে এক স্থানে জল খাইত। সর্ব্বেশ্বর বাবুর ন্যায় তিনি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু তাঁহার পুত্র কুলদাচরণ শান্ত শিষ্ট ও সেই সঙ্গে রূপবান ছিলেন। যোগাযোগে চারুবালাকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বেশ্বর নিশ্চিন্ত হইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে যথেষ্ট সুখের সঞ্চার হইল। তিনি সর্ব্বেশ্বর বাবুকে পূর্ব্ব হইতে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন একণে চারুবালার বিবাহের পর হইতে তিনি সর্ব্বেশ্বর বাবুকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সর্ব্বেশ্বর বাবু যদি সশরীরে স্বর্গে যাইতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে তিনি যে অমর বৃন্দের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে গুণে মানব স্বর্গ লাভের অধিকারী হয় সর্ব্বেশ্বর বাবুতে সেই সেই গুণ সমস্তই বিদ্যমান ছিল। বিবাহ রাত্রে ভৈরবকে পুলীশের একটা ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কেননা চারুর বিবাহের রাত্রে সে বড়ই গোল বাধাইয়াছিল। সে একবারে দৌড়িয়া পুলিশে যায় এবং দারোগা মহাশয়ের নিকট সর্ব্বেশ্বর বাবুর নামে ডাইরি করিতে চায়,বলে—"সে দিদির মত" সুন্দরী পাত্রী অনেক কষ্টে যোগাড় করিয়াছিল, পাত্রীর ও পাত্রীর মাতার তাহার সহিত বিবাহে সম্পূর্ণ মত কিন্তু দুষ্ট সর্ব্বেশ্বর তাহার মনের মত পাত্রীকে হরণ করিয়া অপরের হস্তে সমর্পণ করিতেছে" দারোগা বাবু সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট আসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বেশ্বরবাবু যখন সকল কথা ভাঙ্গিয়া দারোগা বাবুকে বলেন তখন দারোগা বাবু হাসিতে হাসিতে সেই খান হইতে চলিয়া আসিয়া ভৈরবকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখেন, কি জানি যদি সে পাগলামী করিয়া কোন একটা কাণ্ড বাধায়। বিবাহের পরদিন চারুবালা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিকারোহণে শ্বশুরালয়ে যাইবে

এমন সময় রাস্তায় সহসা বড়ই জনতা হইল ও সকলে দেখিল যে এক-জন লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়িয়া ও লাঠী ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছে এবং "আমার পরিবারকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদিগকে বাধ" বলিয়া সকলকে হুকুম দিতেছে। সর্ব্বেশ্বরবাবু বুঝি-লেন ভৈরব ক্ষেপিয়াছে। তিনি ভৈরবকে অনেক বুঝাইলেন এবং অতি সুন্দরী পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দিবেন বলিলেন কিন্তু ভৈরব বলিল "দিদির মত সুন্দরী পাত্রী না মিলিলে আমি বিবাহ করিব না --চারুবালার নাজানি কত কষ্টই হইবে সে আমাকে না পাইয়া মারা পড়িবে আপনার স্ত্রী হত্যার পাপ হইবে।"

সর্ব্বেশ্বর বাবু ভৈরবকে সান্ত্বনা করিয়া অন্য স্থানে লইয়া গেলেন। ত্রিপুরা সুন্দরীর গলা ধরিয়া চারু অনেক কাঁদিল। ত্রিপুরা সুন্দরীর দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনি বড় কাঁদিতে পারিলেন না। দেবতাদিগের নিকট করযোড়ে চারুর ও জামাতার মঙ্গল কামনা করিলেন এবং চারুকে "চিরায়ুষ্মতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাষণ্ড রাজীবও চারুকে বিদায় দিবার সময় অনেক কাঁদিল। দুইজনে অনেক কষ্ট সহিয়াছিল, সেই কথা রাজীবের মনে পড়িতেছিল এবং চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরবাবুও সর্ব্ব-মঙ্গলাকে প্রণাম করিয়া এবং ভ্রাতৃজায়ার নিকট বিদায় লইয়া চারু শিবিকা আরোহণ করিল। শিবিকার দুই পার্শ্বে রক্ষকগণ নানারূপ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চলিল। সেই দৃশ্যে ত্রিপুরার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কন্যার সুখ দর্শন করিলে মার যেরূপ আনন্দ হয় পুত্রের সুখে মাতার তত দূর আনন্দ হয় না—একথা বলিলে বোধ হয় মাতার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা হয় না। সর্ব্বেশ্বর বাবু চারুকে যৌতুক স্বরূপ বিস্তর রত্নালঙ্কার, টাকা কড়ি বসনাদি প্রদান করিলেন। চারু-

বালা মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়া বড়ই সুখী হইল। প্রতিভা চারু-বালাকে বিদায় দিবার সময় অনেক কাঁদিল। এবং "স্বামীর সুনয়নে পড়" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। প্রতিভা সমবয়স্কা হইলেও চারুর জ্যেষ্ঠ সহোদর-পত্নী, সেইজন্য প্রতিভা আশীর্ব্বাদ করিল, চারু সেই আশীর্ব্বাদের অর্থ বুঝিল। প্রতিভা যে দাদার সুনয়নে পড়ে নাই, চারু তাহা বুঝিয়াছিল। সে তখন প্রতিভার গলা ধরিয়া কাঁদিল, প্রতিভা তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আনাইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিল দুইজনে পুষ্প যুগলের ন্যায় এক বৃন্তে এত দিন ফুটিয়া রহিয়াছিল, একটী বৃন্তচ্যুত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী রাজীবকে প্রায় দেখিতে পান না। চারুর বিবাহের পর অনেক দিন কাটিয়া গেল, রাজীব প্রায় বাড়ীতেই আসে না, মধ্যে একবার মাতার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল তখন মাতাকে দুর্ব্বাক্য পর্য্যন্ত বলিয়াছিল। যে মাতা রাজীবের অদর্শনে মৃতকল্প হইয়াছিলেন, রাজীব পুনরায় আসিবে তাহাকে হয়ত আবার দেখিতে পাইবেন—এই আশায় এতদিন কোন রূপে প্রাণ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ইদানীং রাজীবের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে শুনিয়া প্রতিদিন দেবতার নিকট যে মাতা কাতর কণ্ঠে রাজীবের সুমতি প্রার্থনা করিতেছিলেন সেই মাতাকে রাজীব দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল! যাহার ক্লেশ হইবে ভাবিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী পথের ভিখারিণী হইবেন তথাপি চিত্রার জলে ডুবিবেন না একদিন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কত কষ্টে, কত দুঃখে, যাহাকে অতিথিশালায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হরিমোহন যখন রাজীবের শরীরে বেত্রাঘাত করিতেন, তখন যাঁহার নয়ন দিয়া হৃদয়ের শোণিতচ্ছটা

নেত্র-বিন্দু পতিত হইত সেই বাৎসল্যময়ী পরমারাধ্যা জননী ত্রিপুরা সুন্দরীকে রাজীব দুর্ব্বাক্য বলিল, ত্রিপুরা সেই দিন হইতে অন্ন জল ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সকল আশা ভরসা সেইদিন হইতে লোপ পাইল! কেহ আর তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিল না। একে ত্রিপুরার দেহ অতি শীর্ণ, নানা প্রকার যাতনায় হৃদয় তাঁহার শোণিত-শূন্য হইয়া আসিয়াছিল, রাজীবের সুখ হইবে সুখের দিনে রাজীব মা বলিয়া কাছে আসিবে অতি দুঃখ অতি কষ্টের পর মাতা পুত্র একস্থানে বসিয়া সুখের কথা কহিবেন, এইরূপ নানারূপ সুখ স্বপ্নে হৃদয় বাঁধিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কোনরূপে বাঁচিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে জীবন রাখিয়াছিলেন। রাজপথে, ধুলিশয্যায় কুমুদনাথের পত্নী হইয়াও শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও মরিতে চাহেন নাই। তখন রাজীবকে দেখিবার আশা ছিল। রাজীব সুখী হইবে জননীর প্রাণে সে আশা বলবতী ছিল। রাজীবের মুখ দেখিয়া তাহাকে হাসিতে মরিবেন, বড় আশা ছিল, ইদানীং রাজীবের নানারূপ চরিত্র-দোষ শুনিয়াও রাজীবের শুধরাইবার আশায় কোনরূপে প্রাণ ধরিয়াছিলেন। নব বধূকে লইয়া কিছুদিন সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সে আশাও মনোমধ্যে কখন কখনও উদিত হইত। মানুষ সহজে মরিতে চায় না, অনেক ক্লেশ সহ্য করে, অনেক বিপদ মাথায় করিয়া লয়; কত যাতনা হৃদয়ে ধারণ করে, তথাপি মরিতে চায় না, ত্রিপুরা বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন রাজীব তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিল, সেই দিন হইতে তিনি মরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সর্ব্বেশ্বর ও সারমঙ্গলা অনেক বুঝাইলেন, প্রতিভা চরণে পড়িয়া কাঁদিল কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। সর্ব্বেশ্বর রাজীবকে ডাকাইলেন ও মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজীব মাতার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল।

ত্রিপুরা সকলের অনুরোধে, উপরোধে তৃতীয় দিন আহার করিয়াছিলেন বটে,কিন্তু রাজীবের দুর্ব্বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। সপ্তাহকাল না যাইতে যাইতে ত্রিপুরা নরলীলা সম্বরণ করিলেন। সকলেই ত্রিপুরার মৃত্যুতে চক্ষুর জল ফেলিল। রাজীবও অনেক কাঁদিল। সর্ব্বেশ্বর বাবু মহা সমারোহে ত্রিপুরা সুন্দরীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন এবং ত্রিপুরার স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ গ্রামের মধ্যে বহু বিস্তৃত এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার উপর শিব মন্দির স্থাপন করিলেন। আজি পর্য্যন্ত সকলেই সেই দীর্ঘিকাকে ত্রিপুরা-দিঘী বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

মাতার মৃত্যুর পর রাজীব আরও অধিক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। দেওয়ানজীও তাই চায়, সে স্ত্রীর উন্মাদরোগে যত না দুঃখিত হইয়াছিল টাকা কড়ি যাওয়ায় প্রাণে তাহার চতুর্গুণ ব্যথা লাগিয়াছিল। কি উপায়ে আবার তাহার ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইবে, দিন রাত সে তাহাই ভাবিতেছিল—সে রাজীবকে বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, বলে—"তুমি বড় মানুষের জামাতা, এক দিন এই অতুল বিত্তের অধিকারী হইবে। তোমার কি বিষয়-কর্ম্ম দেখা সাজে? না দেখা শুনা করা তোমার উচিত? আমরা সকলে বিষয় আশয় দেখিব, তুমি বাবুগিরি করিয়া দিন কাটাইবে" ইদানীং দেওয়ানজীর সহিত রাজীবের বড়ই আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সে দেওয়ানজীর পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া সেই মত কার্য্য করিতেছিল জমীদারী-সংক্রান্ত কোন বিষয় শিখিতে চাহিত না। চক্ষে কোন বিষয় দেখিত না। ভৈরব কখন কখন রাজীবকে হিসাব-পত্র শিখাইতে চাহিত,রাজীব তাহাকে পাগল বলিয়া হাসিত ও বলিত,—"ওসব মাথা

খাযান কাজের জন্য ভগবান আমাকে সৃজন করেন নাই। তোমরা সকলে বিষয় কর্ম্ম চালাও আর আমি এক দিকে থাকিয়া অল্প স্বল্প সুখভোগ করি” ভৈরব তাহাতে সম্মত,কেননা সে নিজে হিসাব পত্র না দেখিলে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বিষয় সম্পত্তি থাকে কি প্রকারে? সর্ব্বেশ্বর বাবুর বড়ই অদৃষ্টের জোর, তাই তাহার মত হিসাবের লোক মিলিয়াছে। গোবর্দ্ধন, সর্ব্বেশ্বরের ও রাজীবের সর্ব্বনাশে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসংকল্প ছিল এক্ষণে নিজের সর্ব্বস্ব অপহরণ হওয়ায় সে সঙ্কল্প অধিকতর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে রাজীবের অধীনে সেই ভিখারিণী পুত্রের অধীনে, অতিথিশালার পরিচারিকার পুত্রের অধীনে কার্য্য করিতে হইবে, ইহা তাহার অসহ্য, শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় রাজীবের পদলেহন করিতে হইবে দেওয়ানজী তাহা পারিবে না, অথচ সে এমন আয়ের কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না কাজেই রাজীবের সর্ব্বনাশে সে তৎপর হইল। রাজীবকে নানারূপ কুপরামর্শ দিতে লাগিল। তাহাকে যতদূর পারে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল এবং অসচ্চরিত্র লোক জন জুটাইয়া তাহাদিগকে রাজীবের মোসাহেব করিয়া দিল। নির্ব্বোধ বিবেক শক্তি হীন রাজীব অল্প দিনের মধ্যে কুসংসর্গে সর্ব্বপ্রকার পশু-বৃত্তি শিক্ষা করিল। এ দিকে সর্ব্বেশ্বর জীবিত থাকিলে শীঘ্র তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না, সর্ব্বেশ্বরের তত্ত্বাবধানে যতদিন বিষয় থাকিবে ততদিন তাহাতে বড় দন্তস্ফুট চলিবে না, এই জন্য যাহাতে সত্বরে রাজীবের হস্তে বিষয়ের ভার পতিত হয় গোবর্দ্ধন তাহাই চিন্তা করিতেছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে সর্ব্বেশ্বর বাঁচিয়া থাকিতে তাহার আশা পূর্ণ হইবে না, সে রাতারাতি বড় মানুষ হইতে পারিবে না, তাহার ধনভাণ্ডার আবার বিপুল ধনে পরিপূর্ণ হইবে না। গোবর্দ্ধন হৃদয়ের শোণিত-বিন্দু সদৃশ ধনরাশি হারাইয়াছে—সেই ধন

রাশির স্থান আবার কিরূপে পূর্ণ করিবে? সর্ব্বেশ্বর জীবিত থাকিতে তাহার সে আশা দুরাশা মাত্র—গোবর্দ্ধনের হৃদয়ে অর্থতৃষ্ণা বড়ই বলবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বেশ্বরের মৃত্যুর পর নির্ব্বোধ রাজীবের হস্ত হইতে সমস্ত জমীদারী কাড়িয়া লইবে এবং আপনি সেই বিশাল জমীদারীর মালিক হইবে এই দুরাশা ইদানীং দেওয়ানজী হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিল। আমাদের আশার গতি অতি ধীর। আশা অতি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে আমাদিগের হাত ধরিয়া আমাদিগকে জীবন পথে অগ্রসর করে, কিন্তু হায়! দুরাশার গতি বড়ই ক্ষিপ্র, সে ধীরে যাইতে চায় না,সাবধানে লইয়া যাইতে পারে না, সে আমাদিগকে ক্ষিপ্রগতিতে অন্ধকারময় কণ্টকাবৃত সংসার-কাননের মধ্য দিয়া টানিয়া লইতে চায়,তাহাতে যে দুরাশা পরিচালিত দুর্ভাগা-জীবের দেহ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? গোবর্দ্ধনও অদ্য সেই দুরাশার দাস। সে ধনতৃষ্ণায় বিবেক বিহীন, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, সে সর্ব্বেশ্বরের মৃত্যু ও রাজীবের সর্ব্বনাশ একসঙ্গে দেখিতে চায়। সে আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহা পাপকর্ম্মসম্পাদনে পশ্চাৎপদ নহে। সে একে মহা কুটিল, কপটতা তাহার একমাত্র ব্যবসায়, সে রাজীবকে আপন চাতুরী জালে অনেক দিন হইল জড়াইয়াছে। এক্ষণে আপনার চিরাভ্যস্ত কুটিলভাব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একদিন রাজীবকে বলিতেছিল যে, "রাজীব, তোমার সঙ্গে আমার একটী অতিশয় গোপনীয় কথা আছে, প্রকাশ হইলে তোমারই তাহাতে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। আমি তোমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, বাল্যকালে তোমাদের বাড়ীতে আমি প্রতিপালিত, তোমার পিতা মাতা আমায় প্রাণে বাঁচাইয়াছিলেন। সেই উপকারের পরিশোধ আমি এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই, এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত।"

খাবের নিকট হইতে খাজনার ছাড় করাইতে আসিয়াছিল। সর্ব্বেশ্বর বাবু তাহাকে একটা রেহাই লিখিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। রাজীবকে কাছে বসাইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু কত আদর করিতেছেন এমন সময় একটা গুড়ুম শব্দ হইল। একটা গুলি রাজীবের হস্তের অঙ্গুলি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সর্ব্বেশ্বর যেমন উঠিবেন একটা গুলি আসিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া গেল "বাপ রে" বলিয়া তিনি সেখানে পড়িলেন। ক্ষুদিরাম ও রাজীব ভয়ে পলাইয়া গেল দারবানগণ দ্রুত বিক্ষেপে সেই স্থানে আসিতে লাগিল। এমন সময় সকলে দেখিল যে দেওয়ানজী একটা পিস্তল হস্তে দৌড়িয়া পলাইতেছে—তাহাকে ধরিতে সকলে ছুটিল—সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল দেখাইল। দরওয়ান সকল ভয়ে পলাইয়া গেল। ক্ষুদিরাম দূর হইতে সব দেখিতেছিল. সে রাস্তার অন্য দিক দিয়া গিয়া গোবর্দ্ধনকে পেছন হইতে ধরিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে জড়াজড়ি হইতে লাগিল। ক্ষুদিরামের বয়স হইয়াছিল সে প্রাণ-পণে দেওয়ানজীকে চাপিয়া রহিল। এমন সময় রাস্তায় জন কয়েক লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—তাহার মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন। সকলে দেওয়ানজীকে বাঁধিয়া ফেলিল—যখন সকলে শুনিল যে সর্ব্বেশ্বরকে গোবর্দ্ধন গুলি করিয়া মারিয়াছে, তখন সকলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল—আহা এমন দেব সদৃশ লোক ভূমণ্ডলে কি জন্মগ্রহণ করে? এইরূপে সকল লোক বিলাপ করিতে লাগিল—পণ্ডিত মহাশয় কিন্তু সকল লোকের উপর বড় রাগ করিতে লাগিলেন বলিলেন—"আমি ত সর্ব্বেশ্বরের কোন গুণ দেখি না" তিনি একবার সর্ব্বেশ্বরের নিকট টাকা ধারের জন্য গিয়াছিলেন তিনি ৫০০৲ টাকা ধার চাহেন সর্ব্বেশ্বর বাবু [illegible]

১০০৲ টাকা অমনি দিয়া বিদায় করেন, বলেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি লেন দেন করিতে চাহেন না। সর্বেশ্বর বাবুর এই মহাপাপের জন্য পণ্ডিত মহাশয় সর্বেশ্বরের উপর মহা চটিয়াছিলেন। কিন্তু সেই একশত টাকা লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই। এক্ষণে পণ্ডিত মহাশয় সর্বেশ্বর বাবুকে মহাপাপী নরাধম বলিয়া সকল লোকের সমক্ষেই গালি দিতে লাগিলেন।

রাজীবের অঙ্গুলীতে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বড় গুরুতর রূপে লাগে নাই। রাজীব তৎক্ষণাৎ গোবর্দ্ধনকে পুলিশে পাঠাইয়া দিল। এবং দারোগাকে অর্থদানে বশীভূত করিয়া গোবর্দ্ধনের শাস্তির আয়োজন করিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনের আর সে দিন নাই দারোগা তাহার নিকট ৫০০০৲ টাকা চাহিলেন, বলিলেন "গোবর্দ্ধন বাবু আপনি আমার পরম বন্ধু অনেক দিন আপনার নিকট অনেক খাইয়াছি এইজন্য আপনার উপর আমি কোনরূপ পীড়াপীড়ী করিব না আপনি আমাকে ৫০০০৲ টাকা দিন আপনাকে আমি [illegible]ইয়া দিতেছি" গোবর্দ্ধন কোন উত্তর করিলনা—কৌশল্যা [illegible]য়াছে সমস্ত টাকা কড়ি খোয়া গিয়াছে রাজীব তাহার হাতছাড়া হই-[illegible]ছে [illegible] সর্বেশ্বরকে হত্যা করিয়াছে আর তাহার বাঁচিয়া ফল কি? [illegible] বাঁচাইতে [illegible] ষড়যন্ত্রের কথা আপন কাণে শুনিয়াছে, সে আপনাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিলনা। রাজীবকে মারিতে [illegible] না [illegible] এই দুঃখ রহিয়া গেল।

[illegible] আসিয়া কৌশল্যার সৎকার করিল। ইহ জন্মেই [illegible] হইল। সেই সময়ে ভৈরব চাকলাদার

রাজীব দেওয়ানজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন দেওয়ানজী বলিতে লাগিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি সর্ব্বেশ্বরবাবুর সমস্ত জমীদারীর অধিকারী হইবে। তুমি তোমার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সুখে রাজ্যভোগে দিন কাটাইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্লাদের বিষয় কিছুই নাই। আমি যতদিন পারিব তোমার সেবায় দিন কাটাইব, তুমি বহু স্থানে ঋণ করিয়াছ, সেই সমস্ত ঋণ যাহাতে পরিশোধ হয় সে বিষয় আমি দিন রাত্রি ভাবিতেছি। তোমার শ্বশুর মহাশয় ঐ সমস্ত ঋণের বিষয় জানেন না এবং জানিলেও তিনি তাহা পরিশোধ করিবেন না, তোমাকে জেলে বাস করিতে হইবে। তারপর আমি যাহা শুনিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তোমায় পথের ভিখারী হইতে হইবে"।

রাজীব—"কথাটা কি আপনি খুলিয়া বলুন।"

গোবর্দ্ধন—"আমি শুনিতেছি তোমার শ্বশুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন এবং তোমাকে মাসহারা স্বরূপ কিছু কিছু দেবেন। প্রতিভার নামে কিছু সম্পত্তি লিখিয়া দিবেন তাহাতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। তাহাও যৎসামান্য।"

রাজীব—"শ্বশুর মহাশয় যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন আপনাকে কে বলিল?"

গোবর্দ্ধন—"কাহাকেও বলিও না তোমার শ্বশুরই আমাকে বলিয়াছেন।"

রাজীব গোবর্দ্ধনের কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গোবর্দ্ধন—"তিনি বলিয়াছিলেন যে রাজীব যেরূপ অধঃপাতে গিয়াছে তাহাতে তাহার হস্তে আমার বিষয় দুইদিনেই বিক্রয় হইয়া যাইবে, সেইজন্য এবং পরলোকে-সদ্গতির জন্য আমি

পোষ্যপুত্রগ্রহণ করিব, রাজীব এবং প্রতিভার জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা করিব।"

রাজীবের এই কথায় মুখ শুকাইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন আবার বলিতে লাগিল "তুমি তোমার শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কখনই এ কথা স্বীকার করিবেন না; কেন না তাহা হইলে তুমি পোষ্যপুত্র লইবার বিষয়ে অনেক বাধা-বিঘ্ন দিবে, অনেক আপত্য উঠাইবে। আমি জানি পোষ্যপুত্র লইবার জন্য উপযুক্ত একটী বালকের অনুসন্ধান হইতেছে।"

রাজীব—"আমি কখনই শ্বশুর মহাশয়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে দিব না।"

গোবর্দ্ধন—"একার্য্য এখানে সম্পন্ন হইবে না। তিনি কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাইবেন এবং পোষ্যপুত্র লইবার সমস্ত কার্য্য সেই-খানে শেষ করিবেন।"

রাজীব একবার শুনিয়াছিল যে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিবেন; এখন সেই কথায় ও গোবর্দ্ধনের কথায় মিলিয়া যাওয়ায় রাজীব গোবর্দ্ধনের সকল কথায় বিশ্বাস করিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল এবং পূর্ব্ব দুর্দ্দশার কথা স্মরণ হইল। পূর্ব্বের সমস্ত কষ্টের কথা মনে পড়িল। বর্ত্তমানের সুখ, সূর্য্যোদয়ে শিশির-বিন্দুর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে—সেই ভাবনা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। আরাম-মন্দিরের সুখ, সুরাদেবীর আরাধনায় অতুলনীয় আনন্দ, মোসাহেবগণের শ্রুতিমধুর চাটুবাক্য, নর্ত্তকীগণের হৃদয়মাতান নৃত্য, গায়িকার সেই সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সমস্তই অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইবে; সেই অতিথিশালার ক্লেশ, হরিমোহনবাবুর তাড়না, পূর্ব্বের অনাহার উপবাসের যন্ত্রণা সমস্তই যেন একে একে রাজীবের স্মরণ-পথে

উদিত হইতে লাগিল; তাহাতে তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া গেল। গোবৰ্দ্ধন বেশ বুঝিল— ঔষধ ধরিয়াছে।

তখন রাজীব গোবৰ্দ্ধনের নিকট অতি কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ইহার উপায়?"

গোবৰ্দ্ধন—"ইহার উপায় নাই তবে।"—জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন জীবনের মায়ায় ভাসমান সামান্য তৃণকেও অবলম্বন করিতে চায়, তেমনি রাজীব গোবৰ্দ্ধনের মুখ-নিঃসৃত "তবে" এই শব্দটী শ্রবণ করিয়া কতক আশ্বস্ত হইল। সে বলিল "তবে কি করিতে হইবে বলুন—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," এই সম্পত্তি হস্তগত করিতে যদি আমাকে চিরনরকে বাস করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। বলুন আমাকে কি করিতে হইবে।"

গোবৰ্দ্ধন—"সর্ব্বেশ্বরবাবু বাঁচিয়া থাকিতে পোষ্যপুত্র গ্রহণ অনিবার্য্য তবে"—

রাজীব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি?"

গোবৰ্দ্ধন—"সে তোমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। বিষয় আশয় সবই তোমার হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে, রক্ষা হইবে না।"

রাজীব—"কতদিনের মধ্যে পোষ্যপুত্র লওয়া সম্ভব?"

গোবৰ্দ্ধন—"অতি অল্পদিনের মধ্যে।"

রাজীব—"তবে উপায়?"

গোবৰ্দ্ধন রাজীবের কাণে কাণে কি বলিল রাজীব তাহা শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল ও তাহার মুখ মলিন হইয়া যাইল।

গোবৰ্দ্ধন—"ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

রাজীব বলিল—"আমি ইহাতেই প্রস্তুত, তবে বিষ-প্রয়োগের সুযোগ কোথায় ?"

গোবর্দ্ধন রাজীবকে অতি সাবধানের সহিত কার্য্য সমাধা করিতে বলিয়া বলিল—"দেখ যেন ঘুণাক্ষরে কেহ না জানিতে পারে, তুমি সর্ব্বেশ্বরবাবুর তাম্বুলে কোনরূপে বিষ সংযোগ করিয়া দিবে, তাঁহার বৈঠকখানায় চাকরেরা তাম্বুল রাখিয়া যায় সেই সময় অতি সাবধানে এই কার্য্য করিবে। পাপিষ্ঠ রাজীব তাহাতেই সম্মত হইল। রাজীব ও গোবর্দ্ধন দুইজনেই ঘোর পাপী, তবে উহাদের মধ্যে যে কে অধিক পাপী, তাহার উত্তর গ্রন্থকার পাঠকদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিজে সে উত্তর-দানে বিরত রহিলেন।

প্রতিভা বালিকা, সে স্বামী সন্নিধানে আসিতে এখনও শঙ্কা ও লজ্জায় জড়ীভুত হয়। রাজীব ও বালিকা স্ত্রীর সহবাসে থাকিতে চায় না, তাহার সহিত তত মিশামিশি করে না; এইরূপে প্রায় ২।৩ বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ প্রতিভার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিল। প্রতিভা স্বামীর মর্ম্ম এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, স্বামীর কুচরিত্রের কথা শুনিয়াছে, ভাবগতিকে সব বুঝিয়াছে এখন স্বামীকে সুপথে আনিবার জন্য প্রতিভা মহা ব্যস্ত। সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিভার মনের অবস্থা বুঝিয়া মহা দুঃখিত। সাধের প্রতিভা, আদরের প্রতিভার চক্ষে জল ধরে না—ইহা কি তাঁহাদের সহ্য হয় ? কিন্তু আর উপায় নাই। হিন্দুর ঘরে স্বামীর অত্যাচার নীরবে স্ত্রীকে সহ্য করিতেই হয়। জামাতার কুব্যবহার কন্যার পিতামাতাকে মাথা পাতিয়া ধারণ করিতে হয়। এখানে দেবতার প্রসন্নতা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-মঙ্গলা সেই দেবতার নিকট প্রতিভার মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন মাথা

খুঁড়েন, কাতর-কণ্ঠে রাজীবের সুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু দেবতা যে কারণেই হউক সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলার কথা কাণে তুলিলেন না। চিরসুখী সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলা কন্যার বিবাহের পর বড়ই অসুখী হইয়া পড়িলেন। প্রতিভার ত কথাই নাই। প্রতিভা হতাশ-হৃদয়ে ভগবানের নিকট স্বামীর মঙ্গল-কামনা করে, স্বামী যাহাতে সুপথে আসেন প্রতিভা সেইজন্য করযোড়ে দেবতার নিকট বর মাগে। আর সে দিবানিশি আপনার মৃত্যু-কামনা করে। যাতনা বড় অসহ্য না হইলে এ সাধের জীবন কেহই ছাড়িতে চাহে না। প্রতিভার যাতনা বড়ই দারুণ হইয়াছে, প্রতিভা দুঃখ কাহাকে বলে কিছু জানিত না। কত কত দাস-দাসী ইঙ্গিত-মাত্র যাহার সন্তোষ-সাধনে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত, যাহাকে সুখী করিবার জন্য পিতামাতার নিয়ত যত্ন, অজস্র ধন বিতরণে যে প্রতিভার পিতামাতা তাহার সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সতত তৎপর, সেই প্রতিভা সর্ব্বসুখ ভোগের মধ্যে একের নিষ্ঠুরাচরণে সতত ভগবানের নিকট মৃত্যু পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহে। হায়! জগতে সুখ কত বিরল। এক জনের জন্য সর্ব্বেশ্বরের পরিবারের মধ্যে কি ঘোর অন্তর্দাহ, কি মানসিক যন্ত্রণা সংঘটিত হইয়াছে। সেই একজন ইচ্ছা করিলেস কলের জীবনে কত সুখের সমাগম হয়, মরুর মধ্যে নয়নানন্দদায়ক ঘন-পল্লব-সমন্বিত বৃক্ষরাজীর উৎপত্তির ন্যায়, সংসার মধ্যে যাতনার ঘোর বিকট আকৃতির স্থলে, শান্তির কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়; কিন্তু কি বিধাতার লীলা সেই একজনের কখনই সেরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হইবে না। বালকের তর্জ্জনী হেলনে পর্ব্বত যদি বা কখন স্থান চ্যুত হয়,মানব-হৃদয়ের পরিবর্ত্তন-সাধন তাহা অপেক্ষা অধিক অসম্ভব—অধিক দুরূহ! ইহাই মনুষ্য-জন্মের সুখ। ইহাই মনুষ্য-জন্মের পরিণাম

সর্ব্বেশ্বরবাবুর অন্দর বাটীর একটী বৃহৎ সুরম্য প্রকোষ্ঠে প্রতিভা একাকিনী শয়ন করিয়া আছে। প্রকোষ্ঠটি যেমন বৃহৎ, তেমনি সুসজ্জিত, রৌপ্য-নির্ম্মিত পালঙ্ক, তদুপরি দুগ্ধফেননিভশয্যা রৌপ্যাধারে নয়ন স্নিগ্ধকর আলোকাধারের মধ্যে মৃদু মৃদু আলোক জ্বলিতেছে, রাত্রি দুই প্রহর অতীত। প্রতিভা একাকিনী শয্যায় শুইয়া মন মন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও যাতনা-ব্যঞ্জক নানারূপ অস্ফুট-বাক্যে হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিতেছে। প্রতিভা যতই নিদ্রা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে—নিদ্রাদেবীর আলিঙ্গন যতই প্রার্থনা করিতেছে—নিদ্রাদেবী ততই প্রতিভাকে ব্যঙ্গ করিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। প্রতিভা একাকিনী সেই সুরম্য শয়ন-গৃহে সেই সুকোমল সুললিত শয্যার উপরে শুইয়া যাতনায় ছট্‌ফট করিতেছে প্রতিভা রাজীবের আগমন-আশায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে সে আশা বিফল মনে করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু উৎকণ্ঠার দারুণ পীড়নে চিত্ত ব্যাকুল, নয়ন নিদ্রা-বিহীন, অধিকন্তু অশ্রুজল-সিক্ত। হায়, যে প্রতিভা বাল্য-জীবনে দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না, পিতামাতার নয়নের পুতলি, অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, সুন্দরীর অগ্রগণ্যা, সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-মণ্ডিতা সরল-হৃদয়া, কপটতাপরিশূন্যা, প্রিয়বাদিনী, পরদুঃখ-কাতরা, সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা, সুশীলা প্রতিভা আজ কি পূর্ব্বজন্মের মহাপাপ বশতঃ স্বামী-বিরহে স্বামীর নির্ম্মমতায়, নিষ্ঠুরতায়, হৃদয়বিহীন ব্যবহারে, মৃত্যুর সর্ব্বদুঃখহর ক্রোড়ে শয়ন করিবার জন্য লালায়িত। বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান প্রত্যেক মানুষের জীবনে, সুখ-দুঃখের পরিমাণ

সমভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কাহাকে নিরবিচ্ছিন্ন সুখে সুখী, কাহাকে বা চির-দুঃখে দুঃখী থাকিতে দেখা যায় না। তুমি ধনী, ধন-গর্ব্বে মহা গর্ব্বিত—বিলাসিতায় আকণ্ঠ-নিমজ্জিত, অপরে তোমায় লক্ষ্মীর বরপুত্র মনে করিয়া সকল সুখের অধিকারী মনে ভাবিয়া হিংসানলে জর্জ্জরিত; কিন্তু তুমি হয়ত তোমার বনিতার হৃদয়বিহীন আচরণে অহোরাত্র মর্ম্মপীড়িত, হয়ত দুর্বৃত্ত তনয়ের ঘোর অত্যাচারে অন্যায় ব্যবহারে তোমার পরিবারস্থ সকলের হৃদয় যাতনা-বিষে জর্জ্জরিত, তোমার আহারে রুচি নাই, সুখ-ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যেও তোমার সুখ নাই, লোকের সমক্ষে আপনাকে যতই সুখী বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা কর না কেন, তুমি তোমার হৃদয়ের যাতনায় দিবানিশি জ্বলিতেছ, যতই সুখী মনে করিয়া তুমি আপনার মনকে পর্য্যন্ত প্রতারিত করিতে চাহ না কেন কিন্তু তোমার মন বুঝে না, হৃদয় প্রতারিত হয় না, মন মনের কথা সব তোমার কাণে তুলিয়া দিয়া অহর্নিশ তোমাকে যাতনা-বিষে দগ্ধ করিতেছে; আবার আমি দরিদ্র, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য আমি লালায়িত, লাঞ্ছনা অপমান আমার দেহের অলঙ্কার, ভগ্ন কুটীরে দারা, পুত্রের স্থানাভাব, শয্যার অভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত-দেহে আমাকে রাত্রি-যাপন করিতে হয়, কঠিন-হৃদয় ধনিগণের দ্বারদেশে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য আমাকে আর্ত্তনাদ করিতে হয়, কিন্তু আমার গৃহে আমার সুশীলা কন্যা, বিনয়ী-তনয় আমার আদেশ পালনে সতত তৎপর, পিতার দুঃখ-মোচন-চেষ্টায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বামীর সেবায়, স্বামীর সুখ-সাধনে দিবানিশি ব্যাকুল। আমার সংসারে আমি স্বর্গসুখ উপভোগ করি। তবেই তোমার সুখ-দুঃখের সমষ্টি আমার দুঃখ সুখের সমষ্টির সমান। সে যাহা হউক সেই নিয়-

মের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজ প্রতিভা—ধনজন সম্ভূত সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হইয়াও ঘোর যন্ত্রণায় প্রপীড়িতা, আজ প্রতিভা পিতার সমস্ত ধনের বিনিময়ে যদি মুহূর্ত্তেকের সুখের অধিকারিণী হইতে পারে, নিমিষের জন্য যদি শান্তি-সুখ লাভ করিতে পারে, তাহাতে সে নিশ্চয়ই সম্মত—রাজীবকে আনিয়া দেও—রাজীবের মতিগতি ফিরুক, রাজীব প্রতিভাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসুক, প্রতিভাকে প্রাণাধিকা বলিয়া বক্ষে ধারণ করুক, তাহাকে একবার প্রতিভা বলিয়া ডাকুক। প্রতিভা পিতার সর্ব্বস্ব অকাতরে বিসর্জ্জন করিবে, প্রতিভা অনাহারে উপবাসে পর্ণশালায় ধূলি-শয্যায় দাস-দাসী বিরহিতা হইয়া রাজীবকে লইয়া কাল কাটাইবে; কিন্তু পিতার সেই সুরম্য অট্টালিকার সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া রাজীবের বিরহে, রাজীবের অদর্শনে থাকিতে চাহে না।

প্রতিভা কত কাঁদিল, চক্ষের জল কতবার মুছিল। সকাতরে ভগবানের নিকট স্বামীর সুমতির জন্য কতবার প্রার্থনা করিল। আবার কতবার কাঁদিল, কতবার চক্ষের জল চক্ষে শুকাইল। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। রাজীব টলিতে টলিতে প্রতিভার গৃহে প্রবেশ করিল ও টলিতে টলিতে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল

প্রতিভা নানারূপ চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল। স্বামীর আগমন তখন জানিতে পারে নাই। চেয়ারে বসিবার সময় শব্দ হওয়ায়, প্রতিভার সেইদিকে দৃষ্টি পতিত হইল। প্রতিভা ইতিপূর্ব্বে ভগবানের নিকট স্বামীর মিলন-কামনা করিতেছিল। এক্ষণে গৃহমধ্যে স্বামীকে

প্রাপ্ত হইয়া দেবতার কৃপা মনে করিল। এবং সশব্যস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া, রাজীবের নিকট গমন করিল। রাজীব নেশায় বিহ্বল ছিল। প্রতিভাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, অস্পষ্ট, অসংযত, অসম্বদ্ধ কথায়, প্রতিভাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিল। রাজীব মদ্যপান করিত, প্রতিভা তাহা জানিত। রাজীবের অবস্থায় প্রতিভা বিস্মিত হইল না। সে রাজীবের কথা না শুনিয়া রাজীবের নিকট আসিয়া বসিল, রাজীব বলিল—"আমি আজ রাত্রে থাকিতে পারিব না। তুমি শীঘ্র আমাকে কিছু টাকা দাও। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। বন্ধু-বান্ধবেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

প্রতিভা—"আজ আমি তোমাকে ছাড়িব না। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমি যত টাকা চাও দিব, কিন্তু সে কাল প্রাতঃকালে। এখন অনেক রাত্রি হইয়াছে, এস বিশ্রাম কর।"

রাজীব—"না—না, টাকা দাও, টাকা চাই।"

প্রতিভা—"দেখ, তোমাকে পাইবার জন্য আমি দিনরাত কাঁদিতেছি, আর তুমি একদণ্ড আসিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছ "

রাজীব—"ওসব কথা ছাড়, সব জায়গায় ঐ কথা। টাকা দেবে—না যাব?"

প্রতিভা—"টাকা দেব, যেও না। মাথা খাও উঠলে যে, আমি যেতে দিব না, কই তুমি যাও দেখি।" এই বলিয়া প্রতিভা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। রাজীব চলিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। যখন প্রতিভা দেখিল,—রাজীব চলিয়া যায়,—তখন সে রাজীবের পদদ্বয় ধারণ করিল এবং নিজের মস্তক রাজীবের চরণের উপর রাখিল। অতুল ধনের অধিপতি সর্ব্বেশ্বরের আদরের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার কত সাধের প্রতিভা—পথের ভিখারী—রাজীবের পদতলে

বিলুণ্ঠিতা। বঙ্গ-কুলরমণী বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্বামীর প্রণয়ের একমাত্র ভিখারিণী। বঙ্গ-কুলরমণী সব ছাড়িতে পারে, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা ছাড়িতে পারে না। দুর্ভাগ্য যাহারা তাহারাই এই মধুর প্রণয়াস্বাদনে বঞ্চিত হয়।

রাজীব প্রতিভাকে পদদ্বয় ধারণ করিতে দেখিয়া, কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পাপিষ্ঠ পদাঘাতে, প্রতিভাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে চাহিল। এদিকে দাসীরা বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। রাজীব দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল, তথাপি দ্বার খুলিল না। প্রতিভাও জানিত না যে দাসীরা দ্বার বন্ধ করিয়াছে। প্রতিভা—দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন সেই জন্য দ্বার খুলিতেছে না মনে করিয়া হৃদয়ে দ্বিগুণ বল ধারণ করিল ও রাজীবের নিকট আসিয়া রাজীবের হাত ধরিল এবং সবলে তাহাকে শয্যায় লইয়া গেল, এবং মস্তকে গোলাপজল দিয়া রাজীবকে স্বয়ং ব্যজন করিতে লাগিল। এইরূপে সে নানা প্রকারে রাজীবের সন্তোষ-সাধনে যত্নবতী হইল। প্রতিভা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া পদাঘাত-যাতনা ভুলিয়া গেল। ধন্য বঙ্গবালা! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা, বাঙ্গালীর ঘরে তুমি শ্রীস্বরূপিণী বাঙ্গালীর ঘরে তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তুমি বাঙ্গালীর ঘরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপিণী। তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বংসহা অপেক্ষা ধৈর্য্যশীলা। পৃথিবী মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, তাহার সাহায্যে বিধাতা তোমার হৃদয় সৃজন করিয়া দুঃখ-নিপীড়িত বঙ্গবাসীর গৃহে তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, ভগবান অনন্ত, অসীম, অকৃত্রিম প্রেম তোমার হৃদয়ে গুপ্ত করিয়া রাখিয়া

বঙ্গবাসীকে অনন্ত-সুখে সুখী করিয়াছেন। তিনি এক হস্তে দেবতাকে অমৃতদানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, অন্য হস্তে বঙ্গ-রমণীর হৃদয়ে সুধামাখা প্রেম স্থাপন করিয়াছেন। এ দৃশ্য জগতে অতি বিরল।

সুকুমারী-প্রতিভা অনায়াসে অক্লিষ্ট-হৃদয়ে রাজীবের পদাঘাত সহ্য করিল। সহ্য করিয়া আবার দুরন্ত নরপিশাচ রাজীবকে রত্নহার-বোধে কণ্ঠে ধারণ করিতে চাহিল। প্রতিভা জানিত যে, পতিই নারীর একমাত্র দেবতা। পতি তাহার নিকট দেবতার স্বরূপ। তবে দেবতার পদাঘাত কেন সে সহ্য করিবে না? কেন তাহাতে সে ক্ষুণ্ণ হইবে? কেন রাজীবকে সে মনোমধ্যে ঘৃণা করিবে? ঘৃণা করিবার তাহার অধিকার নাই। প্রতিভা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া, স্বামীর পদ-সেবায় প্রবৃত্ত হইল। বলিল,—"তুমি আমাকে লাথি মারিলে, তাহার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই; তাহাতে আমার দেহ আজ পবিত্র হইয়াছে। তুমি আমার ইষ্ট দেবতা অপেক্ষা অধিক, তোমায় যাইতে না দিয়া বোধ হয় আমার কত মহাপাতক হইল। কিন্তু প্রাণ আর তোমায় ছাড়িতে চাহে না। আমি আর তোমায় ছাড়িব না। তোমার সে সুখে বাধা দিয়া, চির-নরকে ডুবিতে হয় ডুবিব। তথাপি তোমায় দেখিয়া আমার যে সুখ, সে সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না।" রাজীব নেশার ঝোঁকে দুই তিনবার উঠিতে চেষ্টা করিবার পরে অবসন্ন-দেহে শয্যায় পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজীবের শয্যা হইতে উঠিতে অনেক বেলা হইল। দাসীরা তখনও দ্বার খুলিয়া দেয় নাই। রাজীব শয্যা হইতে

উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল, দ্বার বন্ধ। প্রতিভা হাসিয়া ফেলিল রাজীব কিছু বিরক্ত হইল। তখন প্রতিভা রাজীবকে আপনার পার্শ্বে বসাইল। বলিল—"তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ও সকল দেবতা অপেক্ষা অধিক। স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু, স্বামীই দেবতা। স্বামীর চরণ স্ত্রীলোকের শততীর্থ। তুমি আমাকে যতই মার, যতই পদাঘাত কর। আজ হইতে তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না। গৃহস্থের মণ্ডপ হইতে দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিলে গৃহস্থের দেব-গৃহ যেরূপ শ্রীশূন্য হয়, স্বামী স্ত্রী-জাতির হৃদয়াসন অধিকার না করিলে স্ত্রী-জাতির হৃদয় সেইরূপ শূন্যভাব ধারণ করে। স্বামীর ভালবাসা না পাইলে, প্রাণনাথ, স্ত্রীলোকের প্রাণ যে মরু-বিশেষ হয় তাহ কি তুমি জান না?"

রাজীব বলিল—"তোমার পিতা আমাকে তাঁহার সমস্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

প্রতিভা—"কখনই না। বিষয় হইতে তোমায় বঞ্চিত করুন, আমায় করিতে পারিবেন না। আমার বিষয় হইলে তোমার হইল, আমার সর্ব্বস্ব তোমার। আমার জগতে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্য আছে সবই তোমার। এমন কি আমার এ জীবন তোমার। তোমার সুখের জন্য এখনই আমার এই অসার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি, আমার বিষয় তোমারই। তুমি বিষয় লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।"

রাজীব—"তোমাকেও তোমার পিতা সমস্ত বিষয় দিবেন না।"

প্রতিভ—"কাহাকে দিবেন? পিতার আর কে আছে যে তিনি তাহাকে দিবেন।"

রাজীব তখন সমস্ত খুলিয়া বলিতে লাগিল—বলিল "তোমার পিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন।"

প্রতিভা—হাসিল, বলিল "তোমায় একথা কে বলিল, যে বলিয়াছে তোমার সহিত হয় ঠাট্টা করিয়াছে, না হয় পিতার উপর আক্রোশ জন্মাইয়া দিবার জন্য এ কথা বলিয়াছে। সে তোমার শত্রু, আমাদের শত্রু।"

প্রতিভা তাহার নামের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

রাজীব তাহা বলিল না, সে অনেকক্ষণ কি ভাবিল। পরে গোবর্দ্ধন যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহার মনে প্রত্যয় হইল। গোবর্দ্ধনকে মনে মনে অভিসম্পাত করিল এবং তাহাকে গোবর্দ্ধন যে একটা মহাপাপে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজীব গোবর্দ্ধনের উপর মহা রাগ করিল তখন সে প্রতিভাকে কোন কথা না বলিয়া বাহিরে যাইতে চাহিল। প্রতিভা ছাড়িল না, স্বামীর দুটী পদ ধারণ করিয়া আপনার মাথায় দিল, বলিল "বল দাসীকে ভালবাসিবে—দাসীকে সর্ব্বদা দেখা দিবে, কুলোকের সংসর্গে আর যাইবে না?" রাজীব ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

উষাদেবী যেমন আপনার সুকুমার কর-সঞ্চালনে পূর্ব্বাশার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গগনপথ হইতে অন্ধকার-রাশি সরাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোক-মালায় দিগ-দিগন্তর উদ্ভাসিত করিতে থাকেন, তেমনি প্রতিভার প্রণয়জড়িত মধুমাখা কথাগুলি রাজীবের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাজীবের হৃদয়, প্রেমালোকে পরিপুরিত করিল। রাজীবের হৃদয় যেন কি একটা অপার্থিব সুখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ ভাবিল—যাহাকে সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, সেই প্রেমের প্রতিমা প্রতিভা তাহারই পদ ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, প্রতিভা—তাহার সাধোবাধা দিয়াছে, বাহিরে যাইতে দেয় নাই—এই জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। প্রতিভার প্রেমে পাপিষ্ঠের মন গলিয়া গেল। প্রেম ঐশ্বরিক সর্ব্বত্র

ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই প্রেমই ভগবানের অংশ। এই বিশ্বসংসারে সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তু মধ্যে এই প্রেম ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রেমের বিশ্ব-বিজয়িনী মহিমায় জগাই-মাধাই দুর্দ্দান্ত দস্যু-ভাব পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রেমের বলেই দস্যু রত্নাকর, জগৎ-পূজ্য বাল্মিকী নামে জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই প্রেমের নিকট রাজীব আজ পরাভব স্বীকার করিল আর প্রতিভাকে সে অতি আদরের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া নিজে কত ক্ষমা চাহিল—তাহাতে প্রতিভার লজ্জার শেষ রহিল না। প্রতিভা রাজীবকে এক সপ্তাহ বাটীর বাহিরে যাইতে দিল না সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

বাৎসল্যময়ী ভগিনী প্রিয়তম ভ্রাতাকে কঠিন রোগগ্রস্ত দেখিয়া যেমন ভ্রাতার রোগমোচন-সংকল্পে দিবারাত্রি রোগ-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিভা—স্বামীকে সুপথে আনাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল।

রাজীব এক সপ্তাহ কাল দিবা-রাত্র প্রতিভার নিকট রহিল, কোনরূপ পাপে লিপ্ত হইল না, অধিকন্তু প্রতিভার সরলতায় রাজীব মুগ্ধ হইয়া গেল। কৌশল্যা সুকেশী প্রভৃতি পাপিয়সীগণের সহিত প্রতিভার তুলনায় দেখিল যে, সে পূর্ব্বে বড়ই প্রতারিত হইয়াছে। দাব-দগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে এতদিন কেবল ছটফট্ করিয়াছে, এক্ষণে যেন কোন দেবীর কোমল-কর-কমল-সংস্পর্শে সেই দগ্ধ দেহের তীব্র জ্বালা দূরীভূত হইল শান্তির হৃদয়-জুড়ান প্রতিমূর্ত্তি নয়ন-সমীপে কে উপস্থিত করিয়া রাজীবকে যেন প্রকৃতিস্থ করিল। রাজীব বহুদিনের রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যের সুবিমলসুখ

অনুভব করিল। প্রতিভা বড়ই আনন্দিতা হইল। সে পরমারাধ্য স্বামীকে সুপথে আনিয়াছে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে।

রাজীবের কর্ণে বিষ ঢালিয়া দিয়া মহা হর্ষে গোবর্দ্ধন বাড়ী যাইতেছিল। এতদিনে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া গোবর্দ্ধনের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না, এতদিনে তাহার পরম শত্রু সর্ব্বেশ্বর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, রাজীব তাহাকে বিষ-প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছে, রাজীব বিষ প্রদান করিলেই রাজীব গোবর্দ্ধনের হস্তের মধ্যে আসিবে, প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া সে রাজীবের নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই আদায় করিতে পারিবে, তখন রাজীব প্রাণের দায়ে সমগ্র বিষয় তাহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিতে বাধ্য হইবে, প্রতিভা ও রাজীবকে বাঁচাইবার জন্য গোবর্দ্ধনের সকল প্রস্তাবে সম্মত হইবে, অচিরে গোবর্দ্ধন চিত্রগ্রামের রাজা হইয়া পড়িবে। সেই দরিদ্র-সন্তান পরগৃহপালিত গোবর্দ্ধন—সর্ব্বেশ্বরবাবুর বিশাল জমীদারীর অধীশ্বর হইয়া একাধিপত্য করিবে ভাবিয়া আপন বুদ্ধির কতই প্রশংসা করিল। ভাবিতেছিল যে, "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" কিন্তু সে বুঝিল না যে পাপ-বুদ্ধি বলক্ষয়কারিণী—বলদায়িনী নহে। সৎবুদ্ধিই কেবল মানবকে সর্ব্বসময়ে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববলে বলীয়ান্ করে। এক্ষণে কৌশল্যা রোগোন্মুক্ত হইলেই গোবর্দ্ধনের সুখের আর পরাকাষ্ঠা থাকেনা। সর্ব্বেশ্বরের পদে গোবর্দ্ধন প্রতিষ্ঠিত হইলেই কৌশল্যা সর্ব্বেশ্বর পত্নী সর্ব্বমঙ্গলার পদে প্রতিষ্ঠিতা হইবে। লোকে সর্ব্বমঙ্গলার যেরূপ মনোরঞ্জন করে একদিন কৌশল্যার সন্তোষ-সাধনে সকলে সেইরূপ ব্যস্ত থাকিবে, কৌশল্যাকে আরাম করিবার জন্য গোবর্দ্ধন অনেক ব্যয় করিল। এক্ষণে সে তাহাকে রাম-

লইয়া গিয়া ইংরাজ ডাক্তার দেখাইয়া তাহাকে ভাল করিবে মনে করিল।

এইরূপে দিন বার কাটিয়া গেল। মধ্যে রাজীবের সঙ্গে আর তাহার দেখা হয় নাই—এদিকে সর্ব্বেশ্বরের বাটীতে আনন্দের ধূম পড়িয়াছে ; কারণ জিজ্ঞাসায় গোবর্দ্ধন জানিল—রাজীব পাপসংসর্গ ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে আর মদ খায় না, মোসাহেবের দলে মিশে না, প্রতিভার কাছ ছাড়া হয় না, প্রতিভা তাহাকে কাছছাড়া হইতে দেয় না। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত উথলিয়া পড়িতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল উঠিতেছে। অতিথিশালায় দীন-দরিদ্রদিগের জন্য অতুল অর্থ বিতরণ হইতেছে। ভৈরবের আহ্লাদ ধরে না সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে এদিক ওদিক করিতেছে। রাজীবের স্বভাব-চরিত্রে সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে অনেক চুরুট পুড়াইয়াছিল। সে রাজীবকে চারুর ভ্রাতা বলিয়া আগে ভাল-বাসিয়াছিল ইদানীং যথার্থ ই তাহাকে ভালবাসিত। কাজেই রাজীবের মতিগতি ফিরিয়াছে শুনিয়া—ভৈরব বড়ই আহ্লাদিত হইল। সর্ব্বেশ্বর সমস্ত কথা লিখিয়া চারুবালাকে এক পত্র দিলেন। ভৈরব আগ্রহের সহিত সেই চিঠি লইয়া গেল। তাহার এখনও বিশ্বাস চারুবালা তাহাকে দেখিতে পাইলেই তাহার সঙ্গে পলাইয়া আসিবে, আসিলে চারুকে কোন স্থানে রাখিয়া সে মনের সুখে থাকিবে আর তাহার জন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছে। এইসব ভাবিয়া লোকজন সঙ্গে করিয়া ভৈরব চারুর পত্র লইয়া গেল। গোবর্দ্ধন বিষম মুস্কিলে পড়িল। তাহার এত চাতুরী, এত কৌশল, সব ব্যর্থ হইয়া গেল—ভাবিতে ভাবিতে সে গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার বাটীর একজন দাসী দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল—যে গৃহিনীকে

সর্পে দংশন করিয়াছে। গোবর্দ্ধনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল কৌশল্যা আর্ত্তনাদ করিতেছে; সর্ব্বাঙ্গে তাহার রুধির ধারা বহিতেছে। একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ-সর্প ফণা বিস্তার করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে গর্জ্জন করিতেছে—তাহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া কৌশল্যা সর্পের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। এবং তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে বলিল, গোবর্দ্ধন সর্পের গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কৌশল্যার বন্ধন মোচন করিতে লাগিল। এবং কৌশল্যাকে ঘরের বাহিরে আনিয়া রক্ত ধৌত করিয়া দিল। কৌশল্যা বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দাসাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, যে অল্পক্ষণের জন্য যখন তাহারা স্নান আহার করিতে যায়, তখন সর্প কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করে। কৌশল্যার হস্ত-পদে বন্ধন ছিল সে পলাইতে পারিল না, সর্প মনের সাধে তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারের শব্দে যখন তাহারা কৌশল্যার গৃহ-দ্বারদেশে উপস্থিত হইল—তখনও সর্প কৌশল্যাকে দংশন করিতে ছিল; কৌশল্যার হস্তপদ বদ্ধ থাকায় সর্পের দংশন নিবারণের কোন উপায় ছিল না—দাসীরা আসিলে সর্পটা সরিয়া গেল। সে তখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। কৌশল্যার ক্রমশঃ শেষ সময় হইয়া আসিতে লাগিল, তখন যেন কৌশল্যার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে গোবর্দ্ধনকে চিনিতে পারিল এবং জ্ঞানের কথা কহিতে লাগিল। তখন গোবর্দ্ধন অতিশয় বিস্মিত হইল এবং তাহাকে টাকা-কড়ি অলঙ্কার প্রভৃতি কোথায় রাখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল—কৌশল্যা মরে তত ক্ষতি নাই, টাকা-কড়িগুলা পাইলে, অনেক উপকার হইবে, এই ভাবিয়া কৌশল্যাকে [illegible]

টাকাকড়ি কোথায় রাখিয়াছে বার বার জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে মৃত্যুকালে আপনার জীবনের সকল পাপের কথা বলিয়া—গোবর্দ্ধনের নিকট ক্ষমা চাহিল, দেবতাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিল। রাজীবের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয়ের কথা সব বলিল। সে বলিল, রাজীবকে সে সমস্ত টাকাকড়ি দিয়াছে—এমন কি রাজীবকে সে জীবন পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু রাজীব তাহার ভালবাসার প্রতিদান করিল না, সে পাগল হইয়া গেল। বলিতে বলিতে পাপীয়সীর জিহ্বা জড়াইয়া আসিল সে গোবর্দ্ধনের পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিল।

গোবর্দ্ধনের রাজীবের উপর মহা ক্রোধ হইল। সে রাজীবের সর্ব্ব-নাশের সংকল্পে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, আপনার সংকল্প এখনও সাধন করিতে পারে নাই। আবার পাছে রাজীব সর্ব্বেশ্বরকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার কথা প্রকাশ করে, সর্ব্বেশ্বর বাবুকে প্রকাশ করিয়া ফেলে—সেই ভয়ে গোবর্দ্ধন আকুল হইয়াছিল এবং রাজীবকে হত্যা না করিলে ও কথা চাপা পড়িবে না ভাবিয়া তাহাকে গুপ্তরূপে হত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিল। এক্ষণে রাজীব তাহার স্ত্রীর উপপতি এবং তাহার সমস্ত ধন রত্ন অপহরণ করিয়াছে জানিয়া সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে আপন ঘর হইতে একটা দুই মুখ পিস্তল বাহির করিয়া রাজীবকে খুন করিবে বলিয়া বাহির হইল। কৌশল্যার মৃত দেহ সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

রাজীব ও সর্ব্বেশ্বর বাবু দুইজনে নানা বিষয়ের কথায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষুদিরাম মাঝী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে সর্ব্বে-